চন্দ্রকান্ত দত্ত

বাংলার বীর

কলিকাতা

গোল্ডকুইন এণ্ড কোং

ডাং - ১৯৫৭

বাংলার বীর

বিজয়সিংহ

প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন হিন্দুর ভারত হিন্দুরই ছিল,—
ন এদেশের রাজনীতি, সমাজ ও বাণিজ্য হিন্দুদের দ্বারাই পরিচালিত
ত,—যখন এই সোণার ভারতে বিদেশীর ছায়াপাতও কেহ কল্পনা
রতে পারে নাই, সেই অতীত গৌরবময় যুগের কথা। ভগবান্ বুদ্ধ
খন জগতের জরামরণের দুঃখে ব্যথিত হইয়া জীবের দুঃখমোচনের
য পরম পবিত্র অহিংসা ধর্ম্মের প্রচার করিতেছিলেন, যখন জগতের
নরনারী তাঁহার সেই শান্তিময় প্রেম-ধর্ম্মের শীতল ছায়ায় শান্তি লাভ
করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল, ভারতের সেই গৌরবময় যুগে এই
বর্ত্তমান অধঃপতিত সোণার বাংলার যে বীর সন্তান সাত শত মাত্র অনুচর
ঙ্গে লইয়া ভারত-মহাসাগরের বীচি-বিক্ষোভ উপেক্ষা পূর্ব্বক সিংহল জয়
রিয়াছিলেন, তাঁহার নাম **বিজয়সিংহ**।

সিংহবাহু বাংলাদেশের রাজা। তাঁহার দুই পুত্র,—বিজয় ও
ত্র। বিজয় রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সিংহাসনের ভাবী অধিকারী,
-আদরও তাঁহার যথেষ্ট। এই সমস্ত নানা কারণে এবং শিথিল
নের দোষে তিনি দিন দিন দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। দুই
জন করিয়া তাঁহার দুষ্কর্ম্মের অনেক সঙ্গী ক্রমে ক্রমে জুটিতে
গল। তাহাদের সাহায্যে বিজয় রাজ্যমধ্যে নানা প্রকার অত্যাচার

করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজারা রাজপুত্রের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে লাগিল, ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। রাজা কদাচিৎ পুত্রের অত্যাচারের কথা শুনিলেও উপেক্ষা করিয়া যাইতেন। বিজয়ের এই নির্ব্বিরোধ উৎপীড়ন ক্রমশঃ ভীষণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। এমন কি, সময় সময় তাহা পাশবিকতার চরম সীমাও লাভ করিত। প্রজারা আর এই উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সিংহবাহুর নিকট অভিযোগ করিল। স্নেহান্ধ পিতা পুত্রের অপরাধ তত গুরুতর মনে না করিয়া উপেক্ষা করিয়া যাইতে লাগিলেন। সময় সময় সামান্য মাত্র তিরস্কার করিতেন। এই সামান্য তিরস্কারের ফলে বিজয় আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহার অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রাজ্যমধ্যে নানা অশান্তির সৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রজার ক্রন্দনরোলে রাজ্য ভরিয়া গেল। রাজা সিংহবাহু এইবার আর পুত্রের অপরাধ উপেক্ষাভরে অবহেলা করিতে পারিলেন না। অনবরত বিজয়ের নামে গুরুতর অপরাধসমূহ তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল।

অবশেষে বিজয় ও তাঁহার সঙ্গীরা এমন এক গুরুতর অপরাধ করিয়া বসিলেন যে, অত্যাচার-জর্জ্জরিত প্রজাবৃন্দ রাজাকে অনতিবিলম্বে তাহার সুবিচার করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। পিতৃস্নেহ এত দিন বিজয়কে প্রজাগণের রোষ-বহ্নি হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আর পারিল না। প্রজাশক্তির নিকট রাজশক্তি চিরদিনই পরাজিত হইয়া আসিয়াছে, ভারতের আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের অপ্রতিহত রাজশক্তিও প্রজাশক্তির নিকট অবনতমস্তক হইয়াছিল। পৃথিবীর অতি-আধুনিক ইতিহাসেও ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

সিংহবাহু আর পুত্রকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। একদিকে

রাজ্যের শান্তি, অপরদিকে পিতৃস্নেহ। পিতৃস্নেহ এ ক্ষেত্রে পরাস্ত হইল। বিজয় যে গুরুতর অপরাধে অপরাধী, তাহাতে তাঁহার উপযুক্ত শাস্তি প্রাণদণ্ড। কিন্তু স্নেহাতুর পিতা সে আদেশ দিতে পারিলেন না। পুত্রের নির্ব্বাসন-দণ্ডের ব্যবস্থা হইল। নির্ভীক বীর পুত্র এই দণ্ডাদেশে ভীত বা মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন না। তিনি পিতার পদধূলি লইয়া এই দণ্ডাদেশকে পরম আশীর্ব্বাদ জ্ঞানে সাত শত অনুচর সঙ্গে ভাগ্যান্বেষণের জন্য সমুদ্রে জাহাজ ভাসাইলেন। বাঙ্গালী বীরগণকে বক্ষে লইয়া বাঙ্গালীর পোত সাগরের উত্তাল উর্ম্মিরাশি অবহেলা করিয়া যে দিন অনির্দ্দিষ্ট ভাগ্যের সন্ধানে যাত্রা করিল, কি গৌরবের সে দিন! আজ বাঙ্গালী আমরা বাংলার সে উজ্জ্বল অতীতের কল্পনাও করিতে পারি না। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে বাঙ্গালীর সমুদ্র-পোত রাক্ষসরাজ রাবণের স্বর্ণলঙ্কার উপকূলে যাইয়া উপনীত হইল।

লঙ্কা তখন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক রাজ্যে এক একজন স্বাধীন রাজা রাজত্ব করিতেন। তথায় যাইয়া বিজয়সিংহের হৃদয়ে রাজ্যজয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। রাজপুত্র তিনি, সাধারণ মানুষের মত সামান্য বৃত্তিতে তাঁহার তৃপ্তি হইবে কেন? তিনি সুযোগ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বদেশে থাকিতে তাঁহার যে দুর্দ্দমনীয় দুষ্প্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল, এই নূতন দেশে নূতন অবস্থায় পড়িয়া তাহা অনেকটা দমিত হইয়া আসিল। সহসা তিনি তাঁহার চরিত্রের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এবং তদীয় সঙ্গীদিগের সদ্ব্যবহারে লঙ্কাবাসীরা বিমুগ্ধ হইল, তাহারা জানিতে পারিল না যে, এই নবাগত বীর বাঙ্গালী যুবক একদিন লঙ্কার সিংহাসন অধিকার করিয়া তাহাদের ভাগ্য-বিধাতা হইয়া বসিবেন।

বিজয় কিছুদিন সেখানে অবস্থানের পর কুবেণী নাম্নী এক রাজকুমারীকে বিবাহ করিলেন। একটী বিশিষ্ট রাজার জামাতা হওয়ায় সেই দেশের অন্যান্য অভিজাতবংশের সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইল। কুবেণীর চেষ্টায় তিনি অন্যান্য রাজবংশের সহিত ক্রমশঃ পরিচিত হইতে লাগিলেন। বিবাহাদি নানা উৎসবে বিজয় এবং তাঁহার সঙ্গীদিগের নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। কুবেণী রাজকন্যা, বিজয়ও রাজপুত্র, কাজেই কুবেণীর হৃদয়ে রাণী হওয়ার গৌরবের আকাঙ্ক্ষা পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই বিদ্যমান ছিল। তিনি স্বামীকে রাজা করিয়া নিজে রাণী হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বিজয়কে ভগবান্ রাজ্যপরিচালনের জন্য সংসারে পাঠাইয়াছেন, সামান্য মানুষের অবস্থায় তাঁহাকে থাকিতে হইবে কেন? তাঁহার জন্য অদূর ভবিষ্যতে স্বর্ণলঙ্কার রাজমুকুট অপেক্ষা করিতেছিল। অচিরেই সেই সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। কুবেণীর চক্রান্তে বিজয় এবং তাঁহার অনুচরদিগের এক রাজবাড়ীতে বিবাহ-সভায় নিমন্ত্রণ হইল। সাধারণ নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের মত তাঁহারা সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজভবন উৎসবামোদে মগ্ন, অতিথি-অভ্যাগতের কলকণ্ঠে মুখরিত, এমন সময় বিজয় পত্নী কুবেণীর পরামর্শে অনুচরবর্গের সহিত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রাজভবন আক্রমণ করিলেন। বিবাহের উৎসবামোদিত রাজভবন রণক্ষেত্রে পরিণত হইল; এই অপ্রত্যাশিত বিপদের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না, সুতরাং বিজয়সিংহ জয়ী হইয়া সেই রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। উচ্চাভিলাষিণী কুবেণীর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইল, তিনি রাণী হইলেন। ক্রমেই লঙ্কায় বাঙ্গালীদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাদের পরাক্রমে ধীরে ধীরে লঙ্কার অন্যান্য

রাজশক্তি বিজয়ী বাঙ্গালী রাজা বিজয়সিংহের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে লাগিল। ক্রমশঃ বিজয়ের নববিজিত রাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত হইয়া শেষে সমগ্র লঙ্কা তাঁহার করতলগত হইল।

কুবেণী অধিক দিন রাণী-গৌরব ভোগ করিতে পারিলেন না। তিনি যে সুখের আশায় স্বীয় জন্মভূমির সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন, অচিরে সেই আশার সুবর্ণ কিরণ দুর্ভাগ্য ও দুর্দ্দশার ঘনান্ধকারে বিলীন হইয়া গেল। পাপের অনলে তিনি ভস্মীভূত হইলেন। বিজয়সিংহ নানা কারণে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মাদ্রাজ অঞ্চলের এক সুসভ্য রাজবংশের সুন্দরী রাজকুমারীকে বিবাহ করিলেন। কুবেণীর প্রতিহিংসাবহ্নি স্বামী এবং সপত্নীকে দগ্ধ করিবার জন্য দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। নানা দুঃখকষ্ট ও বিড়ম্বনা সহ্য করিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী কুবেণীর জীবনের যবনিকাপাত হইল।

বিজয়সিংহের সঙ্গীরা অনেকেই মাদ্রাজ অঞ্চলে বিবাহ করিয়া আবার লঙ্কায় ফিরিয়া গেল। ক্রমশঃ তাহাদের বংশাবলী বিস্তৃতি লাভ করিয়া লঙ্কায় প্রকাণ্ড একটী বাঙ্গালী উপনিবেশ গঠন করিল।

বিজয়সিংহ নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর লঙ্কার রাজা হইবার নিমিত্ত তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমিত্রকে আনিবার জন্য পিতার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু পিতা সিংহবাহু ইতঃপূর্ব্বেই পরলোক গমন করায় সুমিত্র বঙ্গদেশের রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার আর লঙ্কায় যাওয়া সম্ভব হইল না। পক্ষান্তরে অত বড় একটা রাজ্যও হস্তচ্যুত হওয়া সঙ্গত মনে না করিয়া সুমিত্র স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র পাণ্ডুবাসকে লঙ্কায় প্রেরণ করিলেন। আটত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর

সুবিস্তীর্ণ লঙ্কার রাজসিংহাসন ভ্রাতুষ্পুত্রকে অর্পণ করিয়া বিজয়ী বীর মহাপ্রস্থান করিলেন।

বাঙ্গালীরা দীর্ঘ দিন লঙ্কায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। সিংহ-বংশের রাজা বলিয়া লঙ্কার নাম **সিংহল** হইল। সেই বাঙ্গালী রাজগণের প্রতিষ্ঠিত নগরসমূহের ধ্বংসাবশেষ কালের অত্যাচারে আজিও পৃথিবী হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, কোনও রূপে আত্মরক্ষা করিয়া বাঙ্গালীর বিজয়-গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

হায়, আমরা বাঙ্গালী আজ আমাদের সেই মহাগৌরবোজ্জ্বল অতীত বিস্মৃত হইয়াছি,—কি ছিলাম ভুলিয়া গিয়া বৈদেশিক গুরুগণের কৃপায় শিখিয়াছি,—'আমরা যাহা ছিলাম, আজিও তাহাই আছি,—চিরদিনই আমরা এমন হীন, দুর্বল, কাপুরুষ, ভীরু, পঙ্গু,—আত্মরক্ষায় অসমর্থ।' হায়, বাঙ্গালী, একবার সুষুপ্তির মোহ কাটাইয়া জাগিয়া উঠ, একবার উজ্জ্বল অতীতের দিকে চাহিয়া দেখ, তুমি কি ছিলে; তোমার সেই মেঘস্পর্শী গৌরবের শৃঙ্গ আজ জগতের ধূলিকণার সঙ্গে কিরূপে মিশিয়া গিয়াছে। আত্মবিস্মৃত হইও না, কেন না আত্মবিস্মৃত জাতির ধ্বংস সুনিশ্চিত।

রাজা গণেশ

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন সমগ্র উত্তর ভারত পাঠান-শাসনের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল, তখন বঙ্গদেশে ইলিয়াস্ শাহের বংশধরেরা রাজত্ব করিতেন। গৌড় নগর তাঁহাদের রাজধানী ছিল। গৌড় নগর তখন উন্নতির এরূপ চরম সীমায় উঠিয়াছিল যে, সমগ্র বঙ্গদেশই গৌড় নামে অভিহিত হইত। মালদহ জেলায় আজিও গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় বিরাজিত থাকিয়া তাহার পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দিল্লীর পাঠান সম্রাট্‌গণের বীর্য্যবহ্নি তখন নির্ব্বাপিতপ্রায় দীপশিখার মত স্তিমিত প্রভায় জ্বলিতেছিল, সেই সুযোগে ভারতের অনেক প্রদেশেই পাঠান-শাসনকর্ত্তৃগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছিলেন। শক্তিহীন সম্রাট্ এই নবোত্থিত শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রায়ই কৃতকার্য্য হইতেন না। বাংলাতেও গৌড় নগরে শাহ্‌বংশীয় পাঠানেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া প্রবল পরাক্রমে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন। দিল্লী হইতে বঙ্গদেশ বহুদূর, যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা, অধিকন্তু দিল্লীর সম্রাট্-শক্তি হীনতেজ, কাজেই বাংলার এই স্বাধীনতা ঘোষণায় সম্রাট্ আর হস্তক্ষেপ করিয়া সফলকাম হইতে পারিলেন না। গৌড়ের পাঠান নবাবগণ নির্ব্বিরোধে স্বাধীনতা-সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া বাংলার হিন্দুগণ স্বাধীনতা হারাইয়া পাঠানের শাসনাধীনে বাস করিতেছিল, সুতরাং তাহাদের সেই স্বাধীনযুগের প্রতাপ-প্রতিপত্তি আর কিছুই ছিল না। স্থানে স্থানে হিন্দুগণ সামান্য

সামান্য জমিদারী লইয়া বাস করিতেছিলেন। সময় সময় কেহ কেহ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধও ঘোষণা করিতেন, কিন্তু শক্তিমান্ পাঠান-শাসনকর্ত্তৃগণের পরাক্রমের নিকট তাঁহাদের সে প্রয়াস অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইত। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে এই রকম একজন হিন্দু জমিদার দিনাজপুর অঞ্চলে বাস করিতেন। তাঁহার নাম **রাজা গণেশ** বা কংসনারায়ণ দত্ত খাঁ। ইনি জাতিতে কায়স্থ। ভাতুরিয়া পরগণা তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। ইহা একটী সুবিস্তৃত পরগণা, ইহার দক্ষিণে গঙ্গা, পূর্ব্বে করতোয়া এবং পশ্চিমে মহানন্দা ও পুনর্ভবা নদী বিদ্যমান ছিল। সুতরাং রাজা গণেশ একজন সামান্য জমিদার ছিলেন না।

পূর্ব্বে জমিদারগণ প্রত্যেকেই নবাবের অধীনে এক একটী কর্ম্ম করিতেন। রাজা গণেশও তৎকালীন গৌড়-বঙ্গের পাঠান নৃপতি গিয়াস্-উদ্দিন আজম শাহের অধীনে রাজস্ব এবং শাসন বিভাগের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু এই জমিদারী ও দাসত্ব তাঁহার মোটেই ভাল লাগিল না, গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিয়া তিনি বঙ্গে আবার হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাঠানদিগের হস্তে হিন্দুদিগের নির্য্যাতন যতই তিনি চিন্তা করিতেন, ততই বঙ্গদেশ হইতে পাঠান রাজত্বের মূলোচ্ছেদ পূর্ব্বক তথায় হিন্দুর সিংহাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁহার অন্তরে বদ্ধমূল হইত। ক্রমে শাসন ও রাজস্ব বিভাগে তাঁহার অপ্রতিহত কর্ত্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, রাজ্যমধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতে লাগিলেন, এমন কি, গৌড়ের সিংহাসন পর্য্যন্ত তাঁহার অঙ্গুলি-হেলনে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হইল। তাঁহার চক্রান্তে নবাব গিয়াস্ উদ্দিন আজম

শাহ্ নিহত হইলেন। তৎপর গিয়াস্উদ্দিনের পুত্র সৈফ্উদ্দিন রাজা গণেশের ক্রীড়া-পুত্তলিকারূপে সিংহাসনে বসিয়া তাঁহারই ইঙ্গিতে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই কর্তৃত্ব লাভ করিয়াও রাজা গণেশের প্রাণের উচ্চাভিলাষ প্রশমিত হইল না। হিন্দুর বাংলায় আবার হিন্দুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠাই তাঁহার একমাত্র স্থির লক্ষ্য হইল। তিনি সৈফ্উদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সমশ্উদ্দিনকে নিহত করিয়া গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

তিনি তাঁহার হিন্দু এবং মুসলমান প্রজাকে সমান স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। মুসলমান প্রজাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি নিজে হিন্দু থাকিয়াও **সুলতান সাহাব্উদ্দিন বয়াজিদ শাহ্** উপাধি গ্রহণ করিয়া ঐ নামেই মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন।* তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস নানা বিদ্বেষমূলক কল্পিত কাহিনীর কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা হিন্দুরাজার এই প্রাধান্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে লোক-চক্ষুর নিকটে হেয় করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার চরিত্র নানাবিধ কালিমা নিক্ষেপে কদর্য্যরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

রাজা গণেশের পুত্র যদুনন্দন পিতার অত্যধিক মুসলমান-প্রীতির ফলে নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তিনি নবাব গিয়াসউদ্দিনের কন্যা আসমান্-তারার অনুপম রূপমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন, তৎফলে তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হয়। মুসলমান হইয়া যদু জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ্ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন লাভ করেন। পুত্রের এই

* বাংলার ইতিহাস (২য় ভাগ)—৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬৫ পৃঃ।

ধর্ম্মান্তর গ্রহণে রাজা গণেশ অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। তিনি যদুকে পুনরায় হিন্দু ধর্ম্মে আনয়নের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া "সুবর্ণধেনু ব্রত" করাইয়াছিলেন। কিন্তু যদু মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই।

রাজা গণেশ সাত বৎসর প্রবল পরাক্রমে রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন (১৫১৪ খ্রীঃ অব্দ)। দিনাজপুর জেলায় যেস্থানে রাজা গণেশের রাজধানী ছিল তাহা আজও গণেশপুর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তিনি মুসলমান সমাজের এত শ্রদ্ধা-প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর কোনও কোনও মুসলমান তাঁহার শবদেহ মুসলমান-প্রথায় সমাধিস্থ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজা গণেশের পরলোক গমনের পর বাংলার সিংহাসন তাঁহার মুসলমান পুত্র জালাল-উদ্দিনের করায়ত্ত হয়, সুতরাং গৌড়-বঙ্গ আবার মুসলমানগণের শসনাধিকারে আসে। রাজা গণেশ শুধু রাজ্য-জয়েই নিবিষ্ট ছিলেন না, হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে গৌড়-বঙ্গে পুনরায় সংস্কৃত চর্চ্চা হইতে আরম্ভ হয়, বাংলা ভাষার উন্নতির সূত্রপাতও তাঁহার সময়েই হইয়াছিল। তাঁহার শাসনকালে বঙ্গদেশ পাঠানের অত্যাচার-নিপীড়ন হইতে মুক্তি পাইয়া কিছুদিন পরম শান্তি ভোগ করিয়াছিল। পাঠানের অত্যাচার-কবল হইতে স্বধর্ম্মীদিগকে রক্ষার সম্বন্ধে রাজা গণেশের বিষয়ে এদেশে অনেক গল্প প্রচলিত আছে, ঐ সমস্ত কাহিনী নিতান্ত কল্পিত বলিয়া মনে হয় না।

এক দিনের কথা, তখনও রাজা গণেশ সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, নবাব-বংশের আলিমশাহ্ নামক এক ব্যক্তি হিন্দুগৃহের এক কুমারীকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া

তৎক্ষণাৎ হিন্দুবীর রাজা গণেশ একাকী তরবারি হস্তে নারী-অপহরণকারী পাঠানের সম্মুখীন হইলেন। আলিমশাহ্ একাকী ছিলেন না, তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকজন অনুচর তাঁহার এই পাপকার্য্যের সহায়স্বরূপ ছিল। রাজা গণেশ একাকী, শত্রুগণ সংখ্যায় বহু, তথাপি তিনি ভীত হইলেন না, মুক্ত তরবারি হস্তে দুর্ব্বৃত্তদিগের পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার তরবারির আঘাতে আলিমশাহের কয়েকজন অনুচর ধরাশায়ী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। আলিমশাহ' প্রাণভয়ে সেই অপহৃতা হিন্দুকন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু হিন্দুবীরের হস্তে তিনি যে লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন তাহার প্রতিশোধগ্রহণের নিমিত্ত সুলতানের দরবারে যাইয়া রাজা গণেশের নামে বিদ্রোহ এবং নবাব সৈন্য হত্যার অভিযোগ উত্থাপিত করিলেন। নবাবদরবার হইতে নির্দ্দিষ্ট দিবসে তথায় উপস্থিত হইবার জন্য রাজা গণেশের উপর আদেশ প্রদত্ত হইল। তিনি দরবারে উপস্থিত হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের স্থানে না যাইয়া অভিযোগকারিগণের নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। আলমশাহ্ সুলতানের সহিত বিচারকের উচ্চ মঞ্চের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি রাজা গণেশকে অভিযোগকারীদিগের আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের স্থানে যাইয়া দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন।

রাজা গণেশ এই আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গর্ব্বভরে উত্তর করিলেন, "আমি জানিতে চাই, এস্থলে কে প্রকৃত অপরাধী? যে হিন্দুকন্যাকে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছিল সে, না যে লুণ্ঠনকারীর হস্ত হইতে সেই অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করিয়া তাহার মানমর্য্যাদা, জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে সে?"

সুলতান কহিলেন, "রাজা, আপনি নবাবজাদার রাজ-কার্য্য সম্পাদন-কালে তাঁহাকে বাধা দিয়া কতকগুলি নিরপরাধ সৈন্যের প্রাণ সংহার করিয়াছেন। সুতরাং নবাবজাদা আজিমশাহ্ কর্ত্তৃক আপনি এই দুই অপরাধে অভিযুক্ত!"

নির্ভীক রাজা গণেশ উচ্চ হাস্য করিয়া কহিয়া উঠিলেন, "সতীর সতীত্ব-লুণ্ঠন যদি রাজকার্য্য হয়, আর নবাবজাদাব যদি তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া থাকে, তবে আমি এই বিচার-গৃহ ধর্ম্মস্থানে সেই রাজা এবং সেই রাজকর্ম্মচারী নবাবজাদার নামে অভিযোগ করিতেছি। নবাবজাদা আলিমশাহ্! আপনিই এতগুলি নিরপরাধ সৈন্যের হত্যার কাবণ। ঐ বিচারমঞ্চের উপর স্থান গ্রহণ আপনার শোভা পায় না। আপনি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া এই বিচারালয়েব মর্য্যাদা রক্ষা করুন।"

ন্যায়পরায়ণ সুলতান রাজা গণেশের নির্ভীক তেজোপূর্ণ উত্তর শুনিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং আপোষে বিবাদ মিটাইয়া দিয়া তিনি তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন।

রাজা গণেশ একটা প্রচণ্ড উল্কার মত অতি ক্ষণকালের জন্য হিন্দুর ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে তিনি যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন বাংলার ইতিহাসে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত থাকিবে। সেই পাঠান-প্রাধান্যের যুগে একজন হিন্দু জমিদারের পক্ষে এইরূপে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সত্যসত্যই একটা বিরাট গৌরবের বিষয়।

রাজা নীলাম্বর

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যে ভগদত্ত কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করিয়া তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, রাজা নীলাম্বর তাঁহারই বংশোদ্ভব। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বহু পূর্ব্ব হইতে কামরূপ, রংপুর, কোচবিহার এবং বাংলার প্রায় সমস্ত উত্তর-পূর্ব্বার্দ্ধ জুড়িয়া এক বিরাট রাজ্যস্থাপন পূর্ব্বক প্রবল বিক্রমে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা নীলাম্বর ঐ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। পূর্ব্বে কামরূপের অধিকাংশ, উত্তরে সমগ্র রংপুর জেলা এবং দক্ষিণে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত নীলাম্বরের প্রকাণ্ড রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কামতাপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। ঘোড়াঘাটে রাজা নীলাম্বর একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, আরও নানাস্থানে দুর্গ স্থাপন করিয়া তিনি স্বীয় রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি রংপুর জেলার স্থানে স্থানে নীলাম্বরের বিলুপ্তপ্রায় দুর্গের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজা নীলাম্বর কামতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত একটী বিস্তীর্ণ রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, আজও উহার কিয়দংশ স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বঙ্গদেশে গৌড়ের মুসলমান রাজাদিগের প্রবল প্রতাপ। তাঁহারা দিল্লীর বাদশাহের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে গৌড়রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। দিল্লীর পাঠান বাদশাহের শাসন-শক্তি তখন নিতান্ত হীন হইয়া আসিতেছিল, কাজেই বঙ্গের নবোত্থিত পাঠানশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে তাঁহারা সাহস করেন নাই। তারপর যখন ভারতসাম্রাজ্য

মোগলের করায়ত্ত হইল, তখনও গৌড়ের পাঠান সুলতানেরা তাঁহাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হইলেন; ফলে, প্রবলপ্রতাপ মোগলের সহিত তাঁহাদের সংগ্রাম অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। মোগলে পাঠানে অনবরত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সেই যুদ্ধ-বিগ্রহের সুযোগে রাজা নীলাম্বর উত্তরবঙ্গে স্বীয় রাজ্য বিস্তৃত করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। গৌড়ের বাদশাহেরা তখন মোগলের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত, কাজেই রাজা নীলাম্বরের কার্য্যকলাপের কোনই সংবাদ লইবার সুযোগ পাইলেন না। ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গ জুড়িয়া একটা স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গড়িয়া উঠিল।

একদা রাজা নীলাম্বর কোনও গুরুতর অপরাধের জন্য স্বীয় মন্ত্রী সচীপাত্রের পুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। শুধু প্রাণদণ্ড করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, নিহত পুত্রের মাংস সচীপাত্রকে ভক্ষণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন! পুত্রের মৃত্যুর্তে শোকার্ত্ত পিতা প্রতিহিংসা সাধনের জন্য গৌড়ের পাঠান সুলতান হুসেনশাহের নিকট যাইয়া রাজা নীলাম্বরের স্বাধীনতা-ঘোষণার সংবাদ প্রদান করেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। হুসেনশাহ্ অনতিবিলম্বে সসৈন্য রাজা নীলাম্বরের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। হিন্দু রাজাও তাঁহার বিরাট বাহিনী লইয়া পাঠান সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। হিন্দু-পাঠানে তুমুল সংগ্রাম হইল, পাঠান সুলতান পরাস্ত হইলেন। সম্মুখ যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি মনে মনে এক কৌশল আবিষ্কার করিয়া হিন্দু রাজার সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। যুদ্ধের আগুন নিভিয়া গেল। নীলাম্বর ও হুসেনশাহ্ পরস্পর গাঢ় বন্ধুত্বে আবদ্ধ হইলেন; কিন্তু এই বন্ধুত্বের আবরণে যে হুসেনশাহের

হৃদয়ে গুপ্ত পাপ-অভিসন্ধি নিহিত ছিল, তাহা সরলপ্রাণ হিন্দু নরপতি বুঝিতে পারেন নাই।

বন্ধুত্ব এত ঘনীভূত হইল যে, হুসেনশাহের বেগমগণ নীলাম্বরের রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এই সুযোগে বিশ্বাসঘাতক হুসেনশাহ্ কতকগুলি সশস্ত্র মুসলমান যোদ্ধাকে বেগমের বেশে রাজ-অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। প্রহরীরা বোর্কা-পরিহিত স্ত্রী-বেশধারী মুসলমান সৈন্যদিগকে বেগম বলিয়াই মনে করিল; কাজেই তাহাদের অন্তঃপুর-প্রবেশে বাধা দিল না। রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই মুসলমান সৈন্যেরা ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব ব্যাপারে রাজ-অন্তঃপুরে একটা বিভীষিকা ও আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। অস্ত্রধারী পাঠান সৈনিকেরা যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিতে লাগিল। রাজা নীলাম্বর আর যুদ্ধ করিবার অবসর পাইলেন না, পাঠানেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া গৌড়ে লইয়া চলিল। কিন্তু রক্ষক-দিগের অসতর্কতায় পথিমধ্যে তিনি তাহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া একেবারে নিরুদ্দেশ হইলেন, আর তাঁহার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

রাজা নীলাম্বরের অলৌকিক শক্তিতে প্রজাগণের একটা সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল; তাহারা মনে করিতে লাগিল, আবার একদিন তিনি আবির্ভূত হইয়া বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে তাঁহার রাজ্য উদ্ধার করিবেন। এই সুদীর্ঘ তিনশত বৎসরেও সে বিশ্বাসের অপচয় হয় নাই, এখনও ঐ অঞ্চলের লোকেরা এই ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিতেছে।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য

"যশোহর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥
বর-পুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বাহান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতি,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ॥"

—ভারতচন্দ্র

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পাঠান রাজত্বের অবসান হইয়া বঙ্গের ভাগ্যাকাশে ধীরে ধীরে মোগল-সূর্য্যের তরুণ আভা ফুটিয়া উঠিতেছিল। মহামতি আকবর শাহ, তখন ভারত-সম্রাট্। মোগলেরা বঙ্গের অনেক স্থান অধিকার করিয়া লইলেও তখনও পাঠানগণের আশাভরসা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তাহারা নানা স্থানে করদ রাজার ন্যায় শাসন-দণ্ড পরিচালন করিত এবং সময় ও সুযোগ পাইলেই তাহাদের বিলুপ্ত স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তরবারি ধারণ করিয়া মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিত। বঙ্গের অধিবাসিগণ তখন ধন, জন, জীবন ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত। বঙ্গের এই অরাজকতার সময় গৌড় নগরে প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়।

প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ও খুল্লতাত বসন্তরায় তখন বঙ্গের

মহারাজ প্রতাপাদিত্য

রাজধানী গৌড় নগরে পাঠান নৃপতি দাউদ শাহের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শিশুর বীরোচিত সৌন্দর্য্য ও অসাধারণ শারীরিক লক্ষণাবলী দর্শন করিয়া পিতামহ ভবানন্দ তাঁহাকে "প্রতাপাদিত্য" নাম প্রদান করেন।

বঙ্গেশ্বর দাউদ শাহ্ মোগল-সম্রাটের অধীন সামন্ত-রাজার ন্যায় থাকা হেয় জ্ঞান করিয়া মোগলের বিরুদ্ধে সমরায়োজন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রবল প্রতাপশালী মোগলের সহিত সংঘর্ষে পাঠানের রাজধানী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, ইহা স্থির নিশ্চয় জানিয়া, প্রতাপ-পিতামহ ভবানন্দ স্বীয় পরিবারবর্গ ও ধনসম্পদ্ কোনও নিরাপদ্ স্থানে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। দক্ষিণ অঞ্চলে সুন্দরবন প্রদেশে হিংস্র জন্তুসমাকুল নদী-বহুল নিবিড় বনাকীর্ণ একটী দুর্গম স্থান তাঁহাদের বাসোপযোগী বিবেচিত হওয়ায় দাউদ শাহের নিকট হইতে উহা জায়গীর স্বরূপ লইয়া ভবানন্দ সেখানে এক অতি সুরম্য ও সুরক্ষিত বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। অতঃপর তিনি পরিজনবর্গ ও ধনরত্নাদি লইয়া নবনির্ম্মিত ভবনে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই জায়গীর কালে প্রতাপাদিত্যের বুদ্ধি, বীরত্ব ও কৌশলপ্রভাবে এইরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, গৌড় নগরের সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি ইহার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। গৌড় নগরের যশঃ হরণ করিয়া এই রাজ্যের নাম হইল **'যশোহর'**। পরিবারবর্গ নবনির্ম্মিত বাসস্থানে চলিয়া আসিলেন, কিন্তু বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় রাজকার্য্যের জন্য গৌড় নগরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ গৌড়ে অবস্থান-কালেই তৎসাময়িক প্রথানুযায়ী পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। যশোহরে আসিয়া অসিচালনা, মল্লক্রীড়া, সন্তরণ, অশ্বারোহণ ইত্যাদি বীরোচিত যাবতীয় বিদ্যা অতি যত্ন ও

আগ্রহ সহকারে আয়ত্ত করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে বীরত্ব ও প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি শৈশব হইতেই নানাবিধ বীরজনোচিত কার্য্য সম্পাদন এবং বীরত্বের কাহিনী শ্রবণ করিতে ভাল বাসিতেন। সে সময় বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় ঘোর স্বাধীনতার সংগ্রাম চলিতেছিল। বালক সে সমুদয় বিজয় ও পরাজয়-কাহিনী শুনিয়া ধীরে ধীরে স্বীয় তরুণ হৃদয়ে স্বাধীন রাজ্যস্থাপন-স্পৃহা জাগাইয়া তুলিতেছিলেন। একটু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রতাপের মনে একটা ধারণা জন্মিল,—"বাঙ্গালী আমরা, বাংলা আমাদের জন্মভূমি, আমাদের স্বদেশ লইয়া মোগল-পাঠানেরা সংগ্রাম করিতেছে, আর আমরা আমাদের দেশেই বাস করিয়া নীরবে তাহাদের অধীনতা মাথা পাতিয়া বহন করিতেছি ;—কেন, কিসের জন্য এই অধীনতা ? যে রূপেই হউক, জন্মভূমির স্বাধীনতা লাভ করিতেই হইবে।"

শঙ্কর চক্রবর্ত্তী নামক একজন ব্রাহ্মণ বালক ও সূর্য্যকান্ত গুহ নামক এক কায়স্থ বালকের সহিত প্রতাপের বন্ধুত্ব হয়। শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত উভয়েই বীর। তিন বন্ধু মিলিত হইয়া বঙ্গে পুনরায় হিন্দু স্বাধীনতা স্থাপনের কত কল্পনা করিতে লাগিলেন। কিরূপে মোগলদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া বঙ্গের বিলুপ্ত হিন্দু-গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা যায়, ইহাই বন্ধুত্রয়ের নিভৃতালাপের বিষয় হইল। অগ্নি যেমন বায়ুর সহায়তায় দ্বিগুণ শক্তিলাভ করে, প্রতাপের হৃদয়ের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাও শঙ্কর এবং সূর্য্যকান্তের মন্ত্রণাপ্রভাবে সেইরূপ জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রতাপ বন্ধু ও ক্রীড়া-সঙ্গীদিগকে লইয়া সুন্দরবনের নিবিড় দুর্ভেদ্য বনাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভীষণকায় গণ্ডার, ব্যাঘ্র, কুম্ভীর, ভল্লুক, হরিণ, সর্প প্রভৃতি শিকার করিয়া হৃদয়ের বীরত্ব-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেন। ভয়াবহ

সুন্দরবন তাঁহাদের প্রিয় লীলা-ক্ষেত্র হইল। পিতামহ, পিতা ও পিতৃব্য বালকের অমানুষিক দুঃসাহসিকতা দর্শন করিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

পাঠান-নৃপতি দাউদ শাহ্ মোগলের হস্তে পরাজিত হইলে সমগ্র বঙ্গরাজ্য সম্রাট্ আকবরের করায়ত্ত হয়। তখন রাজস্ব-সচীব টোডরমল্ল, বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়েব সাহায্যে বঙ্গের রাজস্ব বিভাগের সংস্কার-মানসে, তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া সম্রাট্-দরবারে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় কার্য্যকুশলতার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কয়েক বৎসর পরে সম্রাট্ কর্ত্তৃক সুন্দরবন অঞ্চল জমিদারী স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া উহা ভোগদখল করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর তাঁহারা স্বীয় জমিদারীতে প্রত্যাগমন করিয়া শৃঙ্খলা সহকারে শাসনকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় ভবানন্দের মৃত্যু হয়।

প্রতাপ যে কেবল অরণ্যে অরণ্যে বিচরণ করিয়া পশুহনন-ব্যাপারেই নিযুক্ত থাকিতেন তাহা নহে। যখন গৃহে অবস্থান করিতেন তখন তিনি অতিশয় দক্ষতা সহকারে ধীর শান্ত ভাবে নিজ রাজ্যের যাবতীয় শাসন-ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেন। বিক্রমাদিত্য পুত্রের স্বাধীনতা-লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় এত দূর ভীত ও বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি বসন্ত রায়ের নিকট প্রতাপকে ত্যাজ্যপুত্র করিবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন, কিন্তু স্নেহপরায়ণ বসন্তরায় নানা যুক্তিতর্কের দ্বারা বিক্রমাদিত্যকে বুঝাইয়া দেন যে, প্রতাপের দ্বারা কোনও অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই।

পিতা ও খুল্লতাত প্রতাপের বিবাহ দিয়া তাঁহার উদ্ধত স্বভাব সংযত করিতে মনস্থ করিলেন। পরমগুণবতী ও সৌন্দর্য্যশালিনী শরৎকুমারীর

সহিত শুভদিনে বিপুল সমারোহে প্রতাপের বিবাহ হইল। কিন্তু তাঁহার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। তিনি যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেন, বিবাহ তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে সমর্থ হইল না। উচ্চাভিলাষ যাঁহারা জীবনের লক্ষ্য, বিবাহের তুচ্ছ প্রলোভন তাঁহাকে টলাইতে পারিবে কেন ?

স্বাধীনতা-প্রয়াসী প্রতাপ পিতাকে মোগলের শাসন-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণার নিমিত্ত প্রায়ই বিরক্ত করিতেন। মোগলেরা প্রবল প্রতাপশালী, তাহাদের শক্তির নিকট বিক্রমাদিত্যের শক্তি ও সৈন্যবল যে অতি তুচ্ছ, এই কথা তিনি বারংবার প্রতাপকে বলিয়াও হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ হন নাই। অবশেষে তিনি মোগলের রাজধানী সুদূর আগ্রা নগরীতে মোগল সম্রাটের অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল পরাক্রম, কঠোর শাসননীতি, অগণিত সেনাবল প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্বীয় তুচ্ছতা উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত প্রতাপকে তথায় প্রেরণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি মনে করিলেন, অপরিণত-বুদ্ধি প্রতাপ অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন স্বাধীনতা লাভের জন্য যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে, যদি রাজধানীতে যাইয়া স্বচক্ষে মোগল-প্রতাপ প্রত্যক্ষ করিয়া আসে, তবে তাহার ঔদ্ধত্য ও ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব তিরোহিত হইবে; তিনি বসন্তরায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রতাপকে আগ্রায় প্রেরণ করিলেন। শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত, সুন্দর প্রভৃতি প্রতাপের বন্ধুগণও তাঁহার আগ্রা-গমনের সহযাত্রী হইলেন। জল-পথে গমন-সময়ে প্রতাপ নদীর উভয় তীরে বঙ্গের তথা ভারতের প্রাচীন নগর ও কীর্ত্তিরাজির ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন; গৌড়, পাটলীপুত্র, চুণার প্রভৃতি হিন্দু-নগরীর পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য আর আজ নাই, পাঠান ও মোগলের অমানুষিক অত্যাচারের

কঠোর স্পর্শ আজও সেই শ্মশান-নগরীর অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়া নিষ্ঠুরতার সাক্ষ্য দিতেছে;—দেখিতে দেখিতে প্রতাপের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, হিন্দুর অতীত গৌরব কি আর ফিরিয়া আসিবে না?—পবিত্র হিন্দুস্থান কি আবার হিন্দুর বিজয়শঙ্খের ভৈরব নিনাদে মুখরিত হইবে না?—বঙ্গমাতার এমন সন্তান কি কেহ নাই যে, বাংলার এই শ্মশান-ক্ষেত্রের ভস্মরাশি বিদূরিত করিয়া নন্দনের সুষমা ফুটাইয়া তুলিতে পারে?

প্রতাপ আগ্রায় পৌঁছিয়া কিছুদিন তথায় অবস্থান করিলেন। তাঁহার মধুর ব্যবহার, বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যা ও বীরত্বব্যঞ্জক অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শনে সম্রাট্ আকবর পরম পরিতুষ্ট হইলেন। প্রায় তিন বৎসরকাল প্রতাপ আগ্রায় অবস্থান করিয়া মোগলের রাজনীতি, রণকৌশল, সেনাবল প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তাঁহার আগ্রায় অবস্থান-কালেই চিতোরের রাণা প্রতাপসিংহ মেবারকে মোগলের দাসত্বপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য রাজসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনচারী সন্ন্যাসীর ন্যায় পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া মোগল-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছিলেন। সহস্র বাধা, বিপত্তি, অনাহার-অনিদ্রাকে অকাতরে বরণ করিয়া লইয়াও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ তিনি জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন। রাণা প্রতাপের অমানুষিক ধৈর্য্য, বীরত্ব, অধ্যবসায় ও সংগ্রাম-কাহিনী প্রতাপাদিত্য আগ্রা নগরীতে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয়ও রণোন্মাদনায় নৃত্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, একবার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জমিদারীর ভার গ্রহণ করিতে পারিলেই বঙ্গের স্বাধীনতার জন্য জীবন পণ করিবেন।

প্রতাপের পিতা বিক্রমাদিত্য জ্যেষ্ঠ সহোদর হইলেও কনিষ্ঠ বসন্তরায়ই

রাজ্যশাসন করিতেন। খুল্লতাতের উপর প্রতাপাদিত্যের একটা স্বাভাবিক বিদ্বেষ ছিল। বসন্তরায় যতই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, প্রতাপ যেন সেই স্নেহের আবরণে ততই শত্রুতার ভাব লক্ষ্য করিতেন। তিনি কৌশলক্রমে সম্রাটের নিকট হইতে বসন্তরায়ের পরিবর্ত্তে স্বয়ং জমিদারী শাসনের অনুমতি-পত্র লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পিতা ও পিতৃব্যকে জানাইলেন যে, সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করিয়া পরোয়ানা প্রদান করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য এবং বসন্তরায় উভয়েই এই সংবাদে পরম পুলকিত হইয়া প্রতাপের করে রাজ্যশাসনের অধিকাংশ ভার অর্পণ পূর্ব্বক ভগবচ্চিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। প্রতাপাদিত্য এইবার তাঁহার আজন্ম-কাঙ্ক্ষিত ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইলে সুশিক্ষিত ও উপযুক্ত সৈন্যবল প্রয়োজন, এই অভাব মোচনের জন্য তিনি স্বীয় প্রজাবৃন্দের মধ্যে সামরিক শিক্ষার প্রচার করিতে লাগিলেন। যুবকদল অশ্ব-চালন, তীরনিক্ষেপ, বন্দুকব্যবহার, অসিঘূর্ণন প্রভৃতি বীরোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে আরম্ভ করিল। দেশময় একটা নব উদ্দীপনার সাড়া পড়িয়া গেল। শত্রুকে বিপদাপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রতাপ সুন্দরবন অঞ্চলে বহু সুপ্রসর খাল খনন করাইলেন। রাজ্যের নানাস্থানে সুদৃঢ় দুর্গ সকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল। তৎকালে সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী ভূভাগসমূহ দুর্দ্দান্ত মগ ও পর্ত্তুগীজগণের অত্যাচারে ভীষণভাবে উৎপীড়িত হইতেছিল; তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত প্রতাপ বহুসংখ্যক যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণ করাইলেন, ইহাতে তাঁহার দুই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইল। শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত, সুন্দর এবং আরও বহু বীর যুবক প্রতাপের সহিত মিলিত হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

দূরদর্শী বিক্রমাদিত্য বুঝিতে পারিলেন, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত বসন্তরায়ের পুত্রগণের সহিত রাজ্য লইয়া প্রতাপাদিত্যের একটা দারুণ মনোমালিন্যের সঞ্চার হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া তিনি উহা ॥৵০ এবং ।৵০ এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া প্রতাপকে ॥৵০ এবং বসন্তরায়কে ।৵০ প্রদান করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুতে প্রতাপ অন্তরে দারুণ আঘাত পাইলেন। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাপনান্তে তিনি আবার স্বীয় অভীপ্সিত কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইলেও প্রতাপ খুল্লতাতের সহিত একত্রেই রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। কিন্তু এইবার প্রতাপ স্বতন্ত্র স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া নিজে তাহা শাসন করিতে ইচ্ছা করিলেন। বসন্তরায় ইহাতে বিন্দুমাত্রও আপত্তি করিলেন না, বরং সানন্দে প্রতাপের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। প্রতাপ উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন, বহু সন্ধানের পর একটা স্থান তাঁহার মনঃপূত হইল। স্থানটীর নাম ধূমঘাট। উহা যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। সেই সময় ধূমঘাট ঘোর অরণ্যসমাকুল ছিল। প্রায় ৮।১০ মাইল পরিমিত স্থানের জঙ্গল পরিষ্কৃত করিয়া দুর্গ ও পরিখার দ্বারা স্থানটী সুরক্ষিত করতঃ সেই স্থলে রাজধানী স্থাপিত হইল। অল্পদিন মধ্যেই ধূমঘাট সৌধশোভিত উদ্যান-সরোবরাদি পরিপূর্ণ একটী বহু জনাকীর্ণ নগরে পরিণত হইল। শুভদিনে প্রতাপাদিত্য পরিবারবর্গসহ পুরপ্রবেশ করিলেন। এই সময় হইতে তিনি একজন প্রবল প্রতাপশালী জমিদারের ন্যায় স্বীয় রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তখনও তাঁহাকে বার্ষিক রাজ-কর নিয়মিত ভাবে মোগল রাজ-সরকারে পাঠাইতে হইত।

কমল খোজা নামক পাঠান প্রতাপের একজন অতি বিশ্বস্ত সেনানী

ছিলেন। কমলের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া প্রতাপ তাঁহাকে একটী সৈন্যদলের নেতৃত্ব অর্পণ করেন। তখন রাজধানী ধূমঘাটের অনতিদূরে আর একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছিল। কমল খোজার উপর উহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি দিবারাত্র সেখানে বসিয়া দুর্গ-নির্ম্মাণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এক গভীর তমসাচ্ছন্ন নিশীথে কমল দুর্গদ্বারে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, অদূরবর্ত্তী অরণ্যের মধ্য হইতে একটী আলোক-শিখা উত্থিত হইয়া গগনমার্গে বিলীন হইয়া যাইতেছে। প্রতি রাত্রিতেই তিনি বনমধ্যে এই জ্যোতির বিকাশ দেখিয়া স্বীয় প্রভুকে অবশেষে তাহা জ্ঞাপন করেন। প্রতাপ জঙ্গল কর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, সে স্থানে প্রস্তরময়ী এক অতি ভীষণা কালীমূর্ত্তি রহিয়াছেন। তখন তিনি সেই স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই দেবীই "যশোহরেশ্বরী" নামে অভিহিতা। দেশদেশান্তর হইতে দলে দলে লোক আসিয়া দেবীর পূজা করিতে লাগিল। প্রতাপ ভগবতী কালিকার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন বলিয়া দেশময় প্রচারিত হইয়া গেল। যে স্থানে দেবী আবিষ্কৃত হইলেন তাহার নাম ঈশ্বরীপুর। অদ্যাপি দেবী যশোহরেশ্বরী তথায় বিরাজিতা রহিয়াছেন। দেবী যশোহরেশ্বরী আবিষ্কৃত হওয়ার পর প্রতাপাদিত্য যেন স্বীয় তেজোবীর্য্য অধিকতর নবীনভাবে নিজের ভিতর অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তাঁহার কল্পিত মাতৃ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-সময়েই যখন জননী ভগবতী রণচণ্ডিকা মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখা দিয়াছেন, তখন অবশ্যই তিনি স্বীয় অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইবেন। এই সময় প্রতাপের উদয়াদিত্য নামক জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

প্রতাপ তখনও মোগলের সামন্তভাবেই স্বীয় রাজ্য পরিচালন করিতে
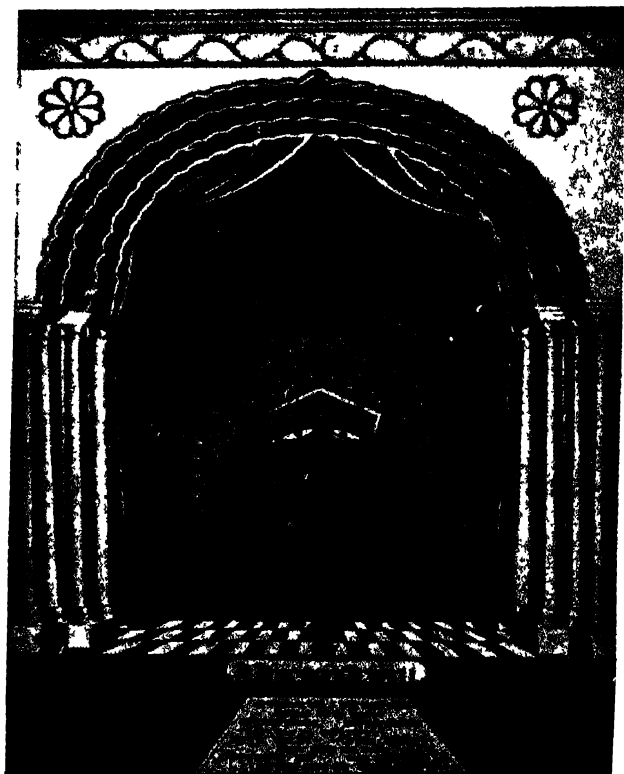
শ্রীশ্রীমাতা যশোহরেশ্বরী দেবী

—২৪ পৃষ্ঠা

লাগিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে হইলে যতটুকু শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চয় করিয়া লওয়া প্রয়োজন, তখন পর্য্যন্ত তাহা সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয় নাই। তিনি প্রথমে স্বীয় রাজ্য সুরক্ষিত করিয়া পরে মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মোগলের বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইলে দুর্গ, সৈন্য, নৌ-বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র এবং খাদ্যাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। সেই জন্য তিনি স্বীয় রাজ্যে উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিয়া অসংখ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। এই সমুদয় দুর্গ খাদ্যদ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্যের দ্বারা সর্ব্বদা পরিপূর্ণ রাখিবার ব্যবস্থাও করিলেন। তাঁহার সৈন্যদল নয় ভাগে বিভক্ত ছিল; তিনি উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করিয়া ক্ষমতানুযায়ী তদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, ফিরিঙ্গী, কুকি প্রভৃতি নানা শ্রেণীর নানা জাতীয় লোক কার্য্যদক্ষতা অনুসারে সৈন্যদলে গৃহীত হইত।

প্রতাপের রাজ্য নদীবহুল দেশ, সুতরাং সে দেশ রক্ষা করিতে হইলে কেবল স্থল-সৈন্যের উপর নির্ভর করিলে চলে না। বিশেষতঃ মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইলে এবং মগ ও ফিরিঙ্গীর অত্যাচার দমন করিতে হইলে, নদীবহুল দেশে যথেষ্ট নৌ-বল থাকা প্রয়োজন। আগ্রায় অবস্থান-কালে প্রতাপ লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন যে, মোগলের নৌ-বল তত পর্য্যাপ্ত নহে। নদীবহুল দেশে মোগলদিগকে পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত করিতে হইলে নৌ-বলের যথেষ্ট আবশ্যক বিবেচনায় প্রতাপ যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণ, পোতাশ্রয় রচনা এবং নৌ-সৈন্য গঠনে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাঁহার বহু সহস্র রণতরী এবং নৌ-সৈন্য ছিল। চাকশিরি, জাহাজঘাটা প্রভৃতি কতকগুলি স্থানে প্রতাপের নৌ-বহর রক্ষার প্রধান স্থান ছিল।

রাজ্যপরিচালনে প্রতাপাদিত্যের অসীম অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজ্য সুনিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত করিতে হইলে বিভিন্ন বিভাগের নেতৃত্ব উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করা আবশ্যক। প্রতাপ এই নীতি অনুসরণ পূর্ব্বক অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ ব্যক্তিবর্গের উপর রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। প্রগাঢ় বুদ্ধিসম্পন্ন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সুপণ্ডিত শঙ্কর রাজ্যের দেওয়ানী-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তৃপদে সমাসীন থাকিয়া রাজস্ব, আয়ব্যয়, রাজ্যশাসন প্রভৃতি কার্য্য সুন্দররূপে পরিচালন করিতেন। সূর্য্যকান্ত বীরত্ব-প্রতিভাশালী, প্রধান সেনাপতিরূপে তিনি সৈন্যসংগ্রহ, যুদ্ধ-ব্যবস্থা, অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ প্রভৃতি যাবতীয় সামরিক কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত ছিলেন প্রতাপের আশা-ভরসা, শক্তি, উৎসাহ, সহচর, মন্ত্রী, বন্ধু,—এক কথায় দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।

এই প্রকারে রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রতাপ শ্রীক্ষেত্র দর্শনে যাইবার অভিলাষী হইলেন। লোকে বুঝিল, তিনি তীর্থ-যাত্রা করিতেছেন, কিন্তু প্রতাপের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্থলপথে যাইতে যাইতে সমগ্রদেশের রাজনীতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা। কেহ কেহ বলেন, তখন বিদ্রোহী পাঠানগণ জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিয়া কটক অধিকারে অগ্রসর হয়, এই নিমিত্ত মোগল-সম্রাট্ মানসিংহের উপর সামন্ত রাজগণকে লইয়া পাঠানদিগকে দমন করিবার আদেশ দেন; এই আদেশ-ক্রমেই প্রতাপকে উড়িষ্যাভিযানে সসৈন্য যোগদান করিতে হয়। যাহা হউক, প্রতাপ যখন উড়িষ্যা যাত্রা করেন, তখন বসন্তরায় তাঁহাকে গোবিন্দদেব নামক শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ ও উৎকলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আনয়ন করিবার জন্য বলিয়া দেন। প্রতাপ খুল্লতাতের আদেশ প্রতিপালনে অবহেলা

করেন নাই। ঐ দুইটী বিগ্রহ উৎকলীয়দিগের পরম আদরের সামগ্রী। যে ভাবেই হউক, সুচতুর প্রতাপ উক্ত বিগ্রহ দুইটী হস্তগত করিয়া যখন স্বদেশাভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হন, তখন উৎকলবাসিগণ জানিতে পারে যে, তাহাদের পরমারাধ্য দেবতা প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইতেছে। অমনি সমগ্র উড়িষ্যা প্রদেশে এই বিগ্রহ-অপসরণ-বার্ত্তা তড়িৎবেগে প্রচারিত হইয়া পড়িল। উৎকলের রাজন্যবর্গ বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রতাপের গতিরোধ করিতে ধাবিত হইলেন। বীর প্রতাপ স্বয়ং অসীম উৎসাহে ও অমিত উদ্দীপনায় স্বীয় সৈন্যগণকে পরিচালিত করিয়া সুবর্ণরেখাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এই স্থলে উৎকল-সৈন্যের সহিত প্রতাপের ভীষণ সংঘর্ষ হইল; প্রতাপ জয়লাভ করিয়া বিগ্রহসহ বিজয়-উল্লাসে রাজধানী যশোহরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক খুল্লতাতের করে তাহা অর্পণ করিলেন। বসন্তরায় বিগ্রহ পাইয়া পরম পুলকিত হৃদয়ে বিরাট সমারোহের সহিত উহা প্রতিষ্ঠিত করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতাপ বাল্যকাল হইতেই অন্তরে অন্তরে খুল্লতাত বসন্তরায়ের প্রতি একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। বসন্তরায় তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিলেও, প্রতাপ যেন তাঁহার সেই স্নেহের অন্তরালে শত্রুতার ভাব দেখিতে পাইতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই খুল্লতাত-বিদ্বেষ ভীষণ আকার ধারণ করিতে লাগিল; পরিশেষে প্রতাপের চরিত্র একটা অনপনেয় কলঙ্ক-কালিমায় প্রলিপ্ত করিয়া এই বিদ্বেষ সমাপ্তি লাভ করিল। যতদিন ইতিহাস থাকিবে, ততদিন প্রতাপ-চরিত্রের এই কলঙ্ক ঘোষিত হইবে। বসন্তরায়ের পুত্রগণ প্রতাপকে শত্রুভাবে দেখিতেন, তাঁহাদের মধ্যে একটা আজন্ম মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছিল। সম্পত্তি বিভক্ত হইলে 'চাকশিরি' নামক একটী স্থান

অন্য স্থানের বিনিময়ে প্রতাপ খুল্লতাতের নিকট প্রার্থনা করেন, কিন্তু গোবিন্দরায়ের চক্রান্তে তাঁহার সে প্রার্থনা নিষ্ফল হইল, পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রতাপ খুল্লতাতের উপর ভীষণ জাতক্রোধ হইলেন। তিনি রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুগঠিত করিয়া মোগলের বিরুদ্ধে আয়োজন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে বসন্তরায় তাঁহাকে সাহায্য করিলেন না, বরং প্রতিনিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রতাপের মনে হইতে লাগিল যে, খুল্লতাত দেশদ্রোহী এবং মোগলের অনুগ্রহ-ভিক্ষুক, তিনি তাঁহার আজন্ম-কাঙ্ক্ষিত কর্ম্ম-সাধনে বাধা প্রদান করিতেছেন। ইহা ভাবিতে ভাবিতে প্রতাপের মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠিল, জন্মভূমির মুক্তিসাধনে যে কোনও বাধা তিনি নখাগ্রে ছিন্ন করিয়া ফেলিতে কৃতসঙ্কল্প। কালক্রমে উভয়ের আচরণে উভয়েরই মনে এমন একটা অমূলক ধারণা বদ্ধমূল হইয়া পড়িল যে, বুঝি উভয়েই উভয়ের বধসাধনের আয়োজন করিতেছেন।

এই অন্তর্ব্বিবাদের সময় বসন্তরায়ের পিতৃশ্রাদ্ধ-তিথি উপস্থিত হইল। শ্রাদ্ধ-দিবসে তিনি প্রতাপকে স্ব-গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রতাপ শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুসহ স্বীয় রাজধানী ধূমঘাট হইতে পিতৃব্য-গৃহে গমন করিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ-কালে তিনি শুনিতে পাইলেন, বসন্তরায় গৃহান্তর হইতে ভৃত্যকে গঙ্গাজল আনয়নে আদেশ করিতেছেন। বসন্তরায়ের একখানি প্রিয় তরবারির নামও ছিল "গঙ্গাজল"। প্রতাপ মনে করিলেন, বসন্তরায় বুঝি তাঁহাকে স্বীয় পুরাভ্যন্তরে প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব শত্রুতা সাধন করিবার জন্য "গঙ্গাজল" আনিতে বলিতেছেন। বসন্তরায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রাদ্ধের নিমিত্ত গঙ্গাজল আনিতে বলিয়াছিলেন। প্রতাপ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া স্বীয়

তরবারি কোষমুক্ত করিলেন। গোবিন্দরায় দূর হইতে পিতার "গঙ্গাজল" আনয়ন করিবার আদেশ শুনিয়া এবং প্রতাপকে কোষমুক্ত তরবারি হস্তে ধাবিত হইতে দেখিয়া তাঁহার শির লক্ষ্য করিয়া শাণিত তীর নিক্ষেপ করিলেন; তীর প্রতাপের মস্তক অণুমাত্র স্পর্শ না করিয়া চলিয়া গেল। প্রতাপের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। তিনি ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া গিয়া তরবারি-প্রহারে গোবিন্দরায়ের মস্তক স্কন্ধ-চ্যুত করিয়া ফেলিলেন। গোবিন্দরায়কে নিহত হইতে দেখিয়া পুরমধ্যে আতঙ্কজনিত একটা মহাকোলাহলের সৃষ্টি হইল। প্রতাপ সে স্থলে তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া শোণিত-রঞ্জিত মুক্ত তরবারি হস্তে বসন্তরায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। বসন্তরায় তখন পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিলেন; প্রতাপকে অমন রুধিরাক্ত কলেবরে সংহারক মূর্ত্তিতে আসিতে দেখিয়া তিনি তাঁহার দুরভিসন্ধি হৃদয়ঙ্গম করিয়া "গঙ্গাজল" অস্ত্র আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু "গঙ্গাজল" আসিবার পূর্ব্বেই প্রতাপের করধৃত শাণিত তরবারির আঘাতে তাঁহার জীবন-নাট্যের যবনিকাপাত হইল। বসন্তরায়ের পুত্রগণ, আত্মীয়বর্গ এবং রক্ষিসৈন্যগণ প্রতাপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি সহযোগিবৃন্দের সহায়তায় তাঁহাদের অধিকাংশকেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অন্তঃপুরে শোণিত-গঙ্গা প্রবাহিত হইল। এই জঘন্য পাপকার্য্যের জন্য বীরত্বখ্যাতি-মণ্ডিত প্রতাপের জীবন একটা অনপনেয় কলঙ্কে মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। এই পৈশাচিক কলুষিত কার্য্যানুষ্ঠানের ফলে প্রতাপকে সারা জীবন আত্মগ্লানি এবং অনুতাপের অনলে দগ্ধীভূত হইতে হইয়াছে। প্রতাপ মানুষ, তিনি পিশাচ নহেন; খুল্লতাত ও জ্ঞাতিবধ যে তাঁহার পক্ষে কি ঘোর পাপকার্য্য হইয়াছে, তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। পিতৃব্য-হত্যার পাপেই

প্রতাপ শেষে পুড়িয়া মরিয়াছিলেন,—এই পাপেই জন্মভূমিকে স্বাধীন করিবার মহাব্রত বুঝি তাঁহার ব্যর্থ হইয়া গেল।

বসন্তরায়ের রাঘব নামক আর একটী শিশু পুত্র ছিল। প্রতাপের তরবারির আঘাতে যখন বসন্তরায়ের অন্তঃপুরে রুধির-স্রোত বহিতে লাগিল, সেই সময় রাঘবের জননী পুত্রের প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে কচুবনে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন, তদবধি রাঘব "কচুরায়" নামে পরিচিত হইয়া পড়িলেন। ইতিহাসেও রাঘব "কচুরায়" নামেই পরিচিত। প্রতাপ কচুরায়কে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া গিয়া পরম স্নেহে পরম আদরে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজ্যের কতিপয় কুচক্রী সমবেত হইয়া গোপনে কচুরায়কে রাজভবন হইতে উদ্ধার করিয়া হিজলির অধীশ্বর ইশাখাঁর নিকট উপস্থিত হইল। এই কুচক্রিদলের মধ্যে রূপরাম বসু অন্যতম এবং অগ্রণী। ইশাখাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহারা নানাভাবে তাঁহাকে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। দূতমুখে এই কথা শুনিয়া প্রতাপের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি অনতিবিলম্বে ইশাখাঁর হিজলি-রাজ্য আক্রমণ করিয়া ধূলিসাৎ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত, রডা, মদন, রঘু প্রভৃতি বীরবৃন্দকে আহ্বান পূর্ব্বক সৈন্য এবং রণতরী সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। যোদ্ধবর্গের উৎসাহে সমগ্র যশোহর-রাজ্য রণোল্লাসে মত্ত হইয়া উঠিল। প্রতাপ যশোহরেশ্বরী দেবীকে মহাসমারোহে অর্চ্চনা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে জাহাজঘাটা হইতে রণপোত আরোহণ পূর্ব্বক হিজলি অভিমুখে দ্রুত ধাবিত হইলেন।

ইশাখাঁ মছন্দরীও যুদ্ধায়োজনের ত্রুটী করিলেন না। তাঁহার সেনাপতি বীরবর বলবন্ত অসীম নিপুণতা সহকারে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে

লাগিলেন। প্রতাপ-সৈন্য কর্ত্তৃক ইশাখাঁর সৈন্যগণ জল ও স্থলপথে অবরুদ্ধ হইয়া ব্যাঘ্রতাড়িত কুরঙ্গযূথের ন্যায় বিপদে পতিত হইল। রঘু, মদন, সূর্য্যকান্ত, শঙ্কর, রডা প্রভৃতি বীরবৃন্দের অদ্ভুত রণ-নৈপুণ্যে ইশাখাঁর সৈন্যদল সর্ব্বত্র পরাজিত হইতে লাগিল। কামানশ্রেণী হইতে জ্বলন্ত গোলকরাজি নির্গত হইয়া জলস্থলকে অগ্নিময় করিয়া তুলিল; হিজলির অধিবাসিগণ ভীতত্রস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। প্রতাপ স্বয়ং যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিয়া স্বীয় সৈন্য ও সেনাপতিদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসাহ-বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া যেন সৈন্যদল প্রতি মুহূর্ত্তে নবীন বল সঞ্চয় পূর্ব্বক শত্রুসৈন্য সংহার করিতে লাগিল! এইভাবে যুদ্ধ চলিয়া প্রতাপ-সৈন্য-নিক্ষিপ্ত একটী গোলার আঘাতে ইশাখাঁ ধরাশায়ী হইলেন। হিজলি-পতির এতাদৃশ শোচনীয় মৃত্যু দর্শনে তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। বীরবর বলবন্ত শত চেষ্টা করিয়াও এই পলায়নোন্মুখ সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে বিপক্ষের গোলার আঘাতে অল্পক্ষণ মধ্যেই তিনিও মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন।

যুদ্ধে প্রতাপ জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু যে জন্য এই যুদ্ধায়োজন তাহা সম্যক চরিতার্থতা লাভ করিল না। ধূর্ত্ত রূপরাম পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে, এই মহাসংগ্রামে হিজলি-পতির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তিনি যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অল্প দিন পরেই কচুরায়কে লইয়া দিল্লী অভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন।

প্রতাপ হিজলি বিজয় পূর্ব্বক সেখানে হিন্দু শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া বিজয়লব্ধ ধনরত্নাদিসহ মহাসমারোহে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যশোহর-রাজ্য প্রতাপের বিজয়-দুন্দুভি-নিনাদে সজীব হইয়া উঠিল।

প্রজাবৃন্দ বিজয়ী রাজার অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন করিল, রাজধানী ধূমধাটের ঘরে ঘরে বিজয়-উৎসব আরম্ভ হইল। প্রতাপ সর্ব্বপ্রথমে জননী যশোহরেশ্বরী দেবীর মন্দিরে গমন করিয়া ষোড়শোপচারে দেবীর অর্চ্চনা করিলেন এবং ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ও সৈন্যদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া নানা উপহার-দ্রব্য প্রদান করিলেন।

হিজলী বিজয় করিয়া প্রতাপ যশোহরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শুনিতে পাইলেন যে, বিক্রমপুরের অধীশ্বর চাঁদরায ও কেদাররায় নামক বীরদ্বয় তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবার আয়োজন করিতেছেন। প্রতিবাসী জমিদারের এই ঔদ্ধত্য প্রতাপের সহ্য হইল না, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সসৈন্য তাঁহাদের রাজধানী শ্রীপুর আক্রমণ করিলেন। চাঁদরায় কেদাররায়ও পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন, তাঁহারাও প্রতাপকে বাধা দিবার নিমিত্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইলেন। দুই দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রতাপের আগ্নেয়াস্ত্র শ্রাবণের ধারার মত শ্রীপুরের উপর অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল। শ্রীপুরের কামানসমূহও প্রত্যুত্তর প্রদানে বিরত হয় নাই। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর চাঁদরায় কেদাররায় বুঝিতে পারিলেন,—হিন্দুতে হিন্দুতে, ভাইয়ে ভাইয়ে, যুদ্ধ আত্মশক্তিনাশ ও দেশের অনিষ্ট-সাধন ব্যতীত আর কিছুই নহে,—এ যুদ্ধ হিন্দুর সর্ব্বনাশ ও মোগল-উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিবে মাত্র। তখন তাঁহারা প্রতাপের নিকট সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। প্রতাপ চাঁদরায় কেদাররায়ের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইলেন যে,—তাঁহারা জননী জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সমবেত হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে দ্বিরুক্তি করিবেন না,—জন্মভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করাই তাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য

হইবে ;—কোনও প্রকার প্রলোভনে বশীভূত বা ভয়ে অভিভূত হইয়া কেহ মোগলের অধীনতা স্বীকার বা পক্ষাবলম্বন করিতে পারিবেন না।

বঙ্গের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ দুর্দ্দান্ত পর্ত্তুগীজ দস্যুর অত্যাচারে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, দুর্ব্বৃত্তেরা জলপথে আসিয়া এক একটা গ্রামের উপর আপতিত হইয়া গ্রামবাসীদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক অসংখ্য যুবকযুবতী ও বালকবালিকা ধরিয়া লইয়া গিয়া স্থানান্তরে দাসরূপে বিক্রয় করিত। তৎকালে ফিরিঙ্গী-ভীতি এতদূর প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহাদের আগমন-সংবাদ শুনিবা মাত্রই গ্রামবাসিগণ ভয়ে গ্রামান্তরে পলায়ন করিত। এইরূপে প্রতিবৎসর যে কত সমৃদ্ধিশালী ধনজনপূর্ণ গ্রাম দুর্ব্বৃত্ত পর্ত্তুগীজ দস্যুর পাশবিক অত্যাচারে শ্মশানে পরিণত হইত তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা সাধ্যাতীত। প্রতাপ হৃদয়ঙ্গম করিলেন, ফিরিঙ্গীগণ দেশের যে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে তাহা নিবারণ করিতে না পারিলে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়া ফল নাই। দেশের এই কল্যাণ সাধনোদ্দেশে তিনি আরাকানাধিপতি মগরাজার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। এই বন্ধুত্বের বিনিময়ে মগরাজ ফিরিঙ্গী-দলনে প্রতাপাদিত্যকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। দেশীয় জমিদারবর্গের সমবেত শক্তি, মগরাজের ভুজবল এবং প্রতাপের প্রবল পরাক্রম একত্র হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই পর্ত্তুগীজ দস্যুদলকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইল। ভীতি-বিহ্বল আতঙ্কগ্রস্ত দেশ আবার পূর্ব্ব শান্তি ফিরিয়া পাইল।

পুনঃ পুনঃ কয়েকটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রতাপ বুঝিতে পারিলেন যে, মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার উপযুক্ত শক্তি তিনি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর বেশী দিন মোগলের অধীন সামন্ত নৃপতিরূপে হীন জীবন যাপন করা স্বাধীনতা-

প্রয়াসী প্রতাপের সহ্য হইল না। তিনি অচিরে স্বাধীনতা ঘোষণার আয়োজন করিতে লাগিলেন। স্বাধীন নরপতির মত রাজসিংহাসনে বসিতে না পারিলে তাঁহার হৃদয় শান্ত ও তৃপ্ত হইবে না। তৎকালীন ভৌমিক রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রতাপাদিত্যই ছিলেন সর্ব্বপ্রধান। রাজসূয়-যজ্ঞের ন্যায় বিরাট অনুষ্ঠান সহকারে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া তিনি রাজধানী ধূমধাটে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বঙ্গের নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া রাজা, ভৌমিক, জমিদার ও আত্মীয়বর্গ ধূমঘাটে আগমন করিয়া এই নবীন স্বাধীন হিন্দু নৃপতিকে অভিনন্দিত করিলেন। যশোহর-রাজ্য যেন একটা নবীন মন্ত্রশক্তির উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল, মহোৎসবের অবিরাম ধারা বহিয়া চলিল। সমবেত ব্যক্তিবর্গকে প্রতাপ বঙ্গের দুর্দ্দশা ওজস্বিনী ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন;—তাঁহার এই স্বাধীনতা ঘোষণা স্বীয় স্বার্থসংরক্ষণের জন্য নহে, সমগ্র বঙ্গের—সমগ্র জাতির কল্যাণের জন্য; আর তাঁহার এই স্বাধীনতার প্রয়াস, পরিপোষণ, সংরক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে বঙ্গের প্রত্যেক ভৌমিক-রাজের ক্ষাত্রশক্তির উপর। প্রতাপ সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষারূপ মহাব্রত উদ্‌যাপনে অনন্ত বাধাবিঘ্নকে উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে,—জীবন-মৃত্যু লইয়া কন্দুক-ক্রীড়া করিতে হইবে;—তিন শত বৎসর ধরিয়া জাতির বুকের উপর যে পাষাণ-স্তূপ সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহা অপসারিত করিতে হইলে হিংসা, বিবাদ, আত্মকলহ বিস্মৃত হইয়া একতার বৈজয়ন্তী-তলে সমবেত হইতে হইবে,—দেশমাতৃকার পূজায় সর্ব্বপ্রকার ঐহিক সুখ বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

প্রতাপ নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন। প্রচণ্ড মোগল-শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইলে যেরূপ আয়োজন আবশ্যক, দূরদর্শী প্রতাপ

প্রতাপাদিত্যের রণতরী —৩৫ পৃষ্ঠা

উপযুক্ত ব্যক্তির উপর তাহার ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যকান্ত, শঙ্কর, মদন, ভবানীদাস, প্রদাপদত্ত প্রভৃতি কর্ম্মচারিবৃন্দ বিভিন্ন বিভাগের ভারগ্রহণ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে কর্ম্মসম্পাদন করিতে লাগিলেন। রাজ্যের সর্ব্বত্র দুর্গ নির্ম্মিত হইয়া নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে এবং খাদ্যদ্রব্যে তাহা পূর্ণ হইতে লাগিল। নৌ-শক্তি বৃদ্ধির জন্য রণপোত সকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল। চাকশ্রী একটী প্রধান পোতাশ্রয়ে পরিণত হইল। নিত্য দলে দলে নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের যুদ্ধশিক্ষার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। মোগলদিগের শক্তি এবং গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত সুদক্ষ ও সুচতুর গুপ্তচর সকল ইতস্ততঃ প্রেরিত হইল। আপামর সাধারণকে মোগল-শক্তির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া মাতৃ-পূজায় যৌগদানের আমন্ত্রণের নিমিত্ত বাগ্মিপ্রবর শঙ্কর বঙ্গের নানাস্থানে পর্য্যটন পূর্ব্বক বক্তৃতা এবং উপদেশ দিতে লাগিলেন। শঙ্করের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় সমগ্র দেশে যেন একটা তড়িৎ শক্তির সঞ্চার হইল। প্রচার-কার্য্য করিতে করিতে শঙ্কর মোগলের শক্তি পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত যাইয়া রাজমহলে উপস্থিত হন। সে স্থানের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শের খাঁ নামক এক ব্যক্তি কৌশলে শঙ্করকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু সুচতুর শঙ্কর অবিলম্বে কারাগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া যশোহরে উপনীত হন। ইহার ফলে শের খাঁর সহিত প্রতাপাদিত্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন; প্রতাপের নৌ-বাহিনী মুসলমান সৈন্যদিগকে রাজমহল পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়া দেয়।

হিজলি-অধিপতি ইশাখাঁর সহিত যখন প্রতাপের যুদ্ধ উপস্থিত হয় তখন প্রতাপ-শক্তি-অভিজ্ঞ রূপরাম বসু প্রতাপ-হস্তে পাঠানের পরাজয়

সুনিশ্চিত বুঝিয়া কচুরায়কে লইয়া দিল্লীতে পলায়ন করেন। ইঁহারা যখন দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন প্রতাপের ঔদ্ধত্যের কাহিনী ক্রমাগতই সম্রাট্ আকবরের কর্ণগোচর হইতে থাকে এবং রূপরাম ও কচুরায় উহার সমর্থন করেন। সম্রাট্ প্রতাপের এবম্বিধ আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাস্তিদানের নিমিত্ত ইব্রাহিম খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে সৈন্যসহ প্রেরণ করেন, কিন্তু প্রতাপের বীর্য্যবহ্নির নিকট এই মোগল সৈন্যদল শুষ্কতৃণবৎ দগ্ধ হইয়া গেল। সম্রাট্ পুনরায় আজিম খাঁ নামক একজন সেনাপতির অধীনে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন, বঙ্গবাসীর প্রবল শক্তির নিকট তাহারাও পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। সম্রাট্ পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে ক্রোধান্ধ হইয়া অতঃপর মানসিংহকে দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্যদল-সমন্বিত বিরাট বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে প্রেরণ করেন। সন্ধান নির্দ্দেশের জন্য রূপরাম এবং কচুরায় সেই অভিযানের সহযাত্রী হইয়া বাংলা দেশে আসেন। বাংলায় পৌঁছিয়া মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদার নামক এক স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণের সাহায্য প্রাপ্ত হন। এই ব্রাহ্মণ যশোহরের রাজবংশের অন্নে পরিপুষ্ট, পূর্ব্বে সে এই রাজ-সরকারেই সামান্য কর্ম্ম করিত, পরে অন্যত্র কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধনশালী হইয়াছিল। এইবার ভবানন্দ কৃতজ্ঞতা-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে মানসিংহের সহিত যোগদান পূর্ব্বক প্রতাপের সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর হইল। বঙ্গের সামান্য সামান্য আরও কয়েকজন জমিদারও মানসিংহের সহিত যোগদান করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রধান। এই লক্ষ্মীকান্তও প্রতাপের অন্নে প্রতিপালিত। এই বিশ্বাসঘাতকদিগের সাহায্য পাইয়াই মানসিংহের স্বকার্য্যসাধনে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

এই সময় সপ্তাহকালব্যাপী ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতে প্রতাপের প্রধান শক্তি নৌ-বহর সমূহ অধিকাংশই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, প্রতাপ ইহাতে অনেকটা হতোদ্যম হইয়া পড়েন।

যশোহরের প্রাচীন রাজধানী মুকুন্দপুরের অনতিদূরস্থ বসন্তপুরে মানসিংহ প্রতাপের সৈন্যশ্রেণী কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলেন। সেই স্থানে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রতাপের সৈন্য ও কামানশ্রেণী সজ্জিত ছিল, যমুনাবক্ষে রণপতাকা ধারণ করিয়া যুদ্ধজাহাজসমূহ শোভা পাইতেছিল। কাজেই মানসিংহ আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, এইখানে তাঁহাকে শিবির সন্নিবেশিত করিতে হইল। অতঃপর তিনি একখানি তরবারি ও একগাছি শৃঙ্খল জনৈক দূতের দ্বারা প্রতাপাদিত্যের রাজ-দরবারে প্রেরণ করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—হয় প্রতাপ শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়া মোগলের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হউন, নতুবা তরবারি গ্রহণপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান করুন। বীর প্রতাপ শৃঙ্খল পদদলিত করিয়া তরবারি গ্রহণ করিলেন। সমরানল প্রজ্বলিত হইল। প্রতাপের কামানোদ্গীর্ণ গোলকসমূহ গগন কম্পিত করিয়া বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কয়েক দিবস ব্যাপিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ চলিল। কোনও দিন প্রতাপ-পক্ষ কোনও দিন মোগল-পক্ষকে বিজয়লক্ষ্মী কৃপা করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে মানসিংহের দশজন আমীর নিহত হয়। বাঙ্গালীর বীরত্বে মানসিংহ ভীত হইয়া পড়িলেন। যে বীর্য্যপ্রভাবে তিনি সুদূর কাবুল বিজয় করিয়াছেন,—যে বীরত্বের নিকট রাজপুত জাতি পরাভব স্বীকার করিয়াছে,—যে বিক্রমবলে সমগ্র উত্তর ভারত কম্পিত হইয়াছে, আজ বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্যের নিকট সে বীরত্ব পরাজিতপ্রায়! মানসিংহ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন কি উপায়ে বিজয়লাভ সম্ভব?

পাপিষ্ঠ ভবানন্দ মজুমদার, কচুরায় প্রভৃতি দেশদ্রোহীর প্ররোচনায় মানসিংহ এক দিন বিপুল সমারোহে রণচণ্ডিকার পূজা সম্পন্ন করিয়া স্বীয় সৈন্যমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন,—জননী যশোহরেশ্বরী তাঁহাকে স্বপ্ন দেখাইয়াছেন যে, তিনি প্রতাপ-পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন আর প্রতাপের শৌর্য্যবীর্য্য কিছুই থাকিবে না। হতোৎসাহ মোগল-সৈন্যগণ ইহাতে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। গৃহ-শত্রুতা চিরদিন ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আসিতেছে,—ইহা যেন এই হতভাগ্য দেশের বিধিনির্দ্দিষ্ট অভিসম্পাত। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। তিরৌরীর সমরে যেমন হিন্দু কুলাঙ্গার জয়চন্দ্র সাহায্য না করিলে মুহম্মদ ঘোরীর তপ্তশোণিত দৃশদ্বতীর সলিল-প্রবাহে মিলাইয়া যাইত, তেমনি বিশ্বাসঘাতক পিশাচ ভবানন্দের মন্ত্রণা প্রাপ্ত না হইলে মানসিংহ হয়ত বঙ্গদেশ হইতে ফিরিয়া যাইতে পারিতেন না। বোধ হয়, বঙ্গের স্বাধীনতা ভগবানের অভীপ্সিত নহে।

পরবর্ত্তী যুদ্ধে সূর্য্যকান্ত, মদনমল্ল, গোলন্দাজ বীর রডা নিহত এবং শঙ্কর আহত হইয়া মোগল-করে বন্দী হওয়ায় প্রতাপের শক্তি বহুল পরিমাণে লাঘব হইয়া পড়িল। তথাপি মানসিংহ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলে প্রতাপ দর্পভরে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন, সন্ধি না করিলে এই যুদ্ধে হয়ত তাঁহার আশাভরসা সমস্তই বিলীন হইয়া যাইতে পারে, তখন তিনি সন্ধিস্থাপনে সম্মত হইলেন। সন্ধির ফলে শঙ্কর মুক্তিলাভ করিলেন।

মোগলের সহিত সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে,—বিধর্ম্মীর চরণে স্বাধীনতা-রত্ন উপহার দিতে হইবে, প্রতাপ কখনও এই কল্পনা হৃদয়ে

স্থান দেন নাই। তাঁহার আশা ছিল গগনস্পর্শী,—আকাঙ্ক্ষা ছিল অনন্তপ্রসারিত সাগরের মত। কিন্তু স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায়, তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত ঘৃণ্য কুক্কুরদলের নীচ পরশ্রীকাতরতায়, তাঁহার সে আশার হিমাদ্রি-শৃঙ্গ চূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল,—আকাঙ্ক্ষার সমুদ্র শুষ্ক হইয়া গেল! তিনি হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন; তখন তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রান্তপ্রায়, বার্দ্ধক্যজনিত অবসাদ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। তাহার উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী যশোহরেশ্বরী তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া থাকেন, তিনি ভবানীর বরপুত্র,—সেই বিশ্বাসের বলেই প্রকৃতপক্ষে প্রতাপের শরীরে যুদ্ধকালে একটা ঐশী শক্তির সঞ্চার হইত। এই সময় হইতে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল যে, মাতা যশোহরেশ্বরী প্রতাপের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া যশোহর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, মায়ের করুণা আর প্রতাপের উপর বর্ষিত হইবে না। এই দুঃসংবাদও তাঁহার মানসিক নিস্তেজতার আর একটা কারণ। সূর্য্যকান্ত, রডা, মদনমল্ল প্রভৃতি বীরগণ গত যুদ্ধে নিহত হওয়ায় প্রতাপের মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এইরূপ নানা কারণে প্রতাপের আশা-আকাঙ্ক্ষা মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। প্রতাপ মোগলের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তখনও তিনি প্রকৃত স্বাধীন নৃপতির ন্যায় চলিতেছিলেন, মানসিংহ তাঁহাকে একেবারে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারেন নাই। সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র, দুর্গ, নৌ-বল, রণতরী, সমস্তই তাঁহার পূর্ব্বের মত রহিল, কেবল নিজনামে মুদ্রা প্রচলন বন্ধ হইয়া গেল।

এই সময় আকবর পরলোক গমন করিলে যুবরাজ সেলিম

জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইস্লাম খাঁ নামক এক ব্যক্তির হস্তে বঙ্গদেশের শাসনভার অর্পিত হইল। ইস্লাম খাঁ ভাটিরাজ্যের (নিম্নবঙ্গের) জমিদারদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবং প্রতাপকে পূর্ব্ব সন্ধি অনুসারে তাঁহার সৈন্য এবং রণতরী লইয়া সেই অভিযানে যোগদান করিতে বলিলেন। যিনি বাল্যকাল হইতে বঙ্গের স্বাধীনতার চিন্তা করিয়া আসিতেছেন, যিনি এতদিন ধরিয়া কায়মনঃপ্রাণ সেই অভীষ্ট ব্রত উদ্‌যাপনে নিয়োগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কি বাংলার বাঙ্গালী জমিদারদিগকে নির্ম্মূল করিবার জন্য মোগলকে সাহায্যদান সম্ভব? প্রতাপ ধূমঘাটে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইল, তথাপি তিনি সাহায্য পাঠাইলেন না দেখিয়া নবাব ইস্লাম খাঁ ক্রুদ্ধ হইয়া যশোহর-রাজ্য আক্রমণের জন্য এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিলেন। ইনায়েৎ খাঁ স্থল বিভাগের এবং মীর্জ্জা সহন জলবিভাগের নেতৃত্ব গ্রহণপূর্ব্বক সৈন্য পরিচালনা করিয়া যশোহরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে বাঙ্গালী-কুল-কলঙ্ক পাপিষ্ঠ ভবানন্দ বঙ্গের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করিল।

প্রতাপ মোগল-অভিযানের সংবাদ পাইবা মাত্র যশোহর রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পুত্র উদয়াদিত্যকে ৫০০ যুদ্ধ-জাহাজ, ৩০টি হস্তী, এক সহস্র অশ্বারোহী এবং বিপুল পদাতিক সৈন্যের নেতৃত্ব প্রদান করিয়া ইচ্ছামতী ও অধুনা-লুপ্তপ্রায় শালখীর সঙ্গমস্থলে প্রেরণ করিলেন। বীরেন্দ্র কমল খোজা নৌ-সৈন্যের এবং জামাল খাঁ স্থল-পথগামী সৈন্যের ভার গ্রহণ করিয়া উদয়াদিত্যের সহকারিরূপে নিযুক্ত হইলেন। ধূমঘাট রক্ষার ভার স্বয়ং প্রতাপাদিত্য গ্রহণ করিয়া সৈন্য সহ রাজধানীতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শালখীর মোহনায় উদয়াদিত্যের সহিত মোগল-সৈন্যের জলে ও স্থলে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উদয়, কমল এবং জামাল খাঁ অসীম বীরত্ব সহকারে শত্রু-সৈন্য দলিত করিতে লাগিলেন; কয়েক দিন যুদ্ধের পর সহসা বিপক্ষের গোলার আঘাতে বীরবর কমল খোজা নিহত হইলে মোগলপক্ষ বিপুল উদ্যমে প্রতাপের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিল, তাহারা সে আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল; বিশেষতঃ কমল খোজার আকস্মিক মৃত্যুতে সৈন্যগণ ভীত ও হতোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। উদয়াদিত্য আর জয়ের আশা নাই দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু জামাল খাঁ মোগল সৈন্যের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অবশেষে তিনিও রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রতাপের বহু কামান এবং রণপোত মোগলের করায়ত্ত হইল। এইরূপে সেই যুদ্ধে হিন্দুগণ পরাস্ত হইল, বিজয়ী মোগল-সৈন্য জয়োল্লাসে বিজয়-ভেরী বাজাইয়া চতুর্দ্দিকে লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

যখন কমল খোজার মৃত্যু-সংবাদ এবং উদয়ের পরাজয়-বার্ত্তা প্রতাপের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, এবার আর মোগলের করাল কবল হইতে যশোহর রাজ্য রক্ষা পাইবে না। এই দুঃসংবাদে তাঁহার হৃদয় নিষ্পেষিত হইয়া গেল। এখন উপায় কি? শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন; যথাস্থানে সৈন্য, রণপোত ও কামানশ্রেণী সজ্জিত করিয়া প্রতাপ সৈন্যদিগকে অগ্নিময়ী উৎসাহ-বাণীতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। মোগলসৈন্য ক্রমে ক্রমে আসিয়া রাজধানীর অনতিদূরে উপনীত হইবামাত্র দুর্গ-প্রাকারে সজ্জিত কামনশ্রেণী হইতে অনল বর্ষণ আরম্ভ হইল। উভয়

পক্ষেই বহু সৈন্য নিহত ও আহত হইতে, লাগিল। প্রতাপের অসীম বীরত্ব ও অদ্ভুত অধ্যবসায় সত্ত্বেও বঙ্গের ভাগ্যাকাশ ক্রমশঃ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিতে আরম্ভ করিল। শেষ সময়ে প্রতাপের প্রধান সহায় জামাল খাঁ বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মোগল পক্ষে যোগদান করিল। জামাল খাঁর এই দুর্ব্ব্যবহারে প্রতাপের হৃদয় চূর্ণ হইয়া গেল, তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মীর্জ্জা সহনের ভেরীনিনাদ চারিদিক্ কম্পিত করিয়া মোগলের বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিল। এই স্থলে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বীরজীবনের শেষ যবনিকা পাত হইল। ইহার পর যে কয়দিন প্রতাপ বাঁচিয়া ছিলেন তাহা অতীব শোচনীয়, তাহা স্মরণ করিলে অতীব নিষ্ঠুরের হৃদয়ও চঞ্চল হইয়া উঠে।

বিজয়ী মোগল সৈন্যের অত্যাচারে চারিদিকে হাহাকার উঠিল। এখন প্রতাপের চিন্তা হইল, তিনি কি প্রকারে প্রজাদিগকে এই পাশব অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবেন? নারীর সতীত্ব, প্রজাদের ধর্ম্ম এবং ধনরত্ন মোগল কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইবে, আর তিনি দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়া থাকিবেন, ইহা কি বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপের পক্ষে সম্ভব? হতভাগ্য নিরীহ প্রজাদের কথা চিন্তা করিয়া প্রতাপের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া কেবল নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত মোগলের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইলেন। প্রতাপ দুই জন মন্ত্রী সমভিব্যাহারে ইনায়েৎ খাঁর শিবিরে যাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ইনায়েৎ সম্মত হইয়া কহিলেন, "সন্ধির কথাবার্ত্তা নবাব ইসলাম খাঁর সহিত ধার্য্য হওয়াই সমীচীন এবং রাজনীতি সঙ্গত।" ইস্লাম খাঁ তখন ঢাকার রাজধানী

স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। স্থির হইল; প্রতাপ ইনায়েৎ খার সহিত ঢাকায় যাইয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ঢাকা যাত্রার সমুদয় আয়োজন হইল। প্রতাপের হৃদয়মধ্য হইতে কে যেন বলিয়া দিতে লাগিল যে, এই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা,—এই দর্শনই তাঁহার যশোহরকে শেষ দর্শন। তিনি পুত্র উদয়াদিত্যকে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক যশোহরের শাসনভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিলেন। অনন্তর যশোহরেশ্বরীর মন্দিরে গমন করিয়া মায়ের চরণে শেষ অঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক যশোহরবাসিগণের নিকট বিদায় লইয়া নৌকারোহণে ইনায়েৎ খাঁর সহিত ঢাকা অভিমুখে রওনা হইলেন। যশোহরের দিকে চাহিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কয়েক বিন্দু তাঁহার লোল গণ্ডস্থল সিক্ত করিয়া নিপতিত হইল। হৃদয়-শোণিতপাত করিয়া এত দীর্ঘকাল পরিশ্রমের ফলে যে যশোহর রাজ্য তিনি গঠন করিয়াছিলেন, আজ বড় সাধের সেই রাজ্য চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। যশোহরের ছবিখানি যতই দূরে অস্পষ্টতার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল, প্রতাপের হৃদয়ও ততই বিষাদের ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিতে আরম্ভ করিল।

ঢাকায় পৌঁছিয়া প্রতাপ ইনায়েতের সমভিব্যাহারে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইস্‌লাম খাঁ ইনায়েতের নিকট প্রতাপের যুদ্ধনীতি, বীরত্ব প্রভৃতি যাবতীয় কথা শ্রবণ করিয়া সন্ধিস্থাপনে অস্বীকৃত হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। বীরকেশরী প্রতাপ মুসলমানের করে শৃঙ্খলিত হইলেন। তাঁহার রাজ্য মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লওয়া হইল; ইনায়েৎ খাঁ এই নব বিজিত রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করিলেন।

যখন এই ভীষণ সংবাদ যশোহরে পৌঁছিল, তখন বীর পিতার উপযুক্ত

পুত্র উদয়াদিত্য উন্মুক্ত তরবারি গ্রহণ করিয়া প্রতিশোধ-বাসনায় কুশলীর রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ; কিন্তু রাজলক্ষ্মী যাঁহার প্রতি বিরূপা, তাঁহার শত চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। বীর উদয়াদিত্য স্বদেশ রক্ষার্থে রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। মোগল সৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল, দুর্গের অবশিষ্ট হিন্দু-সৈন্যগণ প্রাণপণে বাধা দিল সত্য, কিন্তু বিরাট দাবানলের আসুরিক লেলিহান জিহ্বার নিকট সামান্য গুল্মরাজির মত তাহারা অচিরে দগ্ধ হইয়া গেল।

আর প্রতাপ?—অনেক দিন ঢাকায় মুসলমানের কারাগারে শৃঙ্খলিত হইয়া অবস্থান করিলেন। অবশেষে লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আগ্রায় প্রেরণ করা হয় ; কিন্তু পথেই ৺কাশীধামে বিশ্বেশ্বর দয়া করিয়া প্রতাপকে চরণে স্থান দিলেন, তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইল। কথিত আছে, শঙ্কর পূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি এই সময় বারাণসী ধামে প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি প্রদান করিলেন। প্রতাপ স্বয়ং সেই তরবারি নিজবক্ষে বিদ্ধ করিয়া সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য্য চিরতরে পরাধীনতার অতলজলে ডুবিয়া গেল!

স্বাধীনতার উপাসক, তৎসাধনে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বীরকেশরী প্রতাপ আজ নাই, কিন্তু কিঞ্চিদধিক তিনশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপনের জন্য তিনি যে বীরত্বোজ্জ্বল অমরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কোনও কালে নিষ্প্রভ হইবে না। যদি কোনও স্বাধীন দেশে প্রতাপ জন্ম গ্রহণ করিতেন, তবে আজ তাঁহার স্মৃতি ঘরে ঘরে ভক্তিভরে অর্চ্চিত হইত। প্রতাপের দুর্ভাগ্য যে, তিনি এই হতভাগ্য দেশে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তুতোধিক হতভাগা আমরা এই বাঙ্গালী জাতি, আমাদের দেশের একজন বীরের স্মৃতিপূজা করিতে আমরা শিখিলাম না। প্রতাপ! স্বর্গ হইতে তুমি এই হতভাগ্য বিলাস-নিমজ্জিত বাঙ্গালী জাতির উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর, যেন তাহারা প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় তোমার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিতে শিক্ষা লাভ করে!

রাজা রামচন্দ্র

বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জিলায় চন্দ্রদ্বীপ বা বাকলা পরগণা অবস্থিত। চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ শৌর্য্যবীর্য্যে সবিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। তাঁহাদের সামাজিক আধিপত্য, শাসন-নীতি, রণ-দক্ষতা, অসীম পরাক্রম, স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য সংগ্রাম প্রভৃতি গুণনিচয় ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। তৎকালীন চন্দ্রদ্বীপের অপ্রতিহত পরাক্রম সুদূর সমুদ্র-বেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; এমন কি, অসীম প্রতাপ-শালী মোগলসম্রাটের হৃদয়েও আশঙ্কা এবং আতঙ্কের সৃষ্টি করিতে ত্রুটি করে নাই।

অনুমান ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের রাজত্ব সময়ে রাজা কন্দর্প-নারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ইনি বঙ্গীয় বার ভূঞার অন্যতম। মগ-দস্যুদিগের অত্যাচারনিবন্ধন তিনি পূর্ব্ব রাজধানী কচুয়া হইতে রাজপাট স্থানান্তরিত করিয়া মাধবপাশা নামক স্থানে সংস্থাপিত করেন। এই স্থানে রাজ্যস্থাপনসময়ে "গাজী" নামধারী পাঠান সর্দ্দার-দিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম হয়, যুদ্ধে কন্দর্পনারায়ণ জয়লাভ করেন, পরাজিত পাঠানেরা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। তাঁহার বিরাট নৌবাহিনী ও অনলবর্ষী কামানসমূহ সর্ব্বদা সমুদ্রকূলে শত্রুদলনের জন্য প্রস্তুত থাকিত। পর্ত্তুগীজ ও মগ দস্যুদিগের বিরুদ্ধে তাঁহাকে বহুবার অভিযান করিতে হইয়াছিল এবং বহু জল ও স্থলযুদ্ধে তাঁহার কামান অনল উদ্গীরণ করিয়া শত্রু-হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। বহু পর্য্যটকের ভ্রমণ-গ্রন্থে কন্দর্পনারায়ণের সেই বীরত্ব-কাহিনী লিপিবদ্ধ

আছে। এখনও কন্দর্পনারায়ণের একটী পিত্তলের কামান বর্ত্তমান রহিয়াছে। পর্ত্তুগীজ ও মগ-দস্যুদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের অত্যাচার হইতে দেশরক্ষা করিবার নিমিত্ত যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্য এই বীরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। মগদিগের সহিত ২।১টী যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যও কন্দর্পনারায়ণকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্ন-ভাস্করের ন্যায় প্রবল পরাক্রমে প্রায় ষোড়শবর্ষ রাজত্ব করিয়া বীরকেশরী কন্দর্পনারায়ণ বীরোচিত ধামে প্রস্থান করেন। বাংলার সেই বীর-যুগের ইতিহাস আজ আলস্য-তন্দ্রাবিজড়িত বিলাসী বাঙ্গালীর চক্ষে একটা সুদূর অতীতের কল্পনা-রেখারই মত প্রতীয়মান হইতেছে। রাজা রামচন্দ্র এই বীর কন্দর্পনারায়ণের উপযুক্ত পুত্র।

যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্য কন্দর্পনারায়ণের সহিত বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করিবার জন্য স্বীয় কনিষ্ঠা তনয়া বিমলার সহিত কন্দর্প-পুত্র রামচন্দ্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন। কিন্তু পাত্রপাত্রী উভয়েই নিতান্ত নাবালক থাকায় বিবাহ কয়েক বৎসরের জন্য স্থগিত থাকে। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সহসা পরপারের আহ্বানে কন্দর্পনারায়ণ মহাপ্রস্থান করিলেন, পুত্রের বিবাহ দর্শন তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না। তখন রামচন্দ্রের বয়স মাত্র ছয় বৎসর। কন্দর্প-মহিষী এই অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের অভিভাবিকাস্বরূপ বাকলা-রাজ্যের শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন। যদিও তখনও প্রতাপ-দুহিতার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ হয় নাই, তথাপি এই দুই পরিবারে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা বদ্ধমূল হইয়াছিল। প্রতাপ ভাবী বৈবাহিকাকে রাজ্যশাসনের গুরুতর বিষয়সমূহে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।

১৬০২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে রামচন্দ্র ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন, বিমলার বয়স তখন প্রায় দ্বাদশ বর্ষ। তৎকাল-প্রচলিত প্রথানুযায়ী

বালিকার এই বয়সই বিবাহের পক্ষে অতিরিক্ত। কাজেই প্রতাপাদিত্যের আগ্রহাতিশয্যে বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হইল। রামচন্দ্রের জননীরও কোনও আপত্তির কারণ নাই, কারণ ইহা বঙ্গদেশ, এ দেশে মাতা পুত্রের বিবাহের জন্য পরম আগ্রহান্বিতা; পুত্র রুগ্ন হউক, পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থ হউক, তাহা বাঙ্গালীর স্নেহান্ধ জননী বিন্দুমাত্রও বিবেচনা করিয়া দেখিবার অবসর পান না; পুত্রবধূর মুখদর্শন করিবার সুখকল্পনা সমস্ত প্রতিবন্ধক, সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল মাত্র একটা মাদকতায় নৃত্য করিয়া উঠে। জননীর স্নেহান্ধ দৃষ্টি দেখিতে পায় না যে, তাঁহার সেই আনন্দের অন্তরালে গরল না অমৃত রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে বাকলার ভাবী রাজ্যেশ্বরের বিবাহ, সুতরাং ক্ষমতা অক্ষমতার কোনও কথাই উঠিতে পারে না। চন্দ্রদ্বীপ ও যশোহর-রাজ্য বিবাহের আনন্দ-রবে মুখরিত হইয়া উঠিল। তখন বাষ্পীয় পোতের প্রচলন হয় নাই, সুতরাং মাধবপাশা হইতে যশোহর পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমের একমাত্র যান ছিল নৌকা। নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকার এক বিরাট বহর অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া জনকোলাহলে ও বাদ্যোদ্যমে উভয় তীরে বিস্ময় ও ভীতির সঞ্চার করিতে করিতে বর ও বরযাত্রিসহ যশোহর অভিমুখে যাত্রা করিল। অঙ্গরক্ষী সৈন্য এবং কামান দ্বারা সজ্জিত কয়েকখানি বড় নৌকা তাহাদের অনুগমন করিল।

নির্ব্বিঘ্নে বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। কিন্তু এই সময়ে যে একটী দুর্ঘটনার সূত্রপাত হইল তাহা অতিরঞ্জনের তূলিকায় নানাভাবে রঞ্জিত হইয়া প্রতাপ-চরিত্রে একটা দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমার আরোপ করিয়া রাখিয়াছে।

রামচন্দ্রের সহিত রমাই ঢুঙ্গী নামক জনৈক বিদূষক আসিয়াছিল।

হাস্যপরিহাসে জনমণ্ডলীকে আনন্দদানই তাহার কার্য্য। প্রকাশ যে, রমাই ঢুঙ্গীর কোনও বিশেষ পরিহাসে প্রতাপ-মহিষী অত্যন্ত অবমাননা অনুভব করিয়া স্বামিসকাসে ঢুঙ্গীর সেই অভদ্রতা জ্ঞাপন করেন। প্রতাপ তখন মদ্যপানে অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন, ঢুঙ্গীকর্ত্তৃক পত্নীর অবমাননা অবগত হইয়া তিনি নবজামাতা ও ঢুঙ্গী উভয়েরই প্রাণবিনাশের আজ্ঞা দিলেন। বাসর-গৃহে রামচন্দ্র পত্নীর মুখে এই ভীষণ সংবাদ অবগত হইয়া পলায়নের চেষ্টা করেন, কিন্তু সুরক্ষিত রাজপুরীর গুপ্ত পথ অবগত না থাকায় নিশীথে পলায়ন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। বিমলা পিতার প্রকৃতি সম্যক্ অবগত ছিলেন, তাঁহার আদেশ অন্যথা হইবার নহে। সাধ্বী স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য গুপ্ত পথের সন্ধান বলিয়া দিয়া তাঁহাকে গোপনে রাজভবন হইতে বহির্গত করিয়া দিলেন। বহির্ভাগে রামচন্দ্রের শরীর-রক্ষী সৈন্য এবং নৌকাসমূহ অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি অনতিবিলম্বে একটী ৬৪ দাঁড় বিশিষ্ট কামান-সজ্জিত নৌকায় আরোহণ করিয়া সেই রাত্রিতেই যশোহর হইতে বহির্গত হইয়া পড়িলেন। যখন প্রতাপাদিত্যের নিকট জামাতার পলায়ন-সংবাদ পৌঁছিল, তখন তিনি স্বীয় ঔদ্ধত্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া জামাতাকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার নিমিত্ত নৌকা প্রেরণ করিলেন, কিন্তু রামচন্দ্রের বায়ুগামী তরণী তখন যশোহর-রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া বাকলা-রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে।

কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন, বাকলা রাজ্য হস্তগত করাই প্রতাপের উদ্দেশ্য ছিল, এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই রামচন্দ্রকে স্বগৃহে আনিয়া তাঁহার হত্যাসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই অভিমত যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং প্রতাপাদিত্য যে অতটা নারকীয় ভাবে পরিপূর্ণ নহেন, তাহা নানাদিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান

হয়। বাকলা-রাজ্য অধিকার করিবার ইচ্ছা থাকিলে তিনি পূর্ব্বে যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন, পুত্রতুল্য জামাতার জীবন ও স্নেহের পুত্তলী আদরিণী কনিষ্ঠা কন্যার সুখশান্তির বিনিময়ে সে সুযোগ অন্বেষণের কোনই প্রয়োজন ছিল না। তবে যে কারণেই হউক, রামচন্দ্র বিবাহ-রজনীতেই যে শ্বশুর-গৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন এ কথা সত্য।

রামচন্দ্র মাধবপাশায় পৌঁছিলেন, নবপরিণীতা অভাগিনী বিমলা সর্ব্বসুখ-বঞ্চিতা হইয়া পিতৃভবনেই দিনপাত করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র শ্বশুর বা পত্নীর সহিত আর কোনই সম্বন্ধ রাখিলেন না। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে বিমলা পিতার অনুমতি লইয়া স্বয়ং আসিয়া পতি-ভবনে উপস্থিত হন, রাজমাতা পুত্রবধূকে সস্নেহে সাদরে গৃহে তুলিয়া লইলেন। রামচন্দ্র যদিও কয়েকদিন পত্নীর সহিত কোনও সংশ্রব রাখেন নাই, তথাপি অসীম গুণশালিনী সাধ্বী বিমলা স্বীয় পাতিব্রত্যে অল্প দিনের মধ্যেই স্বামীর হৃদয়রাজ্যের অধিকার লাভ কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিমলার এই পতি-গৃহে যাত্রা এবং স্বামিকর্ত্তৃক তাঁহার পুনর্গ্রহণ বিষয়েও নানা কাহিনী প্রচলিত থাকিয়া প্রকৃত তথ্যকে তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

রামচন্দ্র বিবাহার্থে যশোহর যাত্রা করিলে আরাকান-রাজ সেই সুযোগে বাকলা আক্রমণ করিয়া সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী কতকাংশ অধিকার করিয়া লন। রামচন্দ্র স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া আরাকান-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন; কিন্তু তিনি একে ষোড়শবর্ষবয়স্ক বালক, তদুপরি আবার বিগত বিবাহ-ব্যাপারে তাঁহার মানসিক অবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ায় তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না। সাগর-সন্নিকটস্থ

কয়েকটী স্থান আরাকান-রাজকে অর্পণ করিয়া রামচন্দ্র সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন।

রামচন্দ্রের পিতা রাজা কন্দর্পনারায়ণের সময় হইতেই মেঘনা নদীর পূর্ব্ব কূলে ভূলুয়া পরগণায় লক্ষ্মণমাণিক্য নামে রাজোপাধিধারী এক কায়স্থ জমিদার রাজত্ব করিতেন। তিনি বঙ্গীয় দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম। শৌর্য্যবীর্য্যে তিনি কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না, পাণ্ডিত্য এবং কবিত্ব শক্তিও তাঁহার অসাধারণ ছিল। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য স্বায় বীরত্ব-গর্ব্বে এতদূর গর্ব্বিত ছিলেন যে, তৎকালীন বীরত্ব-খ্যাতি-সম্পন্ন যোদ্ধ-বর্গকে তিনি নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতেন। চন্দ্রদ্বীপরাজ রামচন্দ্র যদিও তখন যৌবন-দশায় উপনীত, তথাপি লক্ষ্মণমাণিক্য তাঁহাকে বালক-জ্ঞানে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক নানা ভাবে তাঁহার কাপুরুষতা ঘোষণা করিতেন। লক্ষ্মণমাণিক্যের এই ঔদ্ধত্য রামচন্দ্র সহ্য করিতে না পারিয়া অবিলম্বে ভূলুয়াধিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। লক্ষ্মণ-মাণিক্য তাঁহার বিরুদ্ধে বালক রামচন্দ্রের যুদ্ধাভিযানে গর্ব্বে ও ক্রোধে আত্মহারা হইলেন, এবং অনায়াসে রামচন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া নিহত করিতে সমর্থ হইবেন এই দুরাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ হইয়া একাকী রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। নদী-বক্ষে যে স্থলে রাজা রামচন্দ্রের নৌ-বাহিনী অপেক্ষা করিতেছিল, ভূলুয়াধিপতি সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না; রামচন্দ্রের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাঁহার তপ্ত শোণিত-ধারায় স্বীয় ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপণ মানসে কোষোন্মুক্ত অসি হস্তে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক রামচন্দ্রের নৌকার উপর পতিত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি নৌকার পাটাতনের উপর না পড়িয়া ডহরের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। রামচন্দ্রের

সহগামী বীরগণ ভুলুয়াধিপতিকে আর ডহরের মধ্য হইতে উঠিবার অবসর প্রদান না করিয়া সেই স্থলেই নৌকার কাষ্ঠের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। রাজার এবম্বিধ শোচনীয় পরিণাম-বার্ত্তা রাজধানীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রামচন্দ্র নৌকা খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন, নৌকা তড়িৎ বেগে চন্দ্রদ্বীপ অভিমুখে ধাবিত হইল। লক্ষ্মণমাণিক্য নৌকার ডহরের মধ্যে হস্তপদবদ্ধ হইয়া কচ্ছপের মত রহিলেন।

মাধবপাশায় উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্র তাঁহার চিরশত্রু লক্ষ্মণমাণিক্যকে ধরাধাম হইতে বিদায় দিবার নিমিত্ত তাঁহার হত্যাসাধনের সঙ্কল্প করিলেন! রামচন্দ্র স্বয়ং একজন বীর হইয়া বীরের সম্মান রক্ষা করিতে পারিলেন না। কিন্তু পুণ্যবতী করুণাময়ী রাজমাতা ভুলুয়াধিপতির বীরত্বব্যঞ্জক দীর্ঘাবয়ব, সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, সর্ব্বোপরি মুখমণ্ডলে বীরত্ব, পাণ্ডিত্য এবং আভিজাত্যের সংমিশ্রণজনিত অপূর্ব্ব দীপ্তি দর্শন করিয়া পুত্রকে এবং বীরের জীবননাশ করিতে নিষেধ করিলেন। পুত্র মাতৃ-আজ্ঞা অবহেলা করিতে পারিলেন না। লক্ষ্মণমাণিক্য লৌহপিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া মাধবপাশায় দিনপাত করিতে লাগিলেন।

একদিন রামচন্দ্রকে ভৃত্যগণ তৈলমর্দ্দন করিতেছে, লক্ষ্মণমাণিক্যকে পিঞ্জর হইতে বাহিরে আনা হইয়াছে, তিনি একটী নারিকেল বৃক্ষে পশ্চাৎভাগ ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; সহসা তাঁহার হৃদয়ে বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা জাগ্রত হইল, তিনি স্বীয় শরীর দ্বারা নারিকেল বৃক্ষটীকে রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাক্কা মারিতেই সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষ ভীষণ শব্দে ভূপতিত হইল! বিধাতা নিতান্ত অনুকূল বলিয়া রামচন্দ্র সেইবার মৃত্যু-গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু সেই বৈরনির্য্যাতন-প্রচেষ্টাই ভুলুয়াধিপতির জীবন-দীপ নির্ব্বাপণের হেতু হইল। রাজমাতা লক্ষ্মণ-

মাণিক্য কর্ত্তৃক পুত্রের জীবননাশের চেষ্টার কথা শুনিয়া সেই ভীষণ শত্রুকে আর গৃহে রাখিতে স্বীকৃত হইলেন না। রামচন্দ্র বীর-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণমাণিক্যের হত্যা-সাধন করিলেন। পিতৃব্য-হত্যা যেমন প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের একটা অনপনেয় কলঙ্ক, এই লক্ষ্মণমাণিক্যের হত্যাও বাকলাধিপতি বীর রামচন্দ্রের জীবনেতিহাসের একটা ঘোর মসীলিপ্ত নিন্দনীয় অধ্যায়।

দক্ষিণে সমুদ্র-মধ্যস্থ সন্দ্বীপ নামক স্থানটী কিছুদিন হইতে পর্ত্তুগীজ-দিগের অধিকারভুক্ত ছিল। গোমেশ নামক একজন পর্ত্তুগীজ যখন উহার শাসনকর্ত্তা, তখন ফতে খাঁ নামক জনৈক পাঠান সন্দ্বীপ আক্রমণ করিয়া উহা দখল করিয়া বসে এবং দক্ষিণ সাহবাজপুরস্থ পর্ত্তুগীজদিগকে সেই স্থান হইতে বিতাড়িত করিবার মানসে ঐ স্থান আক্রমণ করে। পর্ত্তুগীজগণ উপায় না দেখিয়া রাজা রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলে তিনি সসৈন্য ফতে খাঁর বিরুদ্ধে ধাবিত হন এবং সন্দ্বীপের সন্নিকটে একটী ভীষণ জলযুদ্ধে ফতে খাঁকে পরাজিত এবং নিহত করেন। সন্দ্বীপ পুনরায় পর্ত্তুগীজগণের অধিকারে আসে। কিন্তু ধর্ম্মভয়হীন পাপিষ্ঠ পর্ত্তুগীজগণ এই উপকারের বিনিময়ে রাজা রামচন্দ্রকে কৃতঘ্নতাদ্বারা পুরস্কৃত করে।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর যখন ভারতের সিংহাসনে সমাসীন, তখন ঢাকার নবাব ইস্‌লাম খাঁ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। প্রতাপাদিত্যকে নির্য্যাতিত করিতে হইলে বঙ্গের অন্যান্য স্বাধীনতাপ্রয়াসী ভৌমিক রাজগণকেও এককালে আক্রমণ করিয়া প্রতাপাদিত্যের সাহায্যে বাধা প্রদান আবশ্যক। চন্দ্রদ্বীপ-রাজ রামচন্দ্রের তখন প্রবল প্রতাপ, বিশেষতঃ তিনি প্রতাপাদিত্যের জামাতা, কাজেই সুচতুর ইস্‌লাম খাঁ

একদল সৈন্য সৈয়দ হাকিমের নেতৃত্বে বাকলা আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য রামচন্দ্র প্রস্তুত ছিলেন না, সহসা মোগলের ভেরী-নিনাদে সন্ত্রস্ত হইয়া তিনি যতটা পারিলেন সৈন্য সমভিব্যাহারে শত্রুর গতিরোধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বিজয়-লক্ষ্মী এবার তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন না। মোগলেরা বাকলার সীমান্ত দুর্গসকল অধিকার করিয়া লইয়া যখন রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইল, তখন রামচন্দ্র বিরাট বাহিনী লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণের আয়োজন করিলে রাজমাতা তাঁহাকে মোগলের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইবার আদেশ প্রদান করিলেন, এবং পুত্র যদি সে আদেশ পালন না করে, তবে তিনি বিষপানে আত্মহত্যার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। মাতৃভক্ত পুত্র অগত্যা মায়ের আদেশ শিরে তুলিয়া লইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিবার জন্য মোগল-শিবিরে উপনীত হইলেন। কিন্তু শত্রুকে স্বীয় শিবিরে প্রাপ্ত হইয়া মোগল-সেনানী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বন্দী করিয়া ঢাকায় প্রেরণ করিলেন। যশোহর-রাজ্য মোগল অধিকারে না আসা পর্য্যন্ত রামচন্দ্রকে বন্দী অবস্থায় ঢাকাতেই অবস্থান করিতে হয়। প্রতাপের পতনের পর তিনি মুক্তিলাভ করিয়া মাধবপাশায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মোগলের সামন্তরাজরূপে দীর্ঘ কাল রাজত্ব করিয়া শেষে পরলোক গমন করেন।

রাজা মুকুন্দ রায়

এই বাংলার সেই এক গৌরবের যুগ ছিল,—যে যুগে প্রদীপ্ত দ্বাদশ সূর্য্যের মত বাংলার দ্বাদশ ভৌমিক বিভিন্ন স্থানে অভ্যুত্থিত হইয়া মোগল ও পাঠানের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী ঘোর সংগ্রাম করিয়া তাঁহাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। **রাজা মুকুন্দ রায়** সেই দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইঁহার প্রতাপ-বহ্নি রুদ্রতেজে জ্বলিয়া উঠিয়া মোগল ও পাঠানের প্রবল শক্তিকে তৃণখণ্ডের মত দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার **ফতেজঙ্গপুরের** কিয়দংশ লইয়া মুকুন্দ রায়ের জমিদারী ছিল। প্রথমে তিনি একজন ছোট জমিদার ছিলেন, ছোট বলিয়া নিতান্ত ছোট নহে,—বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক বড়। তখনকার ছোট জমিদারেরও কামান, বন্দুক, সৈন্য, ইত্যাদি থাকিত; সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে মগ ও ফিরিঙ্গী-দস্যু এবং অত্যাচারী মোগল বা পাঠান শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইত। জল ও স্থলযুদ্ধে অনেক সময় তাঁহারা যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিতেন। মুকুন্দ রায়ও প্রথমে এই রকম একজন জমিদার ছিলেন। তাঁহার জমিদারী ফতেয়াবাদ পরগণার অন্তর্গত ছিল।

তখন দিল্লীর সিংহাসনে শাহান শা আকবর। বাংলায় তখনও পাঠানের আধিপত্য। বাংলার পাঠান নবাব নামে মাত্র দিল্লীর অধীন; বৎসর বৎসর মোগলের প্রাপ্য রাজস্ব মাত্র দিল্লীতে পাঠাইতে হইত। এতদ্ব্যতীত, যাবতীয় ব্যাপারেই তাঁহারা স্বাধীন রাজার মত

চলিতেন। সময় সময় আবার তাঁহারা দিল্লীর বাদশাহের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন, তখনই যুদ্ধের আয়োজন হইত, দেশ অশান্তি ও অরাজকতায় পূর্ণ হইয়া উঠিত। মুকুন্দ রায় যখন জমিদার তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ছিলেন দাউদ খাঁ। তিনি মোগলের পরাধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া মোগল সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহী নবাবকে শাস্তি দিবার জন্য ফৌজ পাঠাইলেন। মোরাদ খাঁ ছিলেন নবাব দাউদ খাঁর অধীন ফতেয়াবাদ পরগণার শাসনকর্ত্তা। তিনি মুকুন্দ রায়ের বন্ধু। দাউদ খাঁর সহিত মোগলের অনেকদিন ধরিয়া সংগ্রাম চলিল। শেষে রাজমহলের যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন। মোরাদ খাঁ এবং আরও দুইজন পাঠান শাসনকর্ত্তা ঐ যুদ্ধের সময় বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক মোগল-পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। দাউদ খাঁর মৃত্যুর পর পাঠান কতলু খাঁ উড়িষ্যার সর্দ্দার হইয়া আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। তিনি মোরাদ খাঁকে বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য সসৈন্য ফতেয়াবাদে অভিযান করিলেন। মোরাদ খাঁ এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি অনতিবিলম্বে মোগলের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া দুত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু সেখান হইতে সাহায্য আসিবার অবসরের প্রতীক্ষায় তিনি থাকিতে পারিলেন না, ভয়ে বন্ধুবর মুকুন্দ রায়ের কাছে ছুটিয়া গেলেন। বন্ধুর বিপদে বন্ধু নীরব থাকিতে পারিলেন না। আশ্রিতকে রক্ষা করা হিন্দুর পরম ধর্ম্ম। মুকুন্দ রায় বন্ধু মোরাদ খাঁর সাহায্যের জন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু হতভাগ্য মোরাদ খাঁ অল্প কয়েক দিনের জ্বরে সংসার-সমরাঙ্গন হইতে বিদায় লইলেন। মুকুন্দ রায় বন্ধুর মৃত্যুতে তাঁহার নাবালক সন্তানদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সামান্য সৈন্য লইয়াই

বিরাট পাঠান-বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। জয়-পরাজয়ের চিন্তা মুহূর্ত্ত-কালের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল না। মুকুন্দ রায়ের কামান কতলু খাঁর কামান গর্জ্জনের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল। মুকুন্দ রায় এবং কতলু খাঁর সৈন্যে যুদ্ধ হইতেছিল, এমন সময় মোগল সৈন্য আসিয়া মুকুন্দ রায়ের সহিত মিলিত হইল ; এই শক্তিবৃদ্ধিতে বাঙ্গালীবীর আরও উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কতলু খাঁ সে পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া উড়িষ্যায় পলাইয়া গেলেন। রণজয়ী বীর মুকুন্দ রায় বিজয়-গর্ব্বে নগরে ফিরিয়া আসিলেন, চতুর্দ্দিক্ তাঁহার জয়-নিনাদে মুখরিত হইল।

মহারাজ তোডরমল্ল তখন বঙ্গের মোগল সুবাদার। তিনি এই বাঙ্গালী বীরের বীরত্বে পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বীর্য্যবত্তার পুরস্কার স্বরূপ রাজা উপাধিসহ তাঁহাকে ফতেয়াবাদ পরগণার শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিলেন। জমিদার মুকুন্দ রায় রাজা হইলেন।

রাজা হইয়া তিনি বন্ধু-পুত্রদিগের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। তাহাদিগকে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দান করিয়া স্বচ্ছল ভাবে জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। রাজপদ পাইয়া রাজ্যের উন্নতি ও প্রজাদিগের সুখস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধনের জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজ্যের নানা স্থানে শত শত পুষ্করিণী খনিত হইল, রাস্তা নির্ম্মিত হইল, মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, সন্ধ্যা-সকাল মন্দিরে মন্দিরে দেবতার সুমধুর আরতি-ধ্বনি উত্থিত হইয়া যেন ফতেয়াবাদের উপর স্বর্গের শান্তি বর্ষিত হইতে লাগিল। মুকুন্দ রায়ের প্রতাপে রাজ্য হইতে দস্যুতস্কর দেশান্তরে পলায়ন করিল। তাঁহার সুশাসনে প্রজাদের কণ্ঠে কণ্ঠে জয়গান ধ্বনিত হইতে লাগিল। এমনি করিয়া মুকুন্দ রায় তাঁহার

রাজ্য সোণার রাজ্য করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। বুদ্ধিমান দূরদর্শী মুকুন্দ রায় বুঝিয়াছিলেন, হয়ত এক দিন মোগলের সহিতও তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে, এই জন্য তিনি রাজ্যরক্ষায় বিশেষ মনোযোগী হইলেন। উপযুক্ত স্থানে দুর্গ, প্রাকার ও পরিখা নির্ম্মিত হইতে লাগিল। অস্ত্রশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি গোলাবারুদ, কামান এবং অন্যান্য আবশ্যক সমরোপকরণ নির্ম্মাণ করাইতে লাগিলেন। সৈন্যেরা যুদ্ধ-শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে লাগিল। রাজশক্তি, প্রতাপ ও বীরত্বে মুকুন্দ রায় এখন বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম হইলেন। বাংলায় পাঠান-প্রভুত্বের অবসান হইয়া আসিল এবং মোগল-প্রাধান্য দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে মোগলের অত্যাচারও বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিলে মুকুন্দ রায় ভাবিতে লাগিলেন, ইহার কি কোনও প্রতীকার নাই? দেশ হইতে কি বিদেশীর শাসন-তরুর মূলোৎপাটন সম্ভব নয়! বাংলার দ্বাদশ সূর্য্য সদৃশ দ্বাদশ ভৌমিক যদি একবার এক সঙ্গে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে তবে সেই প্রচণ্ড হুতাশনে কি মোগল পতঙ্গের মত দগ্ধ হইয়া যায় না?

রাজা মুকুন্দ রায় গোপনে গোপনে শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। মোগল সুবাদারেরা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। রাজা তোডরমল্লের পর অল্পদিনের মধ্যে কয়েকজন সুবাদার পরিবর্ত্তিত হইলেন। রাজা মানসিংহের মত সুবাদারও মুকুন্দ রায়ের চতুরতা ধরিতে পারিলেন না। মানসিংহের পর বাংলার সুবাদার হইয়া আসিলেন সায়াদ খাঁ। তিনি আসিয়া দেখিলেন, ফতেয়াবাদ পরগণায় হিন্দু রাজা মুকুন্দ রায়ের বিপুল প্রতাপ, সৈন্যসামন্ত, গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি প্রায় স্বাধীন রাজার মতই। একজন হিন্দু জমিদারের এত ক্ষমতা তাঁহার মনঃপূত

হইল না। তিনি তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদিন মুকুন্দ রায় রাজসভায় বসিয়া বিচার-কার্য্য করিতেছেন, সভাস্থল জনতায় পরিপূর্ণ। এমন সময় মোগল সুবাদারের দূত আসিয়া তাঁহাকে কুর্ণিশ করিয়া একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্র পড়িয়া মুকুন্দ রায়ের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল, ললাট কুঞ্চিত হইল, তিনি দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। সভাগৃহের সমগ্র জনতা আশঙ্কায় মুহুর্মুহু শিহরিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। মুকুন্দ রায় বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে মোগল-দূতকে সম্বোধন করিয়া বলিলে, "দূত, তোমার প্রভুকে বলিও, এটা চাকলা ভূষণা * পরগণে ফতেয়াবাদ, এর রাজা মুকুন্দ রায়, এটা বালকের হস্তের ক্রীড়া-কন্দুক নয়, ইচ্ছা করিলেই কাড়িয়া লওয়া যায় না। যদি তোমার প্রভু আমার হস্ত হইতে এই ফতেয়াবাদের শাসনভার কাড়িয়া লইয়া একজন মুসলমানের হস্তে তাহা ন্যস্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে তরবারি হস্তে তাঁহাকে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে বলিও।" মোগল-দূত প্রস্থান করিল; রাজা মুকুন্দ রায় সেনাপতিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন।

সায়াদ খাঁ হিন্দু জমিদারের এই স্পর্দ্ধায় জ্বলিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন এবং একজন মুসলমানকে ফতেয়াবাদের শাসনকর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু মুকুন্দ রায় রাজ্য ছাড়িলেন না, তিনি যেমন চলিতেছিলেন তেমনই চলিতে লাগিলেন। নূতন শাসনকর্ত্তা ফতেয়াবাদে আসিলেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহাকে শাসনকর্ত্তা বলিয়া

---

* যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ এবং খুলনার কতগুলি স্থান লইয়া চাকলা ভূষণা অবস্থিত ছিল।

গ্রাহ্য করিল না। সায়াদ খাঁ মুকুন্দ রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া একদল সৈন্য লইয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। মুকুন্দ রায়ও সৈন্য লইয়া কামান-গর্জ্জনে দিঙ্‌মণ্ডল কম্পিত করিতে করিতে মোগল-বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। বাঙ্গালী সৈন্যের রণনিনাদে মোগল-সৈন্য প্রমাদ গণিল। মুকুন্দ রায়ের হস্তে মোগলেরা ক্রমাগত পরাস্ত হইতে লাগিল। মুকুন্দ রায় পলায়িত মোগল সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে বহুদূরে বিতাড়িত করিয়া দিয়া আসিলেন।

যখন রাজা মুকুন্দ রায় যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, তখন একদিন সায়াদ খাঁর সেই নব নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা মুকুন্দ রায়ের রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ দেখিবার জন্য ছদ্মবেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজপ্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যখন উহার সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন, তখন সহসা প্রাসাদের বাতায়ন-পথে একটী অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরী নারীমূর্ত্তি তাঁহার নয়ন পথবর্ত্তিনী হইল! ইনি রাজা মুকুন্দ রায়ের কন্যা। তাঁহার দেব-দুর্ল্লভ রূপ দেখিয়া খাঁ সাহেব মুগ্ধ হইলেন; অমন স্বর্ণ-বিনিন্দিত রূপ, অনুপম অঙ্গসৌষ্ঠব তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। তিনি মুকুন্দ-নন্দিনীকে লাভ করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সেই দিন হইতে খাঁ সাহেবের চেষ্টা হইল, কোনও রূপে তাঁহাকে হস্তগত করা।

মুকুন্দ রায় তখনও যুদ্ধে ব্যস্ত, রাজধানী হইতে দূরে অবস্থিত। এক দিন সন্ধ্যার সময় মুকুন্দ-নন্দিনী নিকটবর্ত্তী কালীমন্দিরে যাইয়া দেবী-প্রতিমার চরণে রক্তজবার অর্ঘ্য প্রদান করিতেছিলেন, এমন সময় সেই নবনিয়োজিত মুসলমান শাসনকর্ত্তা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ধরিতে অগ্রসর হইলেন। বীরাঙ্গনা তৎক্ষণাৎ ছাগ-বলির খড়্গ খানা তুলিয়া

এক আঘাতেই তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পাপীর শোণিতে মায়ের মন্দির-প্রাঙ্গন কলুষিত হইয়া গেল।

রণজয়ী মুকুন্দ রায় বিজয়-গৌরবে রাজধানীতে ফিরিয়াই নূতন শাসনকর্ত্তার দুর্ব্ব্যবহার এবং স্বীয় বীর তনয়ার হস্তে তাঁহার উপযুক্ত শাস্তির কথা শুনিয়া যুগপৎ ক্রুদ্ধ এবং আনন্দিত হইলেন। তিনি শাসনকর্ত্তার ছিন্ন শির শূলে বিদ্ধ করিয়া তাহা একটী প্রকাশ্য স্থানে রাখিয়া দিলেন। কন্যা তাঁহার সাহসিকতার জন্য বীর পিতার নিকট হইতে স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন।

রাজা মুকুন্দ রায় আর মোগলের অধীনে থাকা হেয় জ্ঞান করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। একে নব নিযুক্ত শাসনকর্ত্তার হত্যা, তাহার উপর আবার রাজা মুকুন্দ রায়ের স্বাধীনতা ঘোষণা, সায়াদ খাঁর ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি পড়িল। তিনি সৈন্য লইয়া মুকুন্দরায়ের রাজধানী অবরোধ করিতে চলিলেন। দূত-মুখে সংবাদ পাইয়া মুকুন্দ রায়ও প্রস্তুত হইলেন, আবার রণদামামা বাজিয়া উঠিল। বাঙ্গালী সৈনিকেরা গত যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া বিশ্রাম করিতে না করিতেই আবার রণক্ষেত্রে ছুটিয়া চলিল। রাজার উৎসাহবাক্যে তাহাদের প্রাণে প্রাণে উদ্দীপনার অনল জ্বলিয়া উঠিল,—হয় জয়, নতুবা মৃত্যু!—হয় স্বাধীনতা, না হয় ধ্বংস!

ফতেজঙ্গপুরের রণক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের অস্ত্র-ঝঞ্ঝনায়, কামানের বজ্রনিনাদে, সৈন্যের কোলাহলে, অশ্বের হ্রেষা রবে ও রণবাদ্যের তুমুল শব্দে বাংলার আকাশ-বাতাস কাঁপিতে লাগিল। মোগল-পক্ষে সাগর-তরঙ্গের মত অগণিত সৈন্য-বল, আর মুকুন্দরায়ের পক্ষে সে তুলনায় মুষ্টিমেয় মাত্র। মুকুন্দ রায় মনে মনে বুঝিলেন, এবার আর

রক্ষা নাই, কিন্তু তিনি হৃদয়ের বল হারাইলেন না। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, উভয় পক্ষই প্রবল বিক্রমে উভয় পক্ষকে আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষের শোণিতে রণাঙ্গন কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল। হঠাৎ একটী কামানের গোলা আসিয়া মুকুন্দ রায়ের সম্মুখে বিদীর্ণ হইয়া গেল। বীরবর সেই আঘাতেই বীরের বাঞ্ছিত স্বর্গধামে মহাপ্রস্থান করিলেন। বঙ্গের ষোড়শ শতাব্দীর দ্বাদশ সূর্য্যের একটী সেই দিন ফতেজঙ্গপুরের রণক্ষেত্রে চির অস্তমিত হইল। ফতেজঙ্গপুর এখনও ফরিদপুর জেলায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহা এখন একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম।

রাজা মুকুন্দ রায়ের বীরপুত্র শত্রুজিৎ রায় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার নবাব সুলতান সুজার সহিত শত্রুজিতের ভীষণ যুদ্ধ হয়, তিনি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া বহু সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু বিজয়লাভ করিতে পারিলেন না। যুদ্ধ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া সুজার হস্তে বন্দী হইলেন। দিল্লীতে বন্দী অবস্থাতেই বীর বালকের জীবনাবসান হয়। যশোহর জেলায় শত্রুজিৎপুর নামক গণ্ড-গ্রামটী এখনও তাঁহার পবিত্র ও বীরত্বমণ্ডিত স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চাঁদরায় ও কেদাররায়

যশোহরে যখন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রতাপ-বহ্নি রুদ্রতেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন বিক্রমপুরে চাঁদরায়-কেদাররায়ের বিক্রম-বজ্রও দিগন্ত কম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইতেছিল। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। যেখানে এখন বিশাল পদ্মা নদী তাহার শ্বেত জলরাশি লইয়া মেঘ-বরণ মেঘনার কালো জলের সহিত মিশিয়া যাইতেছে, সেইখানে কালীগঙ্গাতীরে চাঁদরায় ও কেদাররায়ের রাজধানী শ্রীপুর অবস্থিত ছিল। কিন্তু এখন শ্রীপুরের চিহ্নমাত্র নাই, পদ্মার ধ্বংস-লীলা তাহাকে গ্রাস করিয়া জঠর-জ্বালা নিবৃত্তি করিয়াছে। চাঁদরায় ও কেদাররায়ের কীর্ত্তি নাশ করিয়াই এখানে পদ্মা "কীর্ত্তিনাশা" নামে অভিহিত হইয়াছে। যে স্থলে শ্রীপুর অবস্থিত ছিল, সেখানে পদ্মাগর্ভে একটা চড়া পড়িয়া সেই শ্রীপুরের ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে; একদিন এই শ্রীপুর প্রকাণ্ড রাজধানী ছিল, লক্ষ লক্ষ লোকসমাগমে রাজধানী মুখরিত হইত; দেশদেশান্তর হইতে বাণিজ্য-তরণী দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া আসিয়া শ্রীপুর বন্দরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিত; উদ্যানবাটিকা, শীতলছায়াচ্ছন্ন রাজপথ, পণ্যবীথিপূর্ণ আপণশ্রেণী, সুপেয় জলপূর্ণ দীর্ঘিকা, বিগ্রহশোভিত মন্দিরসমূহ ও গগন-চুম্বিত প্রাসাদরাজি শ্রীপুরকে সত্যই শ্রীসম্পদে মণ্ডিত করিয়াছিল। প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে আরতির মঙ্গল-বাদ্য শ্রীপুরবাসিগণের কর্ণে স্বর্গ-সুধা ঢালিয়া দিত। শ্রীপুরের বিস্তৃত প্রান্তরে চাঁদরায় ও কেদাররায়ের বাঙ্গালী সৈন্যগণ রণক্রীড়া প্রদর্শন করিত। দূরদূরান্তর হইতে অপূর্ব্ব শ্রী দর্শনের নিমিত্ত পর্য্যটকগণ

শ্রীপুরে আসিত। কিন্তু সে দিন এখন স্বপ্নে পরিণত হইয়াছে। পদ্মাতীরে চাঁদরায় ও কেদাররায়ের কীর্ত্তি, রাজবাড়ীর মঠ, এতদিন প্রকৃতির নানা অত্যাচার সহ্য করিয়া উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান ছিল, ষ্টীমারে গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ যাইবার সময় আরোহিগণ বঙ্গবীরের এই কীর্ত্তি-চিহ্নটী দর্শন করিয়া একবার সেই অতীত যুগের গৌরব-কাহিনী স্মরণ করিত। এই মঠ চাঁদরায় ও কেদাররায় তাঁহাদের জননীর শ্মশানের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই কীর্ত্তিটীও আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। রাক্ষসী পদ্মা সার্দ্ধ তিনশত বৎসর পরে গত ১৩৩০ সালের ২২শে ভাদ্র শনিবার এই বিশাল মঠটী গ্রাস করিয়াছে।

প্রতাপাদিত্য যেরূপে নিজের শক্তিবলে যশোহর-রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, বিক্রমপুর-রাজ্য সেরূপে চাঁদরায় ও কেদাররায়ের দ্বারা স্থাপিত হয় নাই। সে রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল তাঁহাদের প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ নিমরায় নামক একজন বীরের দ্বারা।

নিমরায় ও তাঁহার বংশধরেরা পাঠানের অধীন জায়গীরদাররূপে প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর বিক্রমপুর শাসন করেন। ক্রমে পাঠানের রাজ-শক্তি শিথিল হইয়া আসিল। সমস্ত উত্তর-ভারত মোগল রাজ-লক্ষ্মীর চরণে মস্তক অবনত করিল। লুণ্ঠন, নরহত্যা, যুদ্ধ প্রভৃতি অত্যাচারে বাংলা দেশেও মোগলেরা বিভীষিকার সৃষ্টি করিল। যদিও তাহারা বঙ্গের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিল, তথাপি দেশকে সম্পূর্ণ করতলগত করিতে পারিল না। রাজ্যচ্যুত পাঠানেরা সময় ও সুবিধা পাইলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া এক এক স্থানে এক একটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক

রাজাবাড়ীব মঠ
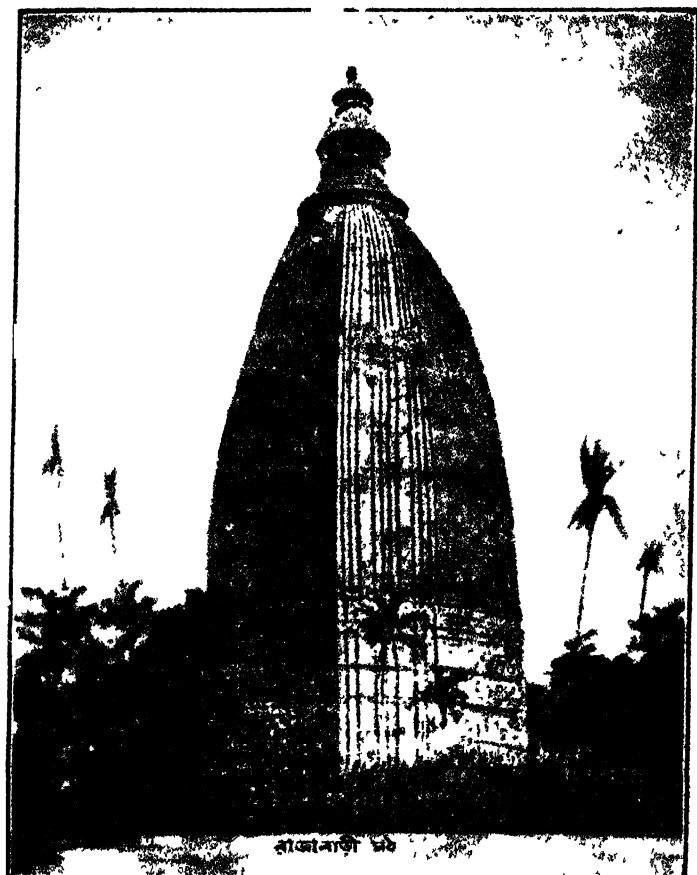
—৬৪ পৃষ্ঠা

শাসন-কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিত। মোগল-ফৌজ আসিয়া যুদ্ধ করিয়া তাহাদের রাজ্য কাড়িয়া লইত, নতুবা নিজেরাই পরাস্ত হইয়া চলিয়া যাইত। এইরূপ অরাজকতার সময় নিমরায়ের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ যাদবরায়ের দুই পুত্র চাঁদরায় ও কেদাররায় শ্রীপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে শ্রীপুর লোক-চক্ষুর অন্তরালে ছিল। মোগলের হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত চাঁদরায়-কেদাররায় শ্রীপুরকে সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অমিত অধ্যবসায়ের ফলে অচিরে শ্রীপুর প্রাকার-পরিখাবেষ্টিত দুর্গসমাকুল সুরক্ষিত নগরে পরিণত হইল। দিন দিন শ্রীপুরের সম্পদ্ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজত্ব করিতে হইলে রাজ্যলোলুপ মোগলের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য্য, আর সেই সংঘর্ষে আত্মরক্ষা করিতে হইলে যথেষ্ট নৌ-বল ও সেনা-বল থাকা প্রয়োজন। কেবল মোগল নহে, মগ ও ফিরিঙ্গি-দস্যুর অত্যাচারে তখন নিম্নবঙ্গ উৎসন্ন যাইতেছিল, তাহাদের আক্রমণের জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই জন্য দুই ভ্রাতা পরামর্শ করিয়া সমরোপকরণ সংগ্রহে যত্নবান্ হইলেন। সৈন্যবিভাগে দলে দলে নূতন সৈন্য ভর্ত্তি করিয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করা হইল, বড় বড় কামান ও তদুপযোগী গোলাবারুদ প্রস্তুত হইল, রাজ্যের নানাস্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মিত হইয়া তাহা ধান্যে ও শস্যে পূর্ণ হইতে লাগিল; মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে রণতরীর বিশেষ আবশ্যক; চাঁদরায়-কেদাররায় তাহারও আয়োজন করিতে বিস্মৃত হইলেন না। এইরূপে শক্তি সঞ্চয় করিয়া কেদাররায় মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ চাঁদরায় তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন, "আর কিছুদিন

অপেক্ষা কর ভাই, এই শক্তিকে আরও বর্দ্ধিত করিতে হইবে, আমরা বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের একটা প্রধান শক্তির অভাব, যত দিন সেই শক্তি লাভ করিতে না পারিব, ততদিন মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার আশা দুরাশা মাত্র। বাংলার দ্বাদশ ভৌমিক যদি একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হয়, তবেই মোগল পরাস্ত ও বিদূরিত হইবে,—বাংলার এই দ্বাদশ-সূর্য্য যদি এক সঙ্গে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তবে বিশাল বারিধি পর্য্যন্ত শুষ্ক করিয়া দিতে পারে, —মোগল ত ছার! অগ্রে সেই চেষ্টা কর ভাই, বাংলার ভৌমিক-রাজবৃন্দের দ্বারে দ্বারে যাইয়া এই একতারূপ মহামন্ত্রে তাহাদিগকে দীক্ষিত কর, তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞা-বন্ধনে আবদ্ধ কর, তারপর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।" জ্যেষ্ঠের উপদেশ কনিষ্ঠের মনোমত না হইলেও ভ্রাতৃভক্ত কেদাররায় তাহার অন্যথা করিতে পারিলেন না, জ্যেষ্ঠের আদেশ অবনত শিরে গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল, ভৌমিক-রাজগণকে আমন্ত্রণ করিয়া এক মহাসভার অনুষ্ঠান করা হইবে, এবং সেই সভায় সকলকে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া দূতগণ অশ্বারোহণে বিভিন্ন রাজ্যে ধাবিত হইল। যথাসময়ে শ্রীপুরের বিস্তৃত প্রান্তরে রাজগণ সমবেত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের আগমনে শ্রীপুর জনকোলাহলে মুখরিত বিরাট নগরে পরিণত হইয়াছিল। সেই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে বাংলার রাজগণ এক বিরাট সভায় উপস্থিত হইয়া দেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য সমস্বরে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলেন। চাঁদরায়-কেদাররায়ের প্রাণ আনন্দে উদ্বেলিত হইল। এই মহাসভায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যও স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ইশা খাঁ সোণার গাঁয়ের একজন প্রবল প্রতাপশালী পাঠান জমিদার। দ্বাদশ ভৌমিকের তিনিও একজন অন্যতম। ইশা খাঁ মুসলমান হইলেও চাঁদরায়-কেদাররায়ের সহিত তাঁহার অগাধ বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু কালে এই বন্ধুত্ব ঘোর শত্রুতায় পরিণত হইয়া চাঁদরায়ের জীবনান্ত করিয়াছিল;—সে কথা আমরা পরে বলিতেছি। ইশা খাঁর পিতা কালিদাস গজদানী বৈশ্য রাজপুত। তিনি অযোধ্যা হইতে গৌড়ে আগমন করিয়া বাদশাহ হুসেন শাহের কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সুলেমান খাঁ নামে অভিহিত হন।

অত বড় প্রকাণ্ড রাজ্য, অসীম ঐশ্বর্য্য, অগাধ প্রতিপত্তি, অমিত প্রতাপ, কিন্তু রাজা চাঁদরায় অপুত্রক! তাঁহার মনে শান্তি ছিল না; একমাত্র কন্যা স্বর্ণমণি, তিনিও বালবিধবা। চাঁদরায় কত আশা করিয়া আদরিণী কন্যাকে চন্দ্রদ্বীপের যুবরাজের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু স্বর্ণের অদৃষ্টে বিধাতা স্বামিসুখ লিখেন নাই; বিবাহের অল্পদিন পরেই সীমন্তের সিন্দুর মুছিয়া, হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া ও থান পরিয়া অভাগিনী স্বর্ণ মাতাপিতার বুকে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাদের বুক একেবারে চূর্ণ করিয়া দিল। স্বর্ণ পরম রূপবতী, শারদ জ্যোৎস্নার মত তাঁহার উচ্ছ্বসিত রূপ, গ্রীকভাস্কর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির মত তাঁহার অঙ্গের গঠন, বর্ষার মেঘমালার মত তাঁহার গভীর কৃষ্ণ কুন্তলদাম। কিন্তু এই দেবদুর্ল্লভ রূপই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইল;—এই রূপের জন্যই পিতার জীবন-প্রদীপ অকালে নির্ব্বাপিত হইল,—এই রূপের জন্যই শ্রীপুর শ্রীভ্রষ্ট শ্মশানে পরিণত হইল।

মোগলের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে চলিল, আর নীরবে সময় অতিবাহিত করিলে চলিবে না। ইশা খাঁ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

হইলেন ; সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য, সমস্তই সংগৃহীত হইল। কিন্তু বন্ধু চাঁদরায় কেদাররায়ের সহিত পরামর্শ না করিয়া তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন না, তাই তিনি বন্ধুসংমিলনোদ্দেশে শ্রীপুর যাত্রা করিলেন। চাঁদরায় আনন্দে অধীর হইয়া দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থারও ক্রটী হইল না। বিশ্রামান্তে দুই ভ্রাতা ইশা খাঁর সহিত মন্ত্রণাভবনে প্রবেশ করিয়া দেশের অবস্থা, মোগলের অত্যাচার প্রভৃতি রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। ইশা খাঁ বলিলেন, "আর নয় বন্ধু, আর সময়ক্ষেপ করিলে চলিবে না, অচিরে রণ-যজ্ঞের আয়োজন করুন।" চাঁদরায়ও কেদাররায়কে বলিলেন, "হাঁ ভাই, সময় উপস্থিত।" তারপর ইশা খাঁ নগর পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন। স্বর্ণমণি রাজপ্রাসাদ-শিখরের গবাক্ষ-পথে দণ্ডায়মান হইয়া শোভাযাত্রা দেখিতেছিলেন। সহসা ইশা খাঁর চক্ষু সেই দিকে নিপতিত হইল ; স্বর্ণমণি ইশা খাঁকে দেখিবামাত্র শিহঁরিয়া উঠিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ইশা খাঁর আর নগর ভ্রমণ করা হইল না, একটা তীব্র জ্বালা প্রাণে পূরিয়া তিনি স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রায়ভ্রাতৃদ্বয় ইশা খাঁর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কোনই কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না।

ইশা খাঁ স্বর্ণগ্রামে ফিরিয়া গিয়া দিবারাত্র অন্যমনস্ক ভাবে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন তিনি বিস্মৃত হইলেন, অতিপ্রিয় রাজকার্য্যও তাঁহার নিকট বিষবৎ মনে হইতে লাগিল। চিন্তায় চিন্তায় ইশা খাঁর মুখশ্রী মলিন হইয়া গেল। কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহার এই ভাবান্তর দর্শনে চিন্তিত ও ভীত হইয়া পড়িল। ইশা খাঁ

চিন্তা করিতে লাগিলেন, স্বর্ণমণিকে জীবনসঙ্গিনী করিয়া সোণারগাঁয়ের সিংহাসনে বসাইতে না পারিলে তাঁহার ধনসম্পদ্ অনর্থক। কিন্তু তিনি মুসলমান আর স্বর্ণমণি হিন্দু বিধবা,—বিশেষতঃ বিক্রমপুরাধিপ প্রতাপান্বিত চাঁদরায়ের কন্যা। এক্ষেত্রে স্বর্ণমণি-লাভের কল্পনা তাঁহার পক্ষে স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নয়। তরবারির সাহায্য গ্রহণ করিতে গেলে চিরদিনের সুদৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইবেন কি না কে জানে? ইশা খাঁ দিনরাত উপায় উদ্ভাবনের চিন্তায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন,—অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, চাঁদরায়ের নিকট তাঁহার কন্যার পাণিপার্থী হইয়া পত্রসহকারে একজন দূতকে শ্রীপুরে প্রেরণ করিবেন। ইশা খাঁর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী এনায়েৎ খাঁ পত্র লইয়া শ্রীপুর যাত্রা করিল। ইশা খাঁ তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, শ্রীপুরে যাইয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে না, পত্রের উত্তর লইয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিতে হইবে।

স্বর্ণগ্রাম হইতে দূত আসিয়াছে শুনিয়া কেদাররায় বহির্গত হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। এনায়েৎ খাঁ কুর্ণিশ করিয়া কেদারের হস্তে পত্রখানা অর্পণ করিল। বন্ধু ইশা খাঁ পত্র লিখিয়াছেন, কেদাররায় সানন্দে পত্র খানা খুলিয়া পাঠ করিয়াই ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "কি, এতদূর স্পর্দ্ধা! যাও দূত, তোমার প্রভুকে বলিও, এই পত্রের সমুচিত উত্তর তিনি রণক্ষেত্রে পাইবেন।" দূত প্রস্থান করিল। কেদাররায় পত্রহস্তে ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে চাঁদরায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। চাঁদরায় কনিষ্ঠের অগ্নি-মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি ভাই! ও কাহার পত্র?" "অতি স্পর্দ্ধা, বামন হইয়া চাঁদ ধরার

আকাঙ্ক্ষা!”—বলিয়া কেদাররায় পত্রখানা চাঁদরায়ের পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিলেন। পত্রখানা তুলিয়া পড়িতে পড়িতে চাঁদরায়ের সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মধারা বহিতে লাগিল, চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন, “কেদার, বন্ধুত্ব বিস্মৃত হও—সৈন্য সজ্জিত কর, সোনারগাঁ ছারখারে দাও!”

রণদামামা বাজিয়া উঠিল, যুদ্ধোন্মাদনায় শ্রীপুর পূর্ণ হইল। সৈন্য, অশ্ব, হস্তী ও রণতরীসমূহ সজ্জিত হইল। চাঁদরায় ও কেদাররায় কুল-দেবতা কোটীশ্বরের চরণে অঞ্জলি প্রদান করিয়া স্বর্ণগ্রাম অভিমুখে অভিযান করিলেন। রাজধানী রক্ষার ভার দেওয়ান রঘুনন্দনের উপর অর্পিত হইল। ইশা খাঁ চর-মুখে চাঁদরায়-কেদাররায়ের আগমন-সংবাদ পাইয়া সসৈন্য বাধা প্রদানের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। কলাগাছিয়া নামক স্থানে হিন্দু-পাঠানে তুমুল সংগ্রাম হইল। হিন্দুর কামানের গোলার আঘাতে ইশাখাঁর কলাগাছিয়া দুর্গ ভূমিসাৎ হইয়া গেল, সৈন্য ও কামনসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। ইশা খাঁ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক ত্রিবেণী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই ত্রিবেণী দুর্গ ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও লাক্ষা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। ইশা খাঁকে পরাস্ত করিয়া কেদাররায়ের ক্রোধোপশম হইল না, দুর্ব্বৃত্তের শোণিতে স্বীয় তরবারি রঞ্জিত করিতে না পারিলে তাঁহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইবে না। চাঁদরায়কে কলাগাছিয়ায় অবস্থান করিতে বলিয়া তিনি প্রায় দেড় সহস্র সুশিক্ষিত নৌ-সৈন্য, দেড় শত নৌকা এবং উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ত্রিবেণী দুর্গ আক্রমণে যাত্রা করিলেন। বাঙ্গালী সৈন্যগণ হুঙ্কার-শব্দে নদীবক্ষ কম্পিত করিয়া তালে তালে দাঁড় টানিতে টানিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। হায়, সেই দিনও গিয়াছে, সেই বাঙ্গালীও

গিয়াছে ;—সে সব কাহিনী আজ আমাদের নিকট কেবলমাত্র কবি-কল্পনা বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য্য নামক একজন ব্রাহ্মণ চাঁদরায় ও কেদাররায়ের গুরু ছিলেন। কোনও কারণে চাঁদরায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দেবল ব্রাহ্মণকে গুরুপদে বরণ করেন। শ্রীমন্ত এই জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া চাঁদরায় ও কেদাররায়ের সর্ব্বনাশ সাধনের পথ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। ইশা খাঁ যখন ত্রিবেণী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন বিশ্বাস-ঘাতক ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক শ্রীমন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বর্ণমণিকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। খাঁসাহেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিলেন, এবং কার্য্য সাধন করিয়া প্রত্যাগত হইলে আরও অধিক পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। পাপমতি শ্রীমন্ত আনন্দে অধীর হইয়া শ্রীপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

শ্রীমন্তের যাত্রার অব্যবহিত পরেই কেদাররায়ের নৌ-বাহিনী ত্রিবেণী দুর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল। এত শীঘ্র আক্রমণের জন্য ইশা খাঁ প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং অতি সহজেই তিনি পরাস্ত হইয়া স্বীয় রাজধানী খিজিরপুরাভিমুখে পলায়ন করিলেন। ত্রিবেণী দুর্গ কেদাররায়ের অধিকারে আসিল।

শ্রীমন্ত উন্মাদের মত আসিয়া শ্রীপুরে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার অবাধ গতি। কারণ এতদিন তিনি চাঁদরায় ও কেদাররায়ের কুল-গুরু ছিলেন। রাণী যেখানে বসিয়া রাজ্যের, স্বামীর ও দেবরের মঙ্গলের জন্য দেবতার চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতেছিলেন, শ্রীমন্ত সেখানে উপস্থিত হইয়া উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া কহিলেন, "মা, সর্ব্বনাশ

হইয়াছে ; হে কোটীশ্বর, তোমার মনে এই ছিল ? বড় দুঃসংবাদ রাণীমা, ত্রিবেণীর যুদ্ধে আমাদের সৈন্য পরাস্ত ; রাজা ও কুমার বাহাদুর পাঠানের হস্তে বন্দী, অধিকাংশ সৈন্যই নিহত। ইশা খাঁ সৈন্য লইয়া শ্রীপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছে ; তাহার দৃঢ় পণ যে, সে গোলার ঘায়ে শ্রীপুর উড়াইয়া দিয়া স্বর্ণকে লইয়া যাইবে। এখনো সময় আছে মা, উপায় কর—উপায় কর। বিলম্বে সর্ব্বনাশ হইবে।"

শ্রীমন্তের কথা রাণী অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার মস্তকে কে যেন এক সঙ্গে শত বজ্র নিক্ষেপ করিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তিনি দেওয়ান রঘুনন্দনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রঘুনন্দন আসিয়া শ্রীমন্তের মুখে যুদ্ধের সংবাদ শুনিলেন, কিন্তু তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না, কারণ তিনি পূর্ব্বদিন দূতমুখে যুদ্ধের যে সংবাদ পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহাদেরই বিজয়-সংবাদ। কিন্তু ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক শ্রীমন্ত তাঁহাকে এমন ভাবে বুঝাইলেন যে, রাজকার্য্যে শুক্লকেশ বৃদ্ধ রঘুনন্দনও তাহা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলেন। শ্রীমন্ত পরামর্শ দিলেন, "স্বর্ণমণির উপরেই যখন ইশা খাঁর লোভ, তখন তাঁহাকে অদ্যই শ্রীপুর হইতে চন্দ্রদ্বীপে তাঁহার স্বামিগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হউক, আর রঘুনন্দন এদিকে শ্রীপুর রক্ষার বন্দোবস্ত করুন।" প্রথমোক্ত যুক্তিটী যদিও রঘুনন্দনের নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না, তথাপি রাণীর অনুরোধে তিনি স্বর্ণকে চন্দ্রদ্বীপে প্রেরণের বন্দোবস্ত করিলেন ; দুই জন দাসী সমভিব্যাহারে শ্রীমন্তের সহিত স্বর্ণমণি অশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত করিতে করিতে শ্বশুর-ভবনে যাত্রা করিলেন। রাণী তাঁহার অত আদরের বুক-জোড়া মাণিক স্বর্ণকে নয়ন-জলে অভিষিক্ত করিয়া নৌকায় তুলিয়া দিলেন। হায়, তখন কে জানিত যে, চিরদিনের জন্য স্বর্ণমণি

শ্রীপুর অন্ধকার করিয়া চলিলেন! নৌকা পালভরে তীরবেগে ছুটিয়া চলিল; স্বর্ণের প্রাণ উতলা বাতাসের মত হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীমন্ত নানা কথায় তাঁহার চিত্ত-বিনোদনে নিষ্ফল চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কয়েক দিন পরে এক অপরাহ্ন বেলায় নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। স্বর্ণ চাহিয়া দেখিলেন, এ সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান। যে ঘাটে তিনি স্বামীর হাত ধরিয়া প্রথম অবতরণ করিয়াছিলেন, আর তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া যে ঘাট হইতে তিনি শ্রীপুর যাত্রা করিয়াছিলেন এ ত সে ঘাট নয়। ঘাটের নিকট বিশাল বটবৃক্ষের নীচে সেই শিবমন্দির, মন্দিরের পার্শ্বে সেই বিরাট দীঘি ও প্রকাণ্ড বকুল গাছ,—এ সব ত কিছুই নাই। তিনি শ্রীমন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোথায় আসিলাম, গুরুদেব? এ যে নূতন জায়গা, সে বার ত এ ঘাট দেখি নাই।" শ্রীমন্ত হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সে আজ কত বৎসরের কথা, নদীতে সে সব কবে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার কি ঠিক আছে?"

পাল্কী আসিল। শ্রীমন্ত স্বর্ণকে উঠিতে বলিলেন। স্বর্ণ মনে মনে কোটীশ্বরকে প্রণাম করিয়া পাল্কীতে উঠিলেন। দাসীরা পশ্চাতে রহিল। পাল্কী যাইয়া ইশা খাঁর বিচিত্র কারুকার্য্যময় বিশাল রাজ-ভবনের দ্বার-দেশে উপস্থিত হইল। স্বর্ণ পাঠান প্রহরী দিগকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইশাখাঁ ও শ্রীমন্তের আশা পূর্ণ হইল।

এদিকে দেওয়ান রঘুনন্দন শ্রীপুর রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া চাঁদরায় ও কেদাররায়ের সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত কলাগাছিয়া, ত্রিবেণী এবং খিজিরপুরে দূত প্রেরণ করিলেন। চাঁদরায় ও কেদাররায় তখন

খিজিরপুরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। দূত যাইয়া তাঁহাদিগকে শ্রীমন্তের দৌত্য এবং তাঁহার সহিত স্বর্ণমণির চন্দ্রদ্বীপে গমনের সংবাদ নিবেদন করিল। এই দুঃসংবাদ শ্রবণে ভ্রাতৃদ্বয়ের শিরে যেন সহস্র বজ্রাঘাত হইল। শিবিরের আনন্দ-উৎসব বন্ধ হইয়া গেল। চাঁদরায় কেদাররায়কে বলিলেন, "ভাই, এ আর কিছুই নয়, শ্রীমন্ত তাঁহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া লইলেন। আর বুঝি আমার স্বর্ণকে দেখিতে পাইব না? জানি না, স্বর্ণের অদৃষ্টে কি আছে? যে স্বর্ণ আমার জাগরণে আনন্দ, নিদ্রায় স্বপ্ন, দুঃখে শান্তি, দর্শনে তৃপ্তি, চিন্তায় সুখ,—আমার যে স্বর্ণ শ্রীপুরের সৌন্দর্য্য, সে শ্রীপুর অন্ধকার করিয়া চলিয়া গিয়াছে। হয়ত সে চন্দ্রদ্বীপে যায় নাই, হয়ত শ্রীমন্তের কৌশলে সে ইশা খাঁর হস্তগত হইয়াছে! তুমি চন্দ্রদ্বীপে লোক পাঠাও, আমি শ্রীপুরে চলিলাম। যদি এই চক্রান্তে ইশা খাঁ জড়িত থাকে তবে খিজিরপুরের চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া তারপর শ্রীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিও।"—এই বলিয়া তিনি রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রাণের সমস্ত উৎসাহ ও আনন্দ বিসর্জ্জন দিয়া চাঁদরায় শ্রীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। চন্দ্রদ্বীপ হইতে দূত ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, স্বর্ণমণি তথায় যান নাই। চাঁদরায়ের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার হৃদয়ানন্দবিধায়িনী স্বর্ণ ইশা খাঁর করতলগত হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয় সে দারুণ আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িল। অতি প্রিয় রাজ-কার্য্যও তাঁহার আর ভাল লাগিল না। তিনি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। তারপর যে দিন সত্য সত্যই দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, ইশা খাঁর অন্তঃপুরে স্বর্ণমণি বন্দিনী হইয়াছেন, সেই দিন আর চাঁদরায় জীবনের গুরুভার সহ্য করিতে পারিলেন না—সাধের রাজ্য

রাজ-ভবন ও পরিজনবর্গকে শোকের সাগরে ভাসাইয়া তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিলেন।

কেদাররায় ইশা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া তাঁহাকে নানা স্থানে পরাজিত করিতেছিলেন, সহসা জ্যেষ্ঠের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া রাজধানীতে ফিরিতে হইল। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুতে কনিষ্ঠের দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল, হৃদয়ের শক্তি, উৎসাহ, সবই মন্দীভূত হইয়া গেল। তিনি কিছুদিন নিতান্ত অবসন্ন হৃদয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন,—রাজ্যের কোন বিষয়েই তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। বিচক্ষণ দেওয়ান রঘুনন্দন রায় রাজ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। দেশের তৎকালীন রাজনীতিক অবস্থা যেরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতে ছিল, তাহাতে কেদাররায় বেশী দিন উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। মোগল, মগ ও ফিরিঙ্গিরা কেদাররায়ের রাজ্যের উপর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য আবার কেদারকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল। এবার তিনি মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া আপনার স্বাধীনতা প্রচার করিলেন। শ্রীপুর-দুর্গ-শীর্ষে কেদারের স্বাধীন পতাকা গর্ব্বভরে পবনান্দোলনে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

পদ্মানদী যেখানে যাইয়া সাগরে পড়িতেছে তাহারই অনতিদূরে সাগর-বক্ষে 'সন্দীপ' নামে একটী দ্বীপ অবস্থিত। এই দ্বীপ তখন লবণের ব্যবসায়ের জন্য ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রতি বৎসর দেশদেশান্তর হইতে শত শত জাহাজ লবণ লইবার জন্য এইস্থানে সমবেত হইত। শস্য-সম্পদেও এই দেশ যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ফ্রেড্রিক নামক একজন ইউরোপীয় পর্য্যটক ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই

দ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া ইহাকে 'স্বর্ণদ্বীপ' নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক 'সন্দ্বীপ' তখন 'স্বর্ণদ্বীপ'ই ছিল। এই দ্বীপ পূর্ব্বে মুর নামক মুসলমানদিগের অধিকৃত ছিল। পরে চাঁদরায় ও কেদাররায় মুরদিগকে পরাভূত করিয়া এই দ্বীপের অধিস্বামী হন। কিন্তু তাঁহারা যখন ইশা খাঁকে সমুচিত শাস্তি প্রদানের নিমিত্ত সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া সোণার গাঁ অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, সেই সুযোগে মোগলেরা এই দ্বীপ অধিকার করিয়া লয়।

পর্ত্তুগীজ* বীর কার্ভালো কেদাররায়ের নৌ-বিভাগের সেনাপতি ছিলেন। কেদাররায়ের নৌ-বাহিনী তৎকালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল, এই নৌ-বাহিনীর প্রচণ্ড শক্তি দর্শনে মোগলেরাও ভীত ও বিস্মিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়াছিল। কোথায় আজ বাঙ্গালীর সে প্রতাপ! কেদাররায়ের অনুমতি লইয়া কার্ভালো মোগলের হস্ত হইতে সন্দ্বীপ অধিকার করিতে চলিলেন। জলে ও স্থলে যুদ্ধ হইল। মোগলেরা পরাস্ত হইয়া সন্দ্বীপ পরিত্যাগ করিল। কার্ভালোর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া গুণগ্রাহী কেদার তাঁহারই হস্তে সন্দ্বীপের শাসন-ভার ন্যস্ত করিলেন। কার্ভালো কেদাররায়কে বাৎসরিক কর প্রদান করিয়া সন্দ্বীপ শাসন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে পর্ত্তুগীজেরা যাইয়া সেই দ্বীপে বাস করিতে লাগিল। আরাকানের মগরাজ*চিরদিনই পর্ত্তুগীজদিগের উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন; পর্ত্তুগীজেরাও মগদিগের উপর প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইলে তাহা পরিত্যাগ করিত না। এইবার পর্ত্তুগীজেরা একটা নিজস্ব বাসস্থান লাভ করিয়া সময়ে অসময়ে আরাকান-রাজের রাজ্যে আপতিত হইয়া লুণ্ঠনাদি করিতে আরম্ভ করিল। আরাকানরাজ তাহাদের এই স্পর্দ্ধা সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি কার্ভালোর

বিরুদ্ধে দেড় শত সুসজ্জিত রণতরী প্রেরণ করিলেন। কেদাররায় এই সংবাদ পাওয়া মাত্র সন্দ্বীপ রক্ষার জন্য অগ্রসর হইলেন। উত্তাল উর্ম্মি-মুখর বঙ্গোপসাগর-বক্ষে বাঙ্গালী-সৈন্যে ও মগ-সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম হইল। কামানোদ্‌গীর্ণ ধূমশিখায় সমুদ্র-বক্ষ কুজ্ঝটিকাচ্ছন্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই যুদ্ধে মগরাজ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন, তাঁহার অধিকাংশ রণতরী ও সৈন্য বঙ্গবীরের হস্তে ধৃত হইয়া শ্রীপুরে আনীত হইল। কিন্তু মগরাজ পরাস্ত হইয়া নিরস্ত হইলেন না, তিনি পুনরায় প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারের আশায় যুদ্ধায়োজন করিতে লাগিলেন। এইবার এক সহস্র রণতরী সন্দ্বীপের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। শত্রু-শোণিতে সাগর-বারি রঞ্জিত করিয়া এবারও বীরবর কেদাররায় বিজয়-মাল্যে বিভূষিত হইয়া শ্রীপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজধানীতে বিরাট আড়ম্বরে বিজয়োৎসব চলিল। কেশার মা নাম্নী জনৈকা বৃদ্ধা ধাত্রী কেদাররায়কে শৈশবে মানুষ করিয়াছিল। কেদার যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন করিলে কেশার মা আসিয়া পুরস্কার চাহিল। কেদার বলিলেন, "ধাই মা, তোমাকে আমি এমন ভাবে পুরস্কৃত করিব যে, তোমার নাম চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।—তুমি বিশ্রাম না করিয়া একবারে হাঁটিয়া যতদূর যাইতে পারিবে, আমি ততদূর একটা দীঘি কাটাইয়া দিব।" কেশার মা পরম আনন্দিত হইয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল, যতদূর সে একবারে হাঁটিয়া যাইতে সমর্থ হইল, কেদাররায় ততদূর প্রসারিত এক প্রকাণ্ড দীঘিকা খনন করাইলেন। আজিও বিক্রমপুরে সেই দীঘি বিরাজিত থাকিয়া কেদাররায়ের মহাবিজয়-স্মৃতি বহন করিতেছে। সেই দীঘি **"কেশার মার দীঘি"** নামে পরিচিত। কেদাররায়ের এইরূপ বহু স্মৃতি বিক্রমপুরের বক্ষে আজও বিরাজ করিতেছে, কিন্তু কে তাহার সন্ধান লয়?

কেদাররায় প্রবল্ পরাক্রান্ত স্বাধীন নৃপতির মত শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, তাহার উপর আবার তাঁহার উক্ত বিজয়বার্ত্তা বঙ্গের তৎকালীন সুবাদার মানসিংহের কর্ণে পৌঁছিলে তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, শীঘ্র কেদাররায়কে পরাজিত করিয়া তাঁহার উদীয়মান শক্তির মূলোচ্ছেদ করিতে না পারিলে উহা মোগল সাম্রাজ্যের অকল্যাণকর হইতে পারে, এই ভাবিয়া মানসিংহ মুকুটরায় (মান্দারায়) নামক জনৈক বাঙ্গালীর নেতৃত্বে একশত রণতরী ও তদুপযুক্ত সৈন্য শ্রীপুরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কেদাররায় শত্রুর আগমন-সংবাদ শুনিয়া তাঁহার রণ-তরীসমূহ বঙ্গীয় বীরবৃন্দে পরিপূর্ণ করিয়া মোগলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। পথে কালিন্দী নদীর বক্ষে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে কেদাররায়ের হস্তে মুকুটরায় পরাজিত ও নিহত হইলেন। সে দিন কালিন্দীর কৃষ্ণজলে শোণিতের তরঙ্গ তুলিয়া বাঙ্গালী বীর যে সংগ্রাম করিয়াছিল, সেই সংগ্রামের ভৈরবগর্জ্জন অতীতের গর্ভ ভেদ করিয়া আজিও যেন বিক্রমপুরের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে।

মুকুটরায়ের পরাজয় এবং নিধনবার্ত্তা যখন মানসিংহের কর্ণে পৌঁছিল, তখন তিনি মগদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। গর্ব্বিত মানসিংহ মনে করিয়াছিলেন, দুর্ব্বল বাঙ্গালী আবার কি যুদ্ধ করিবে? মোগল-সৈন্যের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়াই হয়ত শ্রীপুরাধিপতি ভীতচিত্তে পলায়ন করিবেন, অথবা মোগলের চরণতলে অস্ত্র সমর্পণপূর্ব্বক অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবেন। মানসিংহ যখন শ্রীপুরের বিরুদ্ধে প্রেরিত তাঁহার বাহিনীর সুনিশ্চিত বিজয়-স্বপ্নে বিভোর ছিলেন, তখন সহসা এই সর্ব্বনাশ পরাজয়-সংবাদে তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কাল-বিলম্ব না করিয়া কিলমক্ খাঁকে এক বৃহৎ সৈন্যদলের নেতৃত্ব প্রদান

করিয়া কেদাররায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কেদার এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তিনি বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া কিল্‌মকের গতিরোধেব নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। বাঙ্গালী সৈন্যের অশ্রান্ত গুলি-বর্ষণে ও অদ্ভুত বীর্য্যমত্তায় মোগল বাহিনী বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল, অধিকাংশ সৈন্যই রণক্ষেত্রে চিবনিদ্রা বরণ করিয়া লইল। আর সেনাপতি কিল্‌মক্‌?—তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া শ্রীপুর-কারাগাবে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

বড় আশা ও দর্প কবিয়া মানসিংহ কিল্‌মক্‌কে পাঠাইয়াছিলেন। কেদাববায়েব হস্তে যখন তাঁহাব সে দর্প চূর্ণ হইল, তখন তিনি একখানা তরবারি, একগাছি শৃঙ্খল এবং একখানি পত্রসহ জনৈক দূতকে কেদার-রায়ের নিকট প্রেবণ কবিলেন,—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হয় কেদাররায় মোগলেব বশ্যতা স্বীকাব করুন, নতুবা সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। বীরবর কেদারবায় মোগল দূতকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তরবারি গ্রহণ করিলেন। শ্রীপুব আবার রণোন্মাদনায় মাতিয়া উঠিল, সৈন্যগণ তাহাদের শিথিল শিরস্ত্রাণ দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া গুম্ফমর্দ্দনপূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কেদাররায় পাঁচশত রণতরী লইয়া মোগলের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। মানসিংহ কেদাররায়ের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন; কিন্তু বীরবর কেদাররায় অধিকদিন মোগলের পাদুকাবাহী মানসিংহের সহিত বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেন না, সুতরাং আবার রাজ্যময় যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কেদার বুঝিতে পারিলেন, এ অনলে হয় মানসিংহ ভস্মীভূত হইবেন, নতুবা বিক্রমপুরের আশাভরসা সমুদয় পদ্মাগর্ভে চিরতরে বিসর্জ্জিত হইবে। রণদুন্দুভির ভৈরব-রবে ও

সৈন্য-কোলাহলে শ্রীপুরের আকাশ-বাতাস কম্পিত হইয়া উঠিল। পদাতিক, অশ্বারোহী এবং নৌ-সৈন্য লইয়া কেদাররায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কোটীশ্বর-মন্দিরে সপ্তাহকালব্যাপী পূজা, হোম ও আরতি চলিল। কোটীশ্বরের আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া বীরবর রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ফতেজঙ্গপুরের নৌযুদ্ধে ভীষণ অগ্নি-ক্রীড়া চলিল, বিজয়লক্ষ্মী কাহার গলায় জয়-মাল্য পরাইবেন ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময় বিপক্ষের একটা প্রকাণ্ড গোলা কেদাররায়ের সম্মুখে নিপতিত হইয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল। সেই দারুণ আঘাতে বীরবর ভূতলশায়ী হইলেন। রাজাকে পতিত হইতে দেখিয়া বাঙ্গালী সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। মানসিংহ জয়লাভ করিলেন। কেদাররায় আহত অবস্থায় মোগলের কারাগারে বন্দী হইয়া অল্পদিনমধ্যেই জীবন-লীলা সম্বরণ করিলেন।*

বিক্রমপুরকে চির অন্ধকারে ডুবাইয়া বাংলার একটা প্রদীপ্ত সূর্য্য অস্তমিত হইল। কেদাররায়ের মৃত্যুর পর মানসিংহ সহজেই শ্রীপুর অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। কেদার-মহিষী দেওয়ান রঘুনন্দন, সেনাপতি রামশরণ, রামরাজ সর্দ্দার, কালী ঢালী প্রভৃতি বীরবৃন্দের সাহায্যে কিছুদিন প্রচণ্ড শক্তিতে মোগলের গতিরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না। শ্রীপুর মোগলের করতলগত হইল। মানসিংহ শ্রীপুরের

* বীরবর কেদাররায়ের মৃত্যুসম্বন্ধে অনেক প্রকার জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, নয় দিবস যুদ্ধের পর দশম দিবসে যখন কেদাররায় যুদ্ধ-যাত্রার পূর্ব্বে স্বীয় ইষ্টদেবী দশমহাবিদ্যার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছিলেন, তখন মোগলপক্ষীয় গুপ্ত ঘাতকের খড়্গাঘাতে তাঁহার শির দেহচ্যুত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। পূর্ব্বকথিত বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণ শ্রীমন্ত খাঁ এই হত্যা সাধনের নায়ক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শীলাদেবীকে অম্বরে লইয়া গিয়া জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আজিও এই দেবী জয়পুরে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নিত্য পূজিত হইতেছেন।

হায় বিংশ শতাব্দীর বিলাস-নিমজ্জিত পরিশ্রমবিমুখ বাঙ্গালী, একবার কি তোমার দেশের, তোমার জাতির সেই বীরত্বের পুণ্যময়ী স্মৃতি স্মরণ করিয়া ভক্তিপ্রণত-চিত্তে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা হয় না? একবার কি ইচ্ছা হয় না তোমার যে, বাঙ্গালী আবার প্রতাপ, সীতারাম, কেদাররায়, রাজা কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র, মুকুন্দরায় প্রভৃতি বীরবৃন্দের পূতস্মৃতির উদ্দেশে প্রাতঃ-সন্ধ্যা ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করুক। তুমি চিরদিনই ত এমন দীন হীন জীর্ণ কঙ্কালসার ছিলে না; একদিন তোমার রণপোত ভারতসাগরের বীচি-বিক্ষোভ উপেক্ষা করিয়া সিংহল বিজয় করিয়াছিল,—একদিন তোমার আগ্নেয়াস্ত্র-নিক্ষিপ্ত গোলকের ধূমপটলে বঙ্গোপসাগর-বক্ষ আচ্ছন্ন করিয়াছিল; একদিন তুমি যাভা, সুমাত্রা, চীন, জাপানে উপনিবেশ গঠন করিয়াছিলে (১); একদিন, হে বাঙ্গালী! তোমার পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান হিমগিরি লঙ্ঘনপূর্ব্বক তিব্বতে গমন করিয়া জ্ঞানে, ধর্ম্মে, বিদ্যায় ও পবিত্রতায় তৎকালীন বৌদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট ভগবান্ বুদ্ধের তুল্য শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিয়াছিলেন (২);—তোমার পণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দার মহাবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষের পদে বৃত হইয়াছিলেন (৩);—হে বাঙ্গালী! ইচ্ছা হয় কি তোমার একবার

১। *Indian Shipping—Page 156.*

২। ৯৮০ খ্রীঃ অব্দে ঢাকা বিক্রমপুরস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ জন্মগ্রহণ করেন।

৩। ৪৪৭ শকে মহামহোপাধ্যায় শীলভদ্র ঢাকা জিলার রামপাল নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাণ ভরিয়া সেই অতীত গৌরবময় যুগের স্মৃতি-গাথা স্মরণ করিতে ? হে বাঙ্গালী! ভুলিও না তোমার শতগৌরব-বিজড়িত সেই অতীত কাহিনী! যে জাতি তাহার গৌরবময় অতীতের পূজা করিতে জানে না, ধ্বংস তাহার সুনিশ্চিত।

চাঁদরায় ও কেদাররায় গিয়াছেন, তাঁহার রাজধানী শ্রীপুরও পদ্মার কুক্ষিগত; তাঁহাদের বহুকীর্ত্তি কালের ধ্বংসলীলায় লোক-চক্ষুর অন্তরালে নিপতিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের শৌর্য্যখ্যাতি, বীরত্বের গাথা আজিও শতমুখে ঘোষিত হইতেছে। পদ্মা ও মেঘনার সম্মিলিত জলোচ্ছ্বাস 'শ্রীপুরের টেক'কে বিধৌত করিয়া রুদ্রভৈরব কণ্ঠে গাহিতেছে—

"এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন,
আসিবে সে দিন আসিবে।"

রাজা সীতারাম রায়

মোগল সম্রাট্ সাহজাহানের অন্তিম বয়সে যখন সিংহাসনলাভের নিমিত্ত পুত্রগণের মধ্যে দারুণ সংঘর্ষ চলিতেছিল, এবং কৌশলী আওরঙ্গজেবের চক্রান্ত-জালে নিপতিত হইয়া যখন অন্যান্য ভ্রাতৃগণ একে একে জগৎ হইতে বিদায় লইতেছিল, ভারতের সেই সর্ব্বব্যাপী, সংগ্রাম-যুগে **সীতারাম** জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম উদয়-নারায়ণ। সীতারামের জন্মকালে উদয়নারায়ণ রাজমহলের নবাব-সরকারে সামান্য বেতনে চাকরী করিতেন। সীতারামের জননী একজন তেজোবীর্য্যসম্পন্না বীরনারী ছিলেন; তিনি যখন পিত্রালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এক গভীর নিশীথে সহসা তাঁহার পিতৃভবন দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। এই তরুণী বীরনারী তখন একখানি তীক্ষ্ণ খড়্গ হস্তে লইয়া রণরঙ্গিণী চামুণ্ডা মূর্ত্তিতে দস্যুদলকে পরাভূত করিয়া বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বীর সীতারাম এই বীরজননীর গর্ভসম্ভূত এবং তাঁহারই স্তন্যদুগ্ধে পরিপুষ্ট। জননীর মানসিক ও শারীরিক শক্তি যে সন্তানে সংক্রমিত হয়, ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সীতারাম যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন উদয়নারায়ণের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু ভাগ্যবান্ পুত্রের জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পিতার অবস্থারও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে লাগিল। সামান্য একজন গৃহস্থের পুত্র সীতারাম শেষে স্বীয় বুদ্ধি ও বীরত্ববলে একজন স্বাধীন নরপতি হইয়া মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। দুইশত বৎসর পরের বাঙ্গালী আমরা, সীতারামের সেই অলৌকিক বীরত্ব আমাদের নিকট

স্বপ্নের মত মনে হইবে। আরও দুইশত বৎসর পরে না জানি আমরা কোন্ স্তরে গিয়া পৌছিব।

সীতারামের জন্মের পর উদয়নারায়ণ নবাব কর্ত্তৃক ভূষণার তহশীলদার নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন এবং কিছুদিন পরে ক্ষুদ্র একটী তালুকদারী স্বত্ব গ্রহণ করিয়া মধুমতী-তীরে হরিহরনগরে বাস করিতে থাকেন। এই মধুমতী-তীরেই মধুময় সমীরণে সীতারামের বীরত্ব-সৌরভ দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে।

সীতারামের বাল্যজীবনের প্রথম কয়েক বৎসর মাতুলালয়েই অতিবাহিত হয়। তিনি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। সে সময়ে আরবী, ফার্সী, এবং উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা না করিলে কোনও রাজকার্য্যে নিযুক্ত হওয়া যাইত না। বিশেষতঃ ফার্সী ও উর্দ্দু উত্তমরূপে না জানিলে কেহই শিক্ষিত ও পদস্থ বলিয়া গণ্য হইত না। কাজেই তৎকাল-প্রচলিত রীত্যনুসারে সীতারাম আরবী, ফার্সী এবং উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করেন। কিন্তু মানসিক শক্তি চালনা করা অপেক্ষা শারীরিক শক্তি চালনা করিতেই তিনি বেশী ভালবাসিতেন। এই ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র-বীর শিবাজীর সহিত বাংলার বীর সীতারামের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। শিবাজী যেমন লেখা-পড়ার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সঙ্গি-সমভিব্যাহারে মহারাষ্ট্রের দুর্গম শৈলমালায় অশ্বারোহণে বিচরণ করিতেন এবং বীরগণের সহিত মল্লক্রীড়ায় রত থাকিতেন, সীতারাম রায়ও সেইরূপ অশ্বারোহণ, অস্ত্রচালনা, লাঠিখেলা, কুস্তী প্রভৃতি বীরজনোচিত কর্ম্মে কালক্ষেপ করিতে ভালবাসিতেন। ভাবী-জীবনে তিনি যে একজন বীরপুরুষ হইবেন তাহা তাঁহার বাল্য-কালীন ক্রীড়াকৌতুক হইতেই সম্যক্ উপলব্ধি হইত। লাঠিখেলায়

সীতারাম এতদূর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি একাকী লাঠি ধারণ করিলে অস্ত্রধারী শত শত যোদ্ধা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না। প্রাচীন বাংলার লাঠিই ছিল প্রধান অস্ত্র, কিন্তু আমরা সভ্য বাঙ্গালী, আজ বিদেশী সভ্যতার মোহে ভুলিয়া সেই লাঠির মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে! তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল, কত খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ। হায়! কত বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গালার আব্রু-পরদা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। বদমাইস্ তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল, তুমি তখনকার পীনাল-কোড্ ছিলে,—তুমি পীনালকোডের মত শিষ্টেরও দমন করিতে এবং পীনালকোডের মত রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙ্গিতে। তবে পীনালকোডের উপর তোমার এই সরদারি ছিল যে, তোমার উপর আপীল চলিত না। হায়! তোমার সে মহিমা গিয়াছে! পীনালকোড তোমাকে তাড়াইয়া তোমার আসন গ্রহণ করিয়াছে,—সমাজ-শাসন-ভার তোমার হাত হইতে তাহার হাতে গিয়াছে। তুমি লাঠি! আর লাঠি নও, বংশখণ্ড মাত্র। ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৃগালকুক্কুরভীত বাবুবর্গের হাতের শোভা কর; কুকুর ডাকিলেই সে ননীর হাতগুলি হইতে খসিয়া পড়। তোমার সে মহিমা আর নাই! * * *

* * * * তুমি আর নাই,—গিয়াছ। ভরসা করি, তোমার অক্ষয় স্বর্গ হইয়াছে। তুমি ইন্দ্রলোকে গিয়া নন্দনকাননের পুষ্পভারাবনত পারিজাত-বৃক্ষশাখার ঠেক্‌নো হইয়া আছ, দেবকন্যারা তোমার ঘায়ে কল্প-বৃক্ষ হইতে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ ফল সকল পাড়িয়া লইতেছে। এক আধটা ফল যেন পৃথিবীতে গড়াইয়া পড়ে।"

সীতারাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন, দস্যুতস্করের অত্যাচারে বঙ্গদেশ শ্মশান হইতে চলিয়াছে। চোর-দস্যুর ভয়ে গৃহস্থগণ রাত্রিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া কালযাপন করে। দিবাভাগে পর্য্যন্ত নরহত্যা ও লুণ্ঠনের বিরাম নাই। পথঘাট অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল, লোকে সাহস করিয়া দেশান্তরে গমন অথবা তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইতে পারে না। ব্যবসায়বাণিজ্য একেবারে বন্ধ। জমিদারগণ কর্ত্তৃক নবাব-সরকারে রাজকর প্রেরণের সময় পথিমধ্যে প্রায়ই তাহা লুণ্ঠিত হয়। মগের উৎপাত তখনও দেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই, সুন্দরবন অঞ্চল তখনও মগ-দস্যুর অত্যাচারে নিপীড়িত হইত। এতদ্ব্যতীত, পাঠানেরা পুনরায় স্বাধীন হইবার জন্য স্থানে স্থানে সময় সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করিত, তাহাতে নিরীহ প্রজাবৃন্দের উপর ভীষণ অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইত। দেশের এই শোচনীয় দশা দর্শনে স্বদেশপ্রাণ বীর সীতারামের অন্তর দেশবাসীর দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল, তিনি দেশ হইতে দস্যুতার বীজ সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য কঠোর ব্রত গ্রহণ করিলেন। বাংলার নবাব সায়েস্তা খাঁ তখন ঢাকায় অবস্থান করেন, ঢাকা তখন বঙ্গের রাজধানী। সীতারাম রায় কার্য্যোপলক্ষে মাঝে মাঝে ঢাকায় যাতায়াত করিতেন, তাহাতেই নবাব সায়েস্তা খাঁ ক্রমে ক্রমে এই বীর যুবকের শক্তিমত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হন। করিম খাঁ নামক এক জন

পাঠান যশোহর অঞ্চলে বিদ্রোহী হইয়া ভীষণ অত্যাচার করিতে থাকে; বঙ্গের ফৌজদার পুনঃপুনঃ তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াও যখন তাহাকে পরাস্ত করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন তরুণ যুবক সীতারাম সায়েস্তা খাঁর নিকট করিম খাঁর বিরুদ্ধে অভিযানের অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। নবাব সানন্দে তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ তাঁহাকে করিম খাঁর দমনের জন্য পাঠাইলেন। জীবনের এই প্রথম পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সীতরাম যশঃ ও কীর্ত্তির উচ্চ শৈলশিখরে আরোহণ করিতে পারিবেন; আর যদি ডুবিয়া যান, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনের যাবতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা চিরকালের মত সলিল-সমাধি লাভ করিবে। সীতারাম সর্ব্ববিঘ্ননিবারণ নারায়ণ-নাম স্মরণ করিয়া পরীক্ষা-সাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন; বিজয়-লক্ষ্মী বীরপুত্রের জন্য জয়মাল্য হস্তে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সীতারাম করিমকে পরাস্ত করিয়া সেই মাতৃপ্রদত্ত বিজয়মাল্য কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নবাব যুবকের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে নল্দি পরগণা জায়গীর অর্পণ করিলেন। নবাবের সঙ্গে এই সর্ত্ত সাব্যস্ত হইল যে, সীতারাম ভূষণা অঞ্চলকে দস্যুতস্করের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। সীতারাম প্রতিশ্রুত হইয়া নল্দি পরগণা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ভাবী সৌভাগ্যের ইহাই ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা। এই নল্দি অঞ্চল তখন দস্যুর দৌরাত্ম্যে এক প্রকার শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, দেশের লোক দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। সীতারাম এই শ্মশানের শাসনভার গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে অচিরে নল্দির পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও বিলুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মানুষের জীবনে যখন উন্নতির যুগ আসে, তখন চারিদিক্ হইতে অনুকূল অবস্থা আসিয়া তাহার সহায় হয়। সীতারামও ভগবানের এই করুণা হইতে বঞ্চিত হন নাই। তিনি যখন ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মুনিরাম ঘোষ এবং রামরূপ ঘোষ নামক দুই জন কায়স্থ-সন্তানকে স্বীয় কর্ম্ম-সঙ্গিরূপে প্রাপ্ত হন। সীতারাম তাঁহাদিগকে লইয়া আসিয়া স্বীয় জমিদারীতে উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। মুনিরাম মন্ত্রণা দ্বারা এবং রামরূপ শারীরিক শক্তি দ্বারা সীতারামকে সাহায্য করিতেন। রামরূপ অসীম দৈহিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন; তিনি পাঁচ হাত দীর্ঘ এবং তদনুরূপ স্থূলকায় ছিলেন; এই জন্য লোকে তাঁহাকে "মেনাহাতী" বলিত। ক্ষুদ্রাকৃতি স্ত্রী-হস্তীর নাম মেনাহাতী। রামরূপকেও ঐরূপ একটী হস্তীর মত দেখাইত বলিয়া লোকে তাঁহার এই নামকরণ করিয়াছিল। এই নামেই তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। লোকে তাঁহার প্রকৃত নাম একরূপ বিস্মৃত হইয়াছিল।

সীতারাম ঢাকা হইতে জায়গীর লইয়া নৌকাযোগে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথে একস্থানে রাত্রি হওয়ায় সেই স্থানেই নদীতীরে নৌকা বাঁধিয়া রাত্রি যাপন করিতেছিলেন। গভীর নিশীথে অদূরবর্ত্তী গ্রামে ডাকাইতির শব্দ শুনিতে পাইয়া তিনি ও রামরূপ অসিহস্তে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। বক্তার খাঁ নামক জনৈক দুর্দ্দান্ত দস্যু কর্ত্তৃক গ্রাম লুণ্ঠিত হইতেছিল। সীতারাম ও রামরূপ ডাকাতদলকে আক্রমণ করিয়া বিতাড়িত করিলেন। বক্তার খাঁ সীতারামের হস্তে বন্দী হইল, কিন্তু আজীবন সীতারামের অধীনে কর্ম্ম করিবার প্রতিজ্ঞা করায় তিনি তাহাকে মুক্তি দিলেন। এই বক্তার খাঁকে অনুচররূপে পাইয়া পরবর্ত্তীকালে সীতারামের অন্যান্য দস্যুদলনে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। আমরা বেগ

নামক জনৈক দুর্দ্ধর্ষ মোগল সৈনিক সীতারামের সহিত যোগদান করেন, তিনি এত পরাক্রমশালী ছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে "হামলা বাঘ" বলিয়া ডাকিত। এতদ্ব্যতীত, আরও কয়েকজন বীর সীতারামের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার শক্তির পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। সীতারাম ইঁহাদের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক একটী ক্ষুদ্র সুশিক্ষিত সেনাদল গঠন করিলেন। এখন তাঁহার প্রধান এবং সর্ব্ব প্রথম কর্ম্ম হইল দেশ হইতে দস্যুভীতি সমূলে উৎপাটন করা; বীরবর সীতারাম তৎসাধনকল্পে কায়মন সমর্পণ করিলেন। তাঁহাকে সসৈন্য কত বিনিদ্র রজনী যে নদীবক্ষে অতিবাহিত করিতে হইয়াছে,—কতদিন যে অনাহারে থাকিতে হইয়াছে, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। দেশ হইতে দস্যুতা উৎসাদনের নিমিত্ত তিনি স্বীয় সুখশান্তি, বিলাসব্যসন সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। যেখানেই তিনি দস্যুদলের সন্ধান পাইতেন, সসৈন্য সেখানে ধাবিত হইয়া দস্যুদলকে পরাজিত ও বন্দীপূর্ব্বক বিজয়-গৌরবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। সীতারামের এই ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অত্যল্প দিনের মধ্যেই দেশের লুপ্ত শান্তি পুনরায় ফিরিয়া আসিল। দেশবাসী আবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখিতে পাইল। দেশ সীতারামের কীর্ত্তি-গাথায় মুখরিত হইয়া উঠিল,—

"ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গালা বাহাদুর।
যার বলেতে চুরি ডাকাতি হ'য়ে গেল দূর॥
বাঘে মানুষে একই ঘাটে সুখে জল খাবে।
রামী শ্যামী পোঁট্‌লা বেঁধে গঙ্গাস্নানে যাবে॥"

সীতারামের গুণমুগ্ধ প্রজাগণ একান্তভাবে তাঁহার বাধ্য হইয়া পড়িল। কাজেই জায়গীর সুব্যবস্থিত করিয়া রীতিমত রাজস্ব আদায়ের কোনও

প্রকার বিঘ্ন হইল না। এখন সীতারাম একজন প্রবল প্রতাপশালী ভূস্বামী, অর্থের তাঁহার অভাব নাই ; আরও কয়েকখানি পরগণা তাঁহার আয়ত্তে আসিয়াছে। বাংলার নবাব সায়েস্তা খাঁ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। সীতারাম এইবার রাজোপাধি লাভে অভিলাষী হইলেন, তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইল না। তিনি মুনিরামকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে গমন পূর্ব্বক বাদশাহের দরবারে স্বীয় প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে সীতারামের গুণগ্রামের কথা বাদশাহের কর্ণ-গোচর হইয়াছিল, সীতারাম সত্য সত্যই রাজোপাধি লাভের উপযুক্ত বিবেচনায় তিনি সানন্দে সীতারামকে রাজোপাধির ফারমান্ দিয়া নিম্ন-বঙ্গের দক্ষিণদিকস্থ পতিত অরণ্যাবৃত স্থানসমূহের আবাদ এবং তথায় প্রজা-পত্তনের অধিকার দান করিলেন। সীতারাম বাদশাহী ফারমান্ ও সনন্দ লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বিরাট সমারোহে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী রাজোপাধি ধারণ করিলেন। হরিহরনগর উৎসবানন্দের কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রজাবৃন্দ সোৎসাহে ও সানন্দে এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া তাহাদের ভূস্বামীকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিল। সেই দিন হইতে সীতরাম রায় "রাজা সীতারাম রায়" হইলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র।

সীতারাম রাজা হইয়া দেখিলেন, রাজার উপযুক্ত রাজ্য বা রাজধানী তাঁহার কিছুই নাই। রাজ্য ও রাজধানী বিহীন রাজোপাধি কলঙ্ক মাত্র। এই বিবেচনায় তিনি রাজধানী স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন। **মহম্মদপুর** নামক স্থান রাজধানীর পক্ষে উপযুক্ত মনে করিয়া তিনি ঐ স্থানকে পরিখা, দুর্গ, তোরণ, উদ্যানবাটিকা, পুষ্করিণী, মন্দির, রাজপথ ও হর্ম্ম্য-সুশোভিত করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন। আজও মহম্মদপুর

বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু সেই মহম্মদপুর আর নাই, কালের ধ্বংসলীলা রুদ্র-নৃত্যে তাহাকে মহাশ্মশানে পরিণত করিয়াছে। সীতারামের রাজভবনের ধ্বংসাবশেষ আজও বর্ত্তমান। মহম্মদপুর এখন জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িতেছে। এই মহম্মদপুর আরও একটী কারণে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে,—যে ম্যালেরিয়ায় আজ সোণার বাংলা শ্মশান হইতে বসিয়াছে, মহম্মদপুরই সেই রাক্ষসী ম্যালেরিয়ার প্রথম জন্মস্থান।

এইবার রাজা নামের সার্থকতা সাধন করিতে রাজ্যবৃদ্ধি আবশ্যক, কিন্তু রাজ্য বৃদ্ধি করিতে হইলে দেশের পূর্ব্ব জমিদার এবং মোগল বাদশাহের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য্য, সুতরাং সেই সংঘর্ষে বিজয়ী হইবার মত উপযুক্ত শক্তিসঞ্চয় সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এই জন্য সীতারাম ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সুদক্ষ শিল্পীদিগকে আনাইয়া স্বীয় রাজধানী মহম্মদ পুরে বাস করান। এই সমুদয় শিল্পীর নির্ম্মিত বন্দুক কামান প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের অদ্ভুত সংহারিকা শক্তি দর্শনে মোগলেরা পর্য্যন্ত ভীত ও বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সীতারাম দস্যুদলনে সিদ্ধহস্ত। যখন বঙ্গের বহুস্থান দস্যুদিগের অত্যাচারে উৎসন্ন যাইতেছিল, সেই সময় সীতারাম বাহুবলে স্বীয় জমিদারী এবং তন্নিকটবর্ত্তী বহুস্থানে দস্যুদমন করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, কাজেই দস্যুনিপীড়িত দেশসমূহ হইতে বহু গৃহস্থ-পরিবার সুখশান্তি লাভের আশায় আসিয়া সীতারামের জমিদারীতে বাস করিতে লাগিল। এইরূপে সীতারামের জমিদারী অল্পদিনের মধ্যেই সুখসমৃদ্ধি ও প্রজাপুঞ্জে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি মোগল সম্রাটের নিকট হইতে যে আবাদী সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বলে সুন্দরবন অঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করিতে যাইয়া তাঁহাকে

অনেক যুদ্ধবিগ্রহে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল; কিন্তু কোনও বাধাবিঘ্নই সীতারামকে পশ্চাৎপদ করিতে পারে নাই, তিনি স্বীয় প্রতিভা ও বীর্য্যমত্তার তীক্ষ্ণধার কুঠারে সমস্ত বাধা ছেদন পূর্ব্বক বিজয়লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপে পরগণার পর পরগণা সীতারামের করায়ত্ত হইতে লাগিল। মোগল সম্রাট্ ইহাতে কোনও প্রকার বাধা দিলেন না। কারণ সীতারাম রাজস্ব প্রেরণে কোনও দিন অবহেলা করেন নাই, বিশেষতঃ সীতারামের হস্তে বহু পাঠান নির্য্যাতিত ও দমিত হইতেছিল, ইহাতে সম্রাটের বরং লাভই হইয়াছিল। চুয়াল্লিশটী পরগণা লইয়া সীতারামের রাজ্য গঠিত হইয়াছিল এবং প্রায় এক কোটী টাকা রাজস্ব আদায় হইত।

যে রাজা প্রজার মঙ্গলবিধানে ও রাজ্যের উন্নতিসাধনে তৎপর না হইয়া কেবল রাজ্যবৃদ্ধি, কোষাগারপূর্ণ এবং বিলাসব্যসনই একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করে, সে রাজা নামের কলঙ্ক মাত্র। সীতারাম রায় সামান্য রাজা হইলেও রাজার কর্ত্তব্য তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন, প্রজার হিতসাধন তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। আর কিছু না হউক, অন্ততঃ জলদান-কীর্ত্তি সীতারামকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। অদ্যাপি যশোহর-খুলনা অঞ্চলে সীতারাম কর্ত্তৃক খনিত বহু বিশাল দীর্ঘিকা বিরাজিত থাকিয়া তাঁহার জলদানরূপ পুণ্যব্রতের সাক্ষ্য দিতেছে। সীতারামের সঙ্গে সর্ব্বদা ২২০০ শত কোদালী থাকিত বলিয়া কথিত আছে। এই কোদালিদল আবশ্যক মত যুদ্ধ করিত এবং সীতারাম যে পথ দিয়া গমন করিতেন সেই পথে জলাশয় খনন করিতে করিতে অগ্রসর হইত। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, সীতারাম প্রত্যহ নূতন পুষ্করিণীর জলে স্নান করিতেন। সীতারামের এইরূপ জলাশয় প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তির

ফলে তাঁহার রাজ্যের প্রজাবৃন্দ কখনও জলকষ্ট অনুভব করে নাই। জলকষ্ট যে কি ভীষণ তাহা বঙ্গের অধিবাসিগণ আজকাল গ্রীষ্মকালে বিশেষভাবে অনুভব করিতেছে। যদি এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে সীতারামের মত একজন জলদানকারী মহাত্মা এ যুগে জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে বঙ্গপল্লীর অধিবাসিগণ প্রাণ ভরিয়া সুপেয় জলপানপূর্ব্বক তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিত। কিন্তু হায়, এ আশা যে শুধু কল্পনা মাত্র!

প্রজাগণের অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য রাজা সীতারাম যত্নের ক্রুটী করেন নাই। আবাদী সনন্দের বলে তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে এত অধিক আবাদী ভূমি আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন যে, সেই সকল ভূমি হইতে উৎপন্ন ফসলে রাজ্যের প্রজাবৃন্দ উদর পূরিয়া আহার করিয়া বিক্রয়, দান, বিতরণ প্রভৃতি সৎকার্য্যদ্বারা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিত। এই সময়ে বাংলার নবাব ছিলেন শায়েস্তা খাঁ; তাঁহার সময় টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হইয়াছিল। ইহা এখন প্রবাদ-বচনের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বঙ্গের এই অন্নকষ্টের দিনে আমরা সেই বিগত যুগের সুখ-সৌভাগ্যের কল্পনাও করিতে পারি না।

শিক্ষাবিস্তার এবং জ্ঞানালোচনায়ও সীতারাম কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। জ্ঞানালোচনায় রাজধানী মহম্মদপুর বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। বহু টোল এবং চতুষ্পাঠী দ্বারা মহম্মদপুর পরিশোভিত হইয়াছিল। বিবিধ বিষয়ে পারদর্শী শাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ সেই সমুদয় শিক্ষানিকেতনে নানা বিষয়ের পাঠন-পাঠন করিতেন। সীতারাম অধ্যাপক এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বহু ভূমি দান করিয়াছিলেন, আজও তাঁহাদের অনেকের বংশধরগণ তাহা ভোগ করিতেছেন; এমন কি, অনেকে সেই সমস্ত বৃত্তির বলে আজকাল

জমিদার নামে অভিহিত ও সম্মানিত হইতেছেন। কেবল হিন্দুদিগের শিক্ষাবিস্তারই যে সীতারামের উদ্দেশ্য ছিল তাহা নহে, তিনি তাঁহার মুসলমান প্রজাগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া মৌলবী ও মুন্সীদিগকে ভূ-বৃত্তি দান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রবণতা বাল্যকাল হইতেই সীতারামের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা পরিপুষ্টি লাভ করিতেছিল। রাজ্য এবং প্রতিপত্তি লাভ করিলে অনেকে যেমন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জলাঞ্জলি দিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, সীতারাম সেরূপ ছিলেন না। তাঁহার নৈতিক চরিত্রসম্বন্ধে অনেক প্রকার অপবাদ শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অতিরঞ্জিত, ভিত্তিহীন এবং শত্রু-কপোলকল্পিত। যদিও তাঁহার চরিত্রে কোনও কলঙ্ক স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা চন্দ্রে কলঙ্ক-রেখার ন্যায় ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। সীতারাম স্বীয় রাজ্যের নানাস্থানে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ এবং ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর দান করিয়া দেব-সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত বহু দেবালয়ে এখনও প্রাতঃ-সন্ধ্যায় আরতিধ্বনি তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ঘোষণা করিতেছে;—সীতারামের স্থাপিত শত শত বিগ্রহ এখনো ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়া সেই অতীতকালের সাক্ষিস্বরূপ বিরাজ করিতেছে।

শিল্পবাণিজ্য সীতারাম কর্ত্তৃক বিশেষরূপে উৎসাহ পাইয়া যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সেই উৎসাহ-দানের ফলেই রাজধানী মহম্মদপুর একটী সমৃদ্ধিপূর্ণ ধনজনশালী নগরে পরিণত হইয়াছিল।

সীতারামের রাজ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে, তিনি রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, অস্ত্রশস্ত্র এবং দুর্গ ও সৈন্যাদিরও অভাব নাই, প্রজাবৃন্দ তাঁহার অনুগত, প্রভাব-প্রতিপত্তিও

তিনি যথেষ্ট লাভ করিয়াছেন। প্রবল প্রতাপশালী আওরঙ্গজেব তখন আর ইহলোকে নাই। তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রাতৃবিরোধের ফলে মোগলরাজ্য বালির বাঁধের মত শিথিল হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। বঙ্গের শাসনকর্ত্তারাও ঘোর অত্যাচারী হইয়া প্রজাবর্গের প্রীতি ও শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছিলেন। স্বাধীনতা-প্রয়াসী সীতারাম এই সমুদয় অনুকূল অবস্থা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। স্বাধীন হিন্দুরাজের ন্যায় রাজশক্তি পরিচালনার জন্য সীতারামের বীর-হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। সৌভাগ্যবশতঃ বঙ্গের তৎসাময়িক রাজনীতিক অবস্থা তাঁহার অভীষ্টসাধনের অনুকূল হইয়া পড়িল। আজিম উশ্বান তখন বঙ্গেশ্বররূপে ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন। প্রজাপীড়ক অত্যাচারী আবুতোরাব ভূষণার ফৌজদার, তিনি কর আদায় করিতেন কিন্তু সীতারাম এই অত্যাচারী ফৌজদারকে বিন্দুমাত্রও গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি ফৌজদারকে কর-প্রদান বন্ধ করিলেন। ফৌজদার সীতারামকে ভয় প্রদর্শন করিতে ক্রটী করিলেন না, কিন্তু সীতারাম তাহাতে বিচলিত হইলেন না। অবশেষে ফৌজদারের প্রেরিত অনুচর মহম্মদপুরে আসিয়া সীতারামের প্রকাশ্য রাজসভায় বাকী রাজস্বের জন্য তাঁহাকে অপমানিত করিল। আত্মসম্মানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বীর সীতারামের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, মোগলকে আর রাজস্ব প্রদান করিবেন না।

বঙ্গের একজন সামান্য হিন্দু জমিদারের এই স্পর্দ্ধা ফৌজদার সাহেবের সহ্য হইল না; তিনি সীতারামকে যথোচিত শিক্ষাদানের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। বঙ্গেশ্বর আজিম উশ্বান তখন পুত্র ফরখ্-শায়ারের উপর বঙ্গের শাসন-ভার অর্পণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনলাভের

আশায় তথায় গমন করিয়া ভ্রাতৃবিরোধে যোগদান করিয়াছিলেন। ফরখ্ শায়ার পাটনায় অবস্থান করিয়া দিল্লী হইতে পিতার বিজয়-বার্ত্তা প্রাপ্তির চিন্তায় কালক্ষয় করিতে লাগিলেন ; সুতরাং ফৌজদার আবুতোরাবকে একাকীই সীতারামের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার যে সেনাবল আছে, তদ্দ্বারা তিনি অনায়াসে বাংলার এই সামান্য জমিদারকে শিক্ষাদান করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সুকৌশলী সীতারাম স্বীয় রাজ্য রক্ষার জন্য যে শক্তিসঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা ফৌজদারের কল্পনার অতীত ছিল। সীতারামের রাজ্য নদনদী, বন, খাল, বিল ইত্যাদিতে সমাচ্ছন্ন, বিশেষতঃ রাজধানী মহম্মদপুর এমন স্থানে সংস্থাপিত যে, সহসা কোনও বহিঃশত্রু আক্রমণ করিয়া তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হইত না। ফৌজদার সৈন্যসামন্ত লইয়া সীতারামের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত দর্প, সমস্ত আশা-ভরসা চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। একবার নয়, দুইবার নয়, পুনঃ পুনঃ এইভাবে ফৌজদার সীতারামের নিকট পরাজিত হইতে লাগিলেন। পরাজিত হইয়াও কিন্তু আবুতোরাব স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। অবশেষে স্বীয় সেনাপতি পীর খাঁর উপর সীতারামকে সমুচিত শিক্ষাদানের ভার অর্পণ করিলেন। মধুমতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া যাহাতে মুসলমান সৈন্য অগ্রসর হইতে না পারে এইজন্য সীতারাম পারঘাটায় এবং মধুমতীর বনময় তীরভাগে কামানশ্রেণী ও শিবির সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন সহসা মধুমতী-তীর সৈন্য-কোলাহলে ও কামান-গর্জ্জনে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। শোণিত-স্রোতে নদীকূল প্লাবিত এবং মধুমতী-নীর রঞ্জিত হইয়া গেল। সীতারামের বীর সেনাপতি মুনিরামের নেতৃত্বে এই যুদ্ধ পরিচালিত হইতেছিল, অপর

পক্ষের নেতা ছিলেন স্বয়ং আবুতোরাব খাঁ। এই যুদ্ধে আবুতোরাব পরাজিত ও নিহত হইলেন। মুসলমান সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ায় সীতারাম অতি সহজেই ভূষণা-দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। অতঃপর মহম্মদপুরের রক্ষার ভার মুনিরামের উপর অর্পিত হইল, সীতারাম স্বয়ং নববিজিত ভূষণা-দুর্গের ভার গ্রহণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে সীতারামের পরাক্রম আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার এই বিজয়লাভের পরিণাম অতি ভীষণ হইবে, এইবার হয়ত মোগল সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ইহা বুঝিতে পারিয়াই দূরদর্শী সমর-নীতি-বিশারদ সীতারাম বিপুল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি-পূর্ব্বক তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন।

মোগল-ফৌজদারের নিধন-সংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌছিল। মুর্শিদাবাদ তখন বাংলার রাজধানী, আর মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার নবাবী-গদিতে সমাসীন। তোরাব খাঁর এবম্বিধ শোচনীয় পরিণামে তিনি সীতারামের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহার কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদানের নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন। হাসান আলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া সৈন্যসহ তথায় প্রেরিত হইল। ভূষণার মোগলানুগৃহীত যাবতীয় জমিদারের উপর মুর্শিদকুলি খাঁ পরোয়ানা জারি করিলেন যে, সকলেই যেন সীতারামের বিরুদ্ধে ফৌজদারকে সাহায্য করে, কোনও জমিদার সীতারামকে কোনও প্রকারে সাহায্য করিতে পারিবে না। যদি কেহ সাহায্য করে, অথবা কাহারও জমিদারীর মধ্য দিয়া সীতারামের সৈন্য পলায়ন করে, তবে সেই জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া জমিদারকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে। প্রজাপীড়ক মুর্শিদ-

কুলি খাঁর ভয়ে জমিদারবর্গ সন্ত্রাসিত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে যাহারা সীতারামকে সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, আজ তাহারা উৎপীড়নের ভয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে কুণ্ঠিত হইল না। কেহ বা বিশ্বাস-ঘাতকতারও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া মুর্শিদকুলি খাঁর প্রিয়পাত্র হইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। সীতারাম যাহাদের বলে বলীয়ান হইয়া মোগলের বিরুদ্ধাচরণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আজ তাহারা একে একে দূরে সরিয়া পড়িতেছে দেখিয়া তিনি হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন। কিন্তু তথাপি তিনি সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। শৃগাল-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মোগলের অনুগ্রহ-ভিখারী হওয়া অপেক্ষা স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া গৌরবের কথা এবং তাহাই বীর-বাঞ্ছিত। সীতারাম যদি শৃগাল-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মোগলের পদানত হইতেন, তবে আজও বৃটিশরাজের যুগে তাঁহার বংশধর মহম্মদপুর রাজপ্রাসাদে অবস্থান করতঃ রাজা বা মহারাজের উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়া অতুল সম্ভ্রম লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু সীতারাম সেই হীন যশোলাভের জন্য লালায়িত ছিলেন না; তাঁহার লক্ষ্য ছিল আরও উচ্চ,—বঙ্গের—বাঙ্গালীর স্বাধীনতা ছিল তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। তারপর যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, প্রচণ্ড মোগল শক্তির সহিত সংঘর্ষে তিনি সম্পূর্ণরূপেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবেন, দেশবাসী তাঁহার সাহায্য করিবে না, তখনও তিনি নিজের অথবা ভাবী বংশধরের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করিলেন না, স্বীয় বীরত্বের মর্য্যাদা, আত্মগৌরব এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য যত্নবান্ হইয়া সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তে ঝম্প প্রদান করিলেন।

হাসান আলি খাঁ, সংগ্রাম সিংহ এবং দয়ারাম নামক তুইজন সহ-

রাজা সীতারাম রায়ের দোলমঞ্চ

—৯৭ পৃষ্ঠা
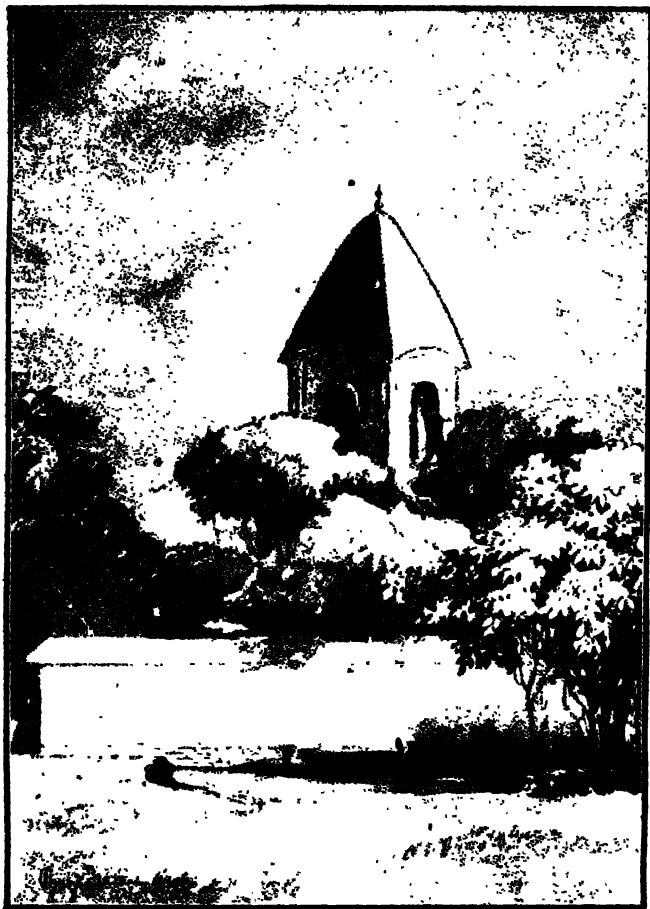
কারীকে লইয়া সীতারামের রাজ্য আক্রমণে যাত্রা করিলেন। সৈন্যদল দুইভাগে বিভক্ত হইল। একদল হাসানের এবং সংগ্রামের নেতৃত্বে পদ্মা দিয়া ভূষণা দখলের জন্য যাত্রা করিল। অপর দল দয়ারামের নেতৃত্বে রাজধানী মহম্মদপুর আক্রমণে অগ্রসর হইল। এই দয়ারাম রায় রাজসাহীর অন্তর্গত দিঘাপাতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সীতারাম হাসান আলি-খাঁর অভিযান-সংবাদ শ্রবণ করিয়া সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন। ভূষণার অনতিদূরে একটী যুদ্ধ হইল, যুদ্ধে সীতারাম রায় জয়লাভ করিলেন। আলি খাঁ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ভূষণার চারিদিকে সৈন্য সমাবেশ করতঃ অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে দয়ারাম মহম্মদপুর আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইলেন। রাজধানী রক্ষার ভার সেনাপতি রামরূপের (মেনাহাতী) উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি বীর, ধার্ম্মিক, প্রজানুরক্ত, অকুতভীর, সংসারে তাঁহার কোনও আসক্তি ছিল না, সুতরাং দেশের জন্য জীবনাহুতি দিতে তিনি পরাঙ্মুখ নহেন। রামরূপের বীরত্বখ্যাতি দয়ারামের নিকট সুপরিচিত। ন্যায়-যুদ্ধে হয় ত দয়ারাম জয়লাভে সমর্থ হইবেন না, এই ভাবিয়া তিনি ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করিলেন। রাম-রূপের হত্যার জন্য গুপ্ত ঘাতক নিযুক্ত হইল। একদিন রামরূপ তাঁহার চিরাচরিত প্রথামত অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনার জন্য দোলমঞ্চের পার্শ্ব দিয়া অদূরবর্ত্তী সরোবরে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় পাপিষ্ঠ গুপ্তঘাতকের দল সহসা দোলমঞ্চের চন্দ্রাতপের বন্ধনরজ্জু কাটিয়া দিয়া তদ্দ্বারা রামরূপকে চাপিয়া ধরে। সিংহ জালবদ্ধ হইলে যেমন তাহার পরাক্রম নিষ্ফল হয়, বীর রামরূপ এইভাবে সহসা চন্দ্রাতপ দ্বারা চাপা পড়ায় কোনই পরাক্রম প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। নৃশংস ঘাতকের দল তখন তাঁহাকে পুনঃপুনঃ শূলাঘাতে জর্জ্জরিত

করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইল না। রামরূপ আর মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া ঘাতকদিগকে তাঁহার সহজ হত্যার গুপ্তকথা বলিয়া দিলেন। তাঁহার দক্ষিণ বাহুতে মৃত্যুঞ্জয় কবচ ছিল, সেই কবচ দেহে সংলগ্ন থাকিতে কিছুতেই তাঁহার মৃত্যু হইবে না। ঘাতকগণ রামরূপের মৃত্যু-সন্ধান জানিতে পারিয়া তাঁহার দেহ হইতে কবচ খুলিয়া ফেলিল। তখন আর রামরূপের প্রাণবায়ু বহির্গত হইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু বীরের প্রাণ বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই নির্ম্মম ঘাতকের দল তাঁহার মস্তক কর্ত্তন করিয়া লইয়া চলিয়া গেল! দয়ারাম স্বীয় কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ সেই ছিন্নমুণ্ড নবাব-দরবারে প্রেরণ করিলেন। নবাব মেনাহাতীর সেই প্রকাণ্ড কর্ত্তিত মস্তক দর্শনে ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। অমন বীরকে ঐ ভাবে নিষ্ঠুররূপে হত্যার নিমিত্ত তিনি দয়ারামকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া সসম্মানে ছিন্নমুণ্ড মহম্মদপুরে প্রেরণ করিলেন। হায়, অর্থ, উপাধি ও রাজ্যলিপ্সায় ভাই ভাই-এর সম্মান রাখিতে পারে নাই, বাঙ্গালী বাঙ্গালীর বীরত্বের পূজা করিতে সমর্থ হয় নাই,—কিন্তু বিদেশী বিজাতীয় নবাব বীরত্বের মর্য্যাদা বিস্মৃত হন নাই! দয়ারামের দৃষ্টান্ত বাংলায় বিরল নহে, এইরূপ অনেক দয়ারাম বাংলাদেশ কলুষিত ও কলঙ্কিত করিয়াছে, করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবে। ইহা বাংলার প্রতি বিধাতার অভিসম্পাত; তাহা না হইলে বাংলার ভাগ্য আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন কেন?

কালীগঙ্গার উপকূলে বীরবর মেনাহাতীর মস্তকহীন দেহ সৎকার করিয়া দেহাবশেষ সমাহিত করা হইল। ইহার কয়েক দিন পরেই তাঁহার ছিন্নমুণ্ড নবাব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মহম্মদপুরে আসিয়া

নবাব-সম্মুখে মেনাহাতীর কর্ত্তিত মস্তক
—১০০ পৃষ্ঠা

পৌঁছিলে সেই ছিন্ন মস্তকও ঐ সমাধিস্থলে প্রোথিত করিয়া তাহার উপর ইষ্টক নির্ম্মিত এক স্মৃতিস্তম্ভ রচিত হইল। ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বেও এই সমাধি-চিহ্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পথিকগণের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিত,—বীরবরের এবম্বিধ শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করিয়া তাহারা অশ্রুবিসর্জ্জন করিত। কালের ঝঞ্ঝাবাত সহিয়া সহিয়া সে স্মৃতি-স্তম্ভ আজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পৃথিবীর ধূলিকণার সহিত মিশিয়া গিয়াছে,—কোনও চিহ্নই সে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকাল-বোর্ডের রাস্তা তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নির্জ্জীব অলস বীরত্ব-বিমুখ জাতি আমরা, কি করিয়া স্বদেশীয় বীরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না; সেই জন্য এই বীরের স্মৃতিরক্ষার কোনই আয়োজন হইতেছে না। অথচ এই বাংলা দেশেই বিদেশীয়ের স্মৃতি-ভাণ্ডারে সহস্র সহস্র টাকা চাঁদা দিবার লোকের অভাব দেখা যায় না! মেনাহাতী শুধু বীর ছিলেন না, তিনি রাজনীতি-বিশারদ, আজীবন অকৃতদার, আদর্শ চরিত্র, ধার্ম্মিক ও দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। পৃথিবীর অতি অল্প সংখ্যক দেশের ভাগ্যেই এরূপ লোক জন্মগ্রহণ করে। বীরবর মেনাহাতীর দুর্ভাগ্য যে তিনি এই ইতিহাস-বিমুখ আত্মবিস্মৃত হতভাগ্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভূষণা-দুর্গে যখন বীরবর রামরূপের এই শোচনীয় হত্যার সংবাদ পৌঁছিল, তখন দুর্গে যেন একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। মেনাহাতী ছিলেন সীতারামের দক্ষিণ হস্ত,—সহায়-সম্বল, আশা-ভরসা। এই বিশ্বাসী বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদে সীতারামের শিরে যেন সহস্র অশনি-সম্পাত হইল,—তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে সমস্ত আলোক নিভিয়া গেল, বিশ্ব-সংসার তিনি অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। শত্রুর কবল হইতে একই

সময়ে ভূষণা এবং মহম্মদপুর রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইল, তিনি মনে মনে যে বিশাল সৌধ রচনা করিতেছিলেন, এক নিমেষে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভূষণা রক্ষার আশা তিনি এক প্রকার বিসর্জ্জন দিয়া মহম্মদপুর রক্ষার জন্যই অধিকতর যত্নবান্ হইলেন। ভূষণা-দুর্গ হইতে অধিকাংশ সৈন্যই রাত্রিযোগে অতি গোপনে মহম্মদপুরে প্রেরিত হইল এবং অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ দুর্গ রক্ষার ভার জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর উপর অর্পণ করিয়া সীতারাম স্বয়ং ছদ্মবেশে নিশীথ সময়ে যাইয়া মহম্মদ-পুরে উপনীত হইলেন।

সীতারাম মহম্মদপুরে আসিয়াই দেখিতে পাইলেন, শত্রু-সৈন্যের বিজয়োল্লাসে চারিদিক্ কম্পিত হইতেছে; প্রজাগণ ধনজন লইয়া পলাইয়া গিয়াছে, মুসলমানেরা সেই পরিত্যক্ত বাসভবনে অগ্নি প্রদান করিয়া নিষ্ঠুর আনন্দে নৃত্য করিতেছে। যদিও রামরূপের সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষ বিশেষ দক্ষতার সহিত দুর্গরক্ষা করিতেছিলেন, তথাপি সীতারাম বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, এই বার তাঁহার আশা-ভরসা বিলুপ্ত ও জীবনের শেষ যবনিকা নিপতিত হইবে। যে সৈন্য তাঁহার সম্বল তাহা লইয়া বিপুল শত্রু-সৈন্যের গতিরোধ সম্ভব হইবে না; বিশেষতঃ দেশের যে জমিদারবর্গের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন,—যাহারা তাঁহাকে আশা-ভরসা যথেষ্টই দিয়াছিল, তাহারা আজ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শত্রু-সৈন্যের সহিত যোগ দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে। সীতারামের আর একটী প্রধান অভাব ছিল,—জলযুদ্ধের তেমন কোনও উপযুক্ত উপকরণ তিনি সংগ্রহ করার অবসর পান নাই।

দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বীরবর সীতারামের হৃদয় শতধা

চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। এখন তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন? আত্ম-সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং জীবন রক্ষা করিতে হইলে মোগলের পদে মস্তক অবনত করিতে হয়, আর আত্ম-সম্মান রক্ষা করিতে হইলে ধনপ্রাণ, রাজ্যাকাঙ্ক্ষা সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে হয়। এতকাল স্বাধীনতার উপাসনা করিয়া শেষে কি তিনি মোগলের চরণে আত্মবিক্রয় করিবেন? কখনই না। রামরূপের অশরীরী আত্মা যেন অন্তরীক্ষে থাকিয়া বজ্রকঠোর স্বরে বলিতেছিল,—"কখনই না, ধনপ্রাণ, রাজ্যসম্পদ্ যায় যাউক, তথাপি আদর্শচ্যুত হইও না, স্বাধীনতার সাধনা বিস্মৃত হইও না!" সীতারাম যখন বুঝিলেন, এবার আর মোগলের কবল হইতে মহম্মদপুর রক্ষা করা যাইবে না, তখন তিনি দুর্গাভ্যন্তরবাসী আত্মীয়স্বজন বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোক-দিগকে গোপনে নৌকাযোগে অন্যত্র প্রেরণ করিলেন।

হাসান আলি খাঁ এবং দয়ারামের সৈন্যদল মধুমতী নদী দিয়া নগর আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য মধুমতী নদীতীরে কামনশ্রেণী সজ্জিত কবিয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু শত্রুপক্ষের রণতরী হইতে অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণের ফলে ঐ কামানশ্রেণী বিশেষ কিছু কার্য্য করিতে সমর্থ হইল না। শত্রুগণ সীতারামের কামানসমূহ অধিকার করিয়া লইল। রামসাগরের তীরভূমি হইতে দুর্গ-তোরণ পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ভূভাগ রণক্ষেত্রে পরিণত হইল। কয়েক দিন ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ চলিল। সীতারামের সৈন্য ও সেনাপতিগণ একে একে সমর-শয্যায় শায়িত হইলেন। সীতারাম স্বয়ং দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, যখন দেখিলেন; সমস্ত নিঃশেষিতপ্রায়, আর জয়লাভের আশা নাই, তখন দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে রণক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হইলেন এবং অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বীরবর যুদ্ধে আহত হইয়া অবসন্ন শরীরে দয়ারাম কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। এই স্থলে সীতারামের সকল শৌর্য্যবীর্য্য ও আশা, আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হইল। সীতারাম দয়ারাম কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হইলেন, পথে নাটোরের কারাগারে তাঁহাকে কিছুদিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদে যাইয়া তাঁহাকে বেশী দিন কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই, অল্পকাল পরেই বীরবর বীরের বাঞ্ছিত অমরধামে প্রস্থান করিলেন। মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে তাঁহার দেহ সৎকার করা হইল। সীতারাম গিয়াছেন, চিতাবহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার শ্মশানের চিহ্নমাত্র নাই, তাঁহাব বংশ-ধরেরা ধরা-বক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার কীর্ত্তিবাশিও অধিকাংশ কালের কুক্ষিগত হইয়াছে, কিন্তু সীতারামের বীরত্বকাহিনী ও স্বাধীনতার প্রচেষ্টা চিরদিন ঘোষিত হইয়া তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

হায় দুর্ব্বল, রুগ্ন, আলস্য-নিদ্রাভিভূত বাঙ্গালী! একবার প্রতাপের কীর্ত্তি, সীতারামের কীর্ত্তি,—তোমার স্বদেশীয়ের সংগ্রাম-কুশলতা,—তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের বীর্য্যমত্তা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে দুই ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা কর,—আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সেই অতীত গৌরব-গরিমায় আবার ভূষিত করিতে চেষ্টা কর।

রাজা গোপাল সিংহ

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের হিন্দুরাজগণ বীরত্বখ্যাতিতে এবং রাজ্য-পরিচালন-দক্ষতায় বহুদিন হইতেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে এই রাজবংশের পরাক্রম প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। রঘুনাথ এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একটী নূতন অব্দ প্রচলিত করিয়াছিলেন। বহু পরাক্রমশালী নরপতি এই বংশ অলঙ্কৃত করিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়ী হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরের নানাস্থানে এখনও তাঁহাদের কীর্ত্তির নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই বংশের রাজা গোপাল সিংহের সময়ে ভারতে মোগল-প্রতাপ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা তখন পূর্ণ বিক্রমে ভারতের সর্ব্বত্র একটা বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই প্রচণ্ড বাত্যায় মোগলের সিংহাসন পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল, দিল্লীশ্বর তাহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহারা বাদশাহের নিকট হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে "চৌথ" অর্থাৎ রাজকরের এক চতুর্থাংশ আদায়ের 'ফরম্যাণ' পাইয়াছিল। মহারাষ্ট্র অশ্বারোহীরা সেই বাদশাহী ফরমাণের বলে পঙ্গপালের মত সর্ব্বত্র গমন করিয়া তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের জন্য অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। বঙ্গদেশও সেই অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। বাংলার ইতিহাসে ইহাই **'বর্গীর হাঙ্গামা'** নামে স্থান পাইয়াছে। তখন এদেশে বর্গী-ভীতি এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রসূতিরা তাঁহাদের দুরন্ত শিশুগুলিকে—

'খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে।
বুল্‌বুলীতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবো কিসে?'

—এই ঘুমপাড়ানি গান গাহিয়া ভীতি আকর্ষণ পূর্ব্বক ঘুমপাড়াইবার চেষ্টা করিতেন। রঘুজি ভোঁসলার সেনাপতি প্রবল পরামক্রমশালী ভাস্কর-পণ্ডিতের রণভেরী-নিনাদে বাংলাব শস্যশ্যামল-বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। কত সুন্দর গ্রাম শ্মশানে পরিণত হইল,—কত প্রাসাদ তাহাদেব বর্শা ও তরবারির আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধরার ধূলির সঙ্গে মিশিয়া গেল।
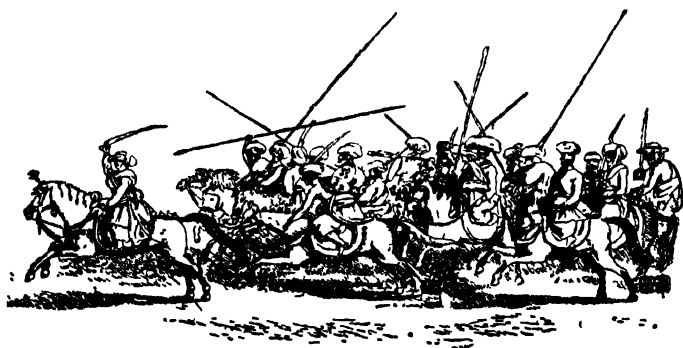
বর্গী (প্রাচীন চিত্র হইতে)

বিহার-অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়া ভাস্কর বিষ্ণুপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার ভৈরব-ভেরী-নিনাদে বিষ্ণুপুরের শালবন কম্পিত হইয়া উঠিল। গোপাল সিংহ তখন বিষ্ণুপুরের রাজা, তিনি বর্গীর ভয়ে ভীত হইলেন না, সৈন্য ও কামানশ্রেণীর দ্বারা বিষ্ণুপুর-দুর্গ সুরক্ষিত করিয়া সসৈন্য

মারাঠা-বাহিনীর গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। দুর্গ হইতে মারাঠা সৈন্যের উপর মুহুর্মুহুঃ গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। কথিত আছে যে, ঐ রাজবংশের কুলদেবতা মদনমোহন ঠাকুরের কৃপায় কামান হইতে স্বতঃই গোলা বর্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে অন্য কোনও লোকের প্রয়োজন হয় নাই।* প্রথমে মারাঠারা যে ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল—তাহাতে বাঙ্গালী সৈন্য পরাজিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু রাজা গোপাল-সিংহের অসীম বীরত্বে শেষে মারাঠা সেনাপতি নিহত হইলেন, মারাঠা-সৈন্য বিতাড়িত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। বাঙ্গালী সৈন্যেরা মহারাষ্ট্রীয়গণের রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি লুণ্ঠন করিয়া বিষ্ণুপুর-দুর্গে ফিরিয়া আসিল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালীদিগকে দুর্গে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া পুনরায় আসিয়া আক্রমণ করিল। দুর্গ হইতে বর্গীদিগের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল, তাহারা গোলাবৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। যে মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রতাপে মোগল-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল; বাংলার নবাব আলিবর্দ্দী-খাঁকে যাহাদের অত্যাচার দমনে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল, সেই দুর্দ্দান্ত বর্গীদিগকে পুনঃ পুনঃ সম্মুখ সমরে পরাস্ত করা কম বীরত্ব ও শ্লাঘার বিষয় নহে। রাজা গোপাল সিংহ মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন, পলাশীর যুদ্ধে বাংলা ইংরাজদিগের হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের সৌভাগ্য-সূর্য্যও অস্তমিত হইয়াছে। তাঁহাদের সেই বিস্তৃত জমিদারী আজ সামান্য মাত্র তালুকদারীতে পর্য্যবসিত।

* কলিকাতা বাগবাজারের বিখ্যাত মদনমোহন ঠাকুরই সেই বিষ্ণুপুরের মদনমোহন, বিষ্ণুপুর হইতে আনীত হইয়া বাগবাজারে স্থাপিত হইয়াছেন।

পঞ্চসহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন

বাংলার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ উড়িষ্যা জয় করিবার পর তাঁহার সৈন্যদিগকে লইয়া বিজয়গৌরবে রাজধানী মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিজয়োন্মত্ত পঞ্চসহস্র বঙ্গীয় সৈনিকের উল্লাস-ধ্বনিতে তাহাদের গমন-পথের চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বেই নবাব-বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করা হইয়াছে, আলিবর্দ্দী মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইহারা সকলেই রণক্লান্ত, সুতরাং মৃগয়া ও আমোদ-আহ্লাদে সমরশ্রান্তি অপনোদনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে চলিতেছিল। তাহারা যখন মেদিনীপুরের দক্ষিণপ্রান্তে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক শ্রমাপনোদন করিতেছিল, তখন দূত আসিয়া সংবাদ দিল, নাগপুরের মহারাষ্ট্র-নায়ক রঘুজি ভোঁসলার রণদুর্ম্মদ সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত চল্লিশ সহস্র সুসজ্জিত অশ্বারোহী মারহাট্টা সৈন্য লইয়া বঙ্গভূমি লুণ্ঠনের জন্য পঞ্চকোটের পার্ব্বত্যপথ দিয়া সবেগে বর্দ্ধমানাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে; তাহারা যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে পরদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আসিয়া নবাব-শিবিরের নিকট উপস্থিত হইবে। নবাব আলিবর্দ্দী ইতঃপূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা চৌথ আদায়ের 'জন্য বঙ্গদেশে আগমন করিবে। কিন্তু তাহারা যে এত শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। তাঁহার সঙ্গের সৈন্য-সংখ্যা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, অধিকন্তু তাহারা রণ-শ্রমে নিতান্ত কাতর, তাহার উপর আবার রসদের অভাব। এই অবস্থায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করা বঙ্গীয়গণের পক্ষে অসম্ভব;

কিন্তু বুদ্ধিমান্ নবাব এই অসন্ন বিপদের সংবাদ পাইয়া মুখে কোনও উদ্বেগ বা চাঞ্চল্যের ভাব প্রকাশ করিলেন না; তাঁহার কোনও প্রকার দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইলে হয় ত সৈন্যেরাও হতাশ হইয়া পড়িতে পারে। আলিবর্দ্দী তৎক্ষণাৎ তাঁহার সৈন্যদিগকে পট্টাবাস উত্তোলন পূর্ব্বক মারহাট্টাদিগের গতিরোধ করিবার জন্য বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার উৎসাহে সৈন্যগণের শ্রান্ত শরীরেও বলের সঞ্চার হইল। বাঙ্গালীগণ বর্গীদিগকে বাধা দিবার জন্য দ্রুতবেগে বর্দ্ধমানের দিকে ধাবিত হইল।

নবাবের উদ্দেশ্য ছিল, বর্দ্ধমানে পৌঁছিতে পারিলে খাদ্যাদির অভাব হইবে না এবং নগরের পশ্চাৎ দিক্ হইতে শত্রুপক্ষকে বাধা দিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু তিনি বর্দ্ধমানে পৌঁছিয়াই শুনিতে পাইলেন, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য বর্দ্ধমানের একাংশ আক্রমণ করিয়া তাহা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে। আলিবর্দ্দী মনে মনে হতাশ হইলেও প্রকাশ্যে বীরত্বের ভাব দেখাইয়া সৈন্যদিগকে অনতিবিলম্বে মারহাট্টা-শিবির আক্রমণের আদেশ প্রদান করিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া বাঙ্গালী এবং বর্গীতে যুদ্ধ চলিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া উভয় পক্ষই স্ব স্ব শিবিরে যাইয়া রাত্রি যাপন করে, প্রত্যূষে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। বাঙ্গালী সৈন্য সংখ্যায় অল্প হইলেও মারহাট্টা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি নবাবের নিকট হইতে কিছু অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক সসম্মানে বিদায় লইবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নিকট দশলক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। আলিবর্দ্দী এই অপমানকর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সুতরাং আবার রণদামামা বাজিয়া উঠিল। মারহাঠাগণ তাহাদের চিরাচরিত রণনীতি

অনুসারে গোপনে বাঙ্গালী সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন।

একদিন যুদ্ধ হইতেছে, সে সময় নবাবপক্ষীয় ভৃত্যগণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া আসিয়া সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে আশ্রয় লইল, ইহাতে সৈন্যদলের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। এই সুযোগে মহারাষ্ট্রীয়গণ বিপুল বিক্রমে বাঙ্গালীদিগকে আক্রমণ করিল। বাঙ্গালী সৈন্যেরাও যথাসাধ্য সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিল। রণক্ষেত্র হতাহতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এমন সময় মহারাষ্ট্রীয়গণ যুদ্ধক্ষেত্রের একাংশে আলিবর্দ্দীর বেগমের হস্তী বেষ্টন করিয়া ফেলিল। বেগম শত্রুহস্তে বন্দিনী হইবার উপক্রম হইলেন, এমন সময় বঙ্গীয় সৈন্যগণ মুসাহেব খাঁ নামক একজন সেনানীর কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হইয়া জীবনপণ পরিশ্রমে বেগমকে উদ্ধার করিল।

ঐ দিন যুদ্ধে নবাব-সৈন্যের রসদাদি প্রায় অধিকাংশই বর্গীদিগের হস্তগত হইল। তাহাদের হস্তে বহু সৈন্য ক্ষয় হইতে লাগিল। এই সময় আবার মহারাষ্ট্রীয়েরা ঘোষণা করিয়া দিল, শত্রুপক্ষের যে কেহ তাহাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে, তাহারা তাহাকে আশ্রয় দিবে। ইহাতে নবাবের অনেক ক্ষতি হইল। তাঁহার অনেক সৈন্য মহারাষ্ট্রদিগের ভয়ে যাইয়া তাহাদের আশ্রয়প্রার্থী হইল। এদিকে সন্ধ্যা আগতপ্রায়, সুতরাং আর অগ্রসর হইয়া শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করা অথবা শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করা উভয়ই অসম্ভব। কাজেই বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবকে সেই শত্রু-পরিবেষ্টিত উন্মুক্ত প্রান্তর মধ্যেই সামান্য তাঁবুতে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিতে হইল। নবাব আলিবর্দ্দী ভাস্কর পণ্ডিতকে দশলক্ষ টাকা প্রদানে স্বীকৃত হইয়া সন্ধির

প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি নবাবের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া এক কোটী টাকা দাবী করিয়া বসিলেন। নবাব তাহাতে সম্মত হইলেন না। সেই দিন রাত্রির মত যুদ্ধ স্থগিত রহিল। নবাবের সেনাপতিগণ পরদিন বিপুল বিক্রমে মহারাষ্ট্রদলকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদের সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ স্থির করিলেন।

গভীর রজনী। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে রণাহতগণের করুণ আর্ত্তনাদ রজনীর সুষুপ্তি ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। দূরে দূরে দুই একটী শিবিরে ক্ষীণ দীপ-শিখা সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে যেন মহাশ্মশানের নির্ব্বাপিতপ্রায় চিতাবহ্নির মত জ্বলিতেছিল। সহসা অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া মহারাষ্ট্রের কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বাঙ্গালী সৈন্যের সুখ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই বর্গীগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের কামানোদ্গীর্ণ গোলার আঘাতে নবাব-শিবির ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল, রণাহতের আর্ত্তনাদ রজনীর বিভীষিকা আরও বাড়াইয়া তুলিল। বাঙ্গালী সৈন্যেরা জীবনের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া বিপক্ষদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের কামানও ভীম-ভৈরবরবে গর্জ্জন করিয়া বিপক্ষের ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধে বাঙ্গালীর শক্তির নিকট মহারাষ্ট্র সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

আসন্ন মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া নবাব-সৈন্যের হৃদয়ে নবীন বল ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। হৃদয়ের বলই এখন তাহাদের একমাত্র সম্বল। যে সামান্য খাদ্যদ্রব্য তাহাদের সঙ্গে ছিল, গত রাত্রির অতর্কিত আক্রমণে তাহা শত্রুগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। এখন তাহারা আহার্য্য-

শূন্য, ক্ষুৎপিপাসা-কাতর এবং রণশ্রমে পরিক্লান্ত। উষাসমাগমে বাঙ্গালীগণ কাটোয়ার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া সপ্তদশ ক্রোশ। মহারাষ্ট্রীয়গণ গতরাত্রির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেও একেবারে দূরে পলায়ন করে নাই। তাহারা ক্ষণ-কালের জন্য আত্মগোপন করিয়াছিল মাত্র। বাঙ্গালী সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহারা পুনরায় দ্রুত অশ্বারোহণে তাহাদের উপর আপতিত হইল। বর্গীগণের সহিত খণ্ডযুদ্ধ করিয়া তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে করিতে শ্রান্ত বাঙ্গালী সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইলেও তাহাদের হৃদয়ের বল মন্দীভূত হইল না।

পথের দুইধারে গ্রাম আছে, গৃহ আছে, কিন্তু তাহাতে লোক নাই, অধিকাংশ গৃহই বর্গীগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত, গৃহবাসীরা বর্গীর ভয়ে পলায়িত। বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া এই সুদীর্ঘ পথের উভয়পার্শ্বস্থ আট দশ ক্রোশ স্থানের এই শোচনীয় অবস্থা! সুতরাং বঙ্গীয় সৈন্যগণের পক্ষে আহার্য্য সংগ্রহ একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই সময় আবার বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়া তাহাদের দুর্গতির অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিল। পথের দুইধারে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা বর্ত্তমান। বঙ্গীয় সৈন্যগণ সমস্ত দিন পথ-পর্য্যটন করিয়া রাত্রিকালে ঐ দীর্ঘিকার উচ্চ তীরভূমির উপর গাছের নীচে বিশ্রাম করিত। খাদ্যাভাবে বৃক্ষের নবপল্লবাদি সংগ্রহপূর্ব্বক ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া মুক্ত আকাশের নীচে ভূমিশয্যায় নিশাযাপন করিত, কি সেনাপতি, কি সৈন্যগণ, সকলেরই এক অবস্থা। অনেকে কীটপতঙ্গাদি খাইয়াও জঠরানল নিবৃত্তি করিয়াছে। এত দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করিয়াও বাঙ্গালী সৈন্যেরা দুর্দ্দান্ত বর্গীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর

হইতে লাগিল। বর্গীগণ যখন-তখন তাহাদের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিল।

একদিন মহারাষ্ট্রীয়গণ অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া আহ্নিক এবং আহারের আয়োজনে ব্যস্ত ছিল, এমন সময় সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ স্বীয় সৈন্যদিগকে বর্গীদল আক্রমণের আদেশ প্রদান করিলেন। সেনাপতির আদেশ পাইয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত ,বঙ্গীয় সৈন্য বর্গীদিগকে আক্রমণ করিল। বর্গীগণ এই অপ্রত্যাশিত বিপদের বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা করে নাই; তাহারা আর সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না, অর্দ্ধপক্ক ডাল-রুটি-ও সংগৃহীত শস্যাদি ফেলিয়া রাখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। ক্ষুৎপীড়িত নবাব-সৈন্যগণ সেই পরিত্যক্ত খাদ্য আহার করিয়া দুর্ব্বল দেহে কিঞ্চিৎ বল সঞ্চয় করিয়া লইল।

বর্গীগণ তাহাদের মুখের গ্রাস হইতে বাঙ্গালী সৈন্যগণ কর্তৃক বঞ্চিত হইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইল। এই প্রতিহিংসা সাধনের জন্য তৃতীয় দিন তাহারা অসাবধান বঙ্গীয় সৈন্যের উপর সহসা চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া আপতিত হইল। বাঙ্গালী সৈন্যগণ উত্তমরূপে সজ্জিত হইতে পারে নাই, নবাব আলিবর্দ্দী কেবলমাত্র হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছেন, এমন সময় তুমুল বিশৃঙ্খল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যে যাহাকে পারিল আক্রমণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধে নবাবের জীবন প্রায় বিপন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ভগবান্ এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব উপায়ে তাঁহার জীবন রক্ষা করিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর হস্তীর সম্মুখে দুইটী সুসজ্জিত হস্তী সাজসজ্জা ও পতাকাদি বহন করিয়া চলিত। তাহাদের প্রকাণ্ড দন্তের সহিত লৌহ-শৃঙ্খল সংবদ্ধ ছিল, গমন-কালে ঐ শৃঙ্খলের শব্দে তালে তালে পদবিক্ষেপে তাহারা গমন করিত।

এই হস্তী দুইটী সহসা বিপক্ষদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং আস্ফালন ও চীৎকার করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে সেই শৃঙ্খল ঘুরাইতে লাগিল। শৃঙ্খলের আঘাতে বহু মারহাঠা সৈন্য ধরাশায়ী হইল। ইহাতে বাঙ্গালী সৈন্যগণ একত্র সমবেত হইয়া বিপক্ষ-শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সুবিধা প্রাপ্ত হইল। মারহাঠাগণ বঙ্গীয়দিগের সেই আক্রমণ আর প্রতিরোধ করিতে পারিল না, হতাশ হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

এইরূপে বহু দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগের পর পঞ্চসহস্র বঙ্গীয় বীরের হতাবশিষ্ট দুই তিন হাজার মাত্র তিন দিনে কাটোয়ায় পৌঁছিয়া বিপদ্ হইতে অব্যাহতি পাইল। তাহারা তথায় প্রবেশ করিয়াই দেখিল, মারহাঠাগণ তাহাদের পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়া নগর লুণ্ঠন পূর্ব্বক তত্রত্য বিখ্যাত শস্য-ভাণ্ডার ভস্মীভূত করিয়া গিয়াছে। ক্ষুধার্ত্ত বঙ্গীয়-সৈন্য সেই ভস্মাবশিষ্ট ভর্জ্জিত তণ্ডুল আহার করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিল।

গ্রীক-ইতিহাসের 'দশসহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন' একটি চিরস্মরণীয় বীরত্বের কাহিনীরূপে জগতের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় এই **'পঞ্চসহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন'** সেই প্রকার একটা মহৎ বীরত্বের কার্য্য হইলেও হতভাগ্য বাংলাদেশ বলিয়া ইতিহাসের নিকট অবজ্ঞাত হইয়া 'লোকগোচরের অন্তরালে পড়িয়া রহিয়াছে। ইতিহাস-বিমুখ বাঙ্গালী আজিও তাহার গৌরবের প্রচার করিতে শিখিল না। ইংরাজ ঐতিহাসিক হল্‌ওয়েল্ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, "গ্রীসের সুবিখ্যাত 'দশসহস্রের প্রত্যাবর্ত্তনের' ন্যায় বাংলার এই 'পঞ্চসহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন ইতিহাসের একটা গৌরবময় স্থায়ী সম্পদ্ হওয়ার

উপযুক্ত।" যদি এই অধঃপতিত দেশে না হইয়া পৃথিবীর অন্য যে কোনও স্বাধীন দেশে ইহা অনুষ্ঠিত হইত, তবে তাহা জাতির ইতিহাসে সুবর্ণে অক্ষরে লিখিত থাকিত। কিন্তু হায়, আমরা যে—ভারতবাসী——বাঙ্গালা !

* "If we consider the retreat of these veterans..........in all its circumstances it will appear as amazing an effort of human bravery as the history of any age or people has chronicled, and we think it merits as much being recorded and transmitted to posterity as that of the celebrated Athenian general and historian." —*Interesting Historical Events*. By Mr. Holwell. ("নবাবী আমল"—৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত)।

পলাশী-বীর মোহনলাল

এই সেই বীর মোহনলাল,—যাহার রণ-নিনাদ বঙ্গের সেই শেষ গৌরবের দিন ভাগীরথীর তীরে পলাশী-প্রান্তরে ধ্বনিত হইয়াছিল,—এই সেই মোহনলাল,—যিনি বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কামানোদ্গীর্ণ অনলবর্ষণে আম্রকানন আচ্ছন্ন এবং ভাগীরথী-সলিল কম্পিত করিয়া শেষে ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন,—এই সেই মোহনলাল,—যিনি বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফরকে পলাশী-রণক্ষেত্রে নীরবে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ জ্বালায় তিরস্কার করিয়াছিলেন :—

"সেনাপতি ! ছি ছি, একি ! হা ধিক্ তোমারে !
কেমনে বল না হায়,
কাষ্ঠের পুতুল প্রায়,
সুসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে ?
ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ
দাঁড়াইয়া অকারণ
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির ?
ভেবেছ কি শুধু রণে করি পরাজয়
রণমত্ত শত্রুগণ
ফিরে যাবে ত্যজি রণ,
আবার যবন বঙ্গে হইবে উদয় ?

মূর্খ তুমি, মাটি কাটি লভি' কোহিনুর,
ফেলিয়া সে রত্ন হায়,
কে ঘরে ফিরিয়া যায়
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর ?
সামান্য বণিক্ এই শত্রুগণ নয়
দেখিবে তাদের হায়,
রাজারাজ্য ব্যবসায়,
বিপণি সমর-ক্ষেত্র, অস্ত্র বিনিময়।" ইত্যাদি

—পলাশীর যুদ্ধ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বাঙ্গালীর বীর্য্য-বহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই,—তখনও বাঙ্গালী-বীরের রণদুন্দুভির ভৈরবনিনাদ বঙ্গের আকাশ প্রতিধ্বনিত করিত, কিন্তু পলাশী-প্রাঙ্গণেই বুঝি তাহার অবসান। সেই দিন ভাগীরথী-গর্ভে, বাঙ্গালীর যে সমর-দক্ষতা চিরদিনের মত সলিল-সমাধি লাভ করিল, বুঝি তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না।

সামান্য দরিদ্র অবস্থা হইতে মানুষ যে যশের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, মহারাজ মোহনলাল তাহার একটী অন্যতম দৃষ্টান্ত। তিনি সামান্য একজন সৈনিক মাত্র ছিলেন, নবাব-দরবারে তাঁহার কোনই বিশিষ্ট পদ-গৌরব ছিল না, কিন্তু শেষে স্বীয় বুদ্ধিমত্তায় সিরাজের প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং বীরত্বের প্রভাবে সহকারী সেনাপতির পদ লাভ করিয়া অসীম বীরত্ব, প্রভুভক্তি এবং স্বদেশপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী সিরাজ মোহনলালকে তাঁহার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ "মহারাজ" উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়া বীরের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মোহনলাল জীবনে কখনও

বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার পদগৌরবের অমর্য্যাদা করেন নাই। এমন কি, যখন রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের সিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, বীর মোহনলাল তখন প্রভুর জীবন ও রাজ্য-রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

পূর্ণিয়ার অধিপতি শওকতজঙ্গ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজতক্ত লাভ করিবার জন্য বিদ্রোহ-ঘোষণা করিয়া মুর্শিদাবাদ আক্রমণের আয়োজন করিতেছেন শুনিয়া, সিরাজ শওকতজঙ্গকে তাঁহার এই দুরাকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদানের নিমিত্ত তিন জন সমরদক্ষ সেনাপতির অধীনে তিন দল সৈন্য তিন দিকে প্রেরণ করিলেন। সেই তিনজনের মধ্যে মহারাজ মোহনলাল অন্যতম। তিনি পূর্ণিয়া আক্রমণের ভার প্রাপ্ত হইয়া সসৈন্য জলঙ্গী ও পদ্মানদী বাহিয়া ধাবিত হইলেন।

শওকতজঙ্গও বিপুল বিক্রমে সৈন্য পরিচালন করিয়া আনিয়া একটী জলাভূমির সম্মুখে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। জলাভূমির এক পারে শওকতজঙ্গের সৈন্য এবং অপর পারে মোহনলালের সৈন্য দণ্ডায়মান হইয়া গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। কোনও দলেরই অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না, কারণ সম্মুখে দুরতিক্রম্য বিস্তৃত জলাভূমি, তাহার উপর দিয়া পদাতিক, অশ্বারোহী বা গোলন্দাজ সৈন্যের অগ্রগমন অসম্ভব। মোহনলাল গগন আচ্ছন্ন করিয়া গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ গোলাই জলাভূমিতে নিপতিত হইয়া ব্যর্থ হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে যে দুই চারিটী গোলা যাইয়া শওকতজঙ্গের শিবিরশ্রেণীর উপর নিপতিত হইতেছিল, তাহাতেই শওকতজঙ্গের

সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নের উপক্রম করিল। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে শওকতজঙ্গ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। উক্ত জলাভূমির মধ্য দিয়া একটী অতি সঙ্কীর্ণ পথ ছিল, সেই পথের মুখেই শওকতজঙ্গ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া মোহনলাল এতক্ষণ সেই পথে সৈন্য চালনার সুবিধা পান নাই। এইবার শওকতজঙ্গের সৈন্যদলকে পলায়নোন্মুখ দেখিয়া মোহনলাল সেই পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই স্থলে আর একজন বাঙ্গালী বীরের শক্তি ও বীর্য্যমত্তার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইঁহার নাম **শ্যামসুন্দর,** জাতিতে কায়স্থ। তিনি শওকতজঙ্গের পিতার আমল হইতে গোলন্দাজ সৈন্য-বিভাগে মসিজীবীর কর্ম্ম করিতেন; এই যুদ্ধের সময় তিনি মসি ফেলিয়া অসি ধারণ করিয়াছিলেন। যখন মোহনলালের গোলাবর্ষণে শওকত-সৈন্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পলায়নপর হইতে লাগিল, তখন শ্যামসুন্দর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি শওকতজঙ্গের কোনও প্রকার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া কামানসহ সেই অপরিসর পথে অগ্রসর হইলেন। যদিও ইতঃপূর্ব্বে শ্যামসুন্দর কখনও আর রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই, তথাপি তাঁহার যুদ্ধকৌশল ও বীরবিক্রমে গোলাবর্ষণ দর্শন করিয়া সমরকুশল বীর মোহনলাল পর্য্যন্ত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্যামসুন্দরের বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া শওকতজঙ্গের ভীত ও ত্রস্ত সৈন্যদল আবার নবীন উৎসাহে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভীমভৈরব গর্জ্জনে রণভূমি কম্পিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। শ্যামসুন্দরের কামানোৎক্ষিপ্ত অনল-বর্ষণে মোহনলালের সৈন্যগণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। কিন্তু শওকতজঙ্গের মূর্খতায় শ্যামসুন্দরের বীরত্ব কার্য্যকর হইল না। শওকতজঙ্গ গুলির আঘাতে নিহত হইলেন। বিজয়লক্ষ্মী বীর মোহন-

লালকে জয়-কিরীটে ভূষিত করিলেন। অতঃপর মোহনলাল কিছুদিন পূর্ণিয়ার শাসনকার্য্য পরিচালন করিয়া স্বীয় পুত্র-হস্তে উহা সমর্পণ পূর্ব্বক মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ভাগীরথী-তীরে পলাশী-প্রান্তরে সিরাজের জীবনের শেষ ও চিরস্মরণীয় যুদ্ধায়োজন হইল। এই সেই পলাশী-প্রান্তর, যেখানে মুসলমান-কুলকলঙ্ক কৃতঘ্ন মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বঙ্গের স্বাধীনতাসূর্য্য চির অস্তমিত হইয়া ব্রিটিশগৌরব-রবির অরুণালোক পূর্ব্বাকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।. পূর্ব্বেই নবাব ও ইংরাজ-সৈন্য পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। লক্ষবৃক্ষ-সমাকুল "লাখবাগ" নামক আম্রকাননের সন্নিকটস্থ প্রান্তরে ক্লাইভ কর্ত্তৃক ইংরাজ-ব্যূহ রচিত হইয়াছিল। সিরাজ তাঁহার হীরাঝিলের প্রমোদ-কুঞ্জে নিশ্চিন্ত বসিয়াছিলেন না; তিনি দাদপুরের দক্ষিণে তেজনগরের বিস্তৃত প্রান্তরে তাঁহার সেনা সমাবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার শিবিরের সম্মুখস্থ পরিখা এবং আম্রকাননের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মীরমদন ও মোহনলাল স্ব স্ব সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন। উহার দক্ষিণ পার্শ্বে পুষ্করিণীর পাহাড়ে ফরাসী সেনাপতি সিন্‌ফ্রেঁ সামান্য গোলন্দাজ সৈন্য এবং ৪টী কামান লইয়া উপস্থিত ছিলেন। বামে পরিখার ধার হইতে আম্রকাননের পূর্ব্বদিকে প্রায় পলাশীর গ্রাম পর্য্যন্ত অর্দ্ধবৃত্তাকারে দুর্লভরাম, ইয়ারলতিফ ও মীরজাফরের সৈন্যদল স্থাপিত হইয়াছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন প্রত্যুষেই সিরাজ-সৈন্য বিভিন্ন সেনাপতির অধীনে রণনিনাদে গগন কম্পিত করিয়া ইংরেজ-শিবির বেষ্টন করিবার জন্য অর্দ্ধবৃত্তাকারে আম্রকাননের দিকে অগ্রসর হইল। নবাবের সেনা-সমাবেশ দেখিয়া ইংরাজ সেনাপতিরা প্রমাদ গণিলেন,—নবাব-সৈন্য যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে এখন যদি কামানে অগ্নিসংযোগ করে, তবেই

পলাশীর যুদ্ধ

—১২০ পৃষ্ঠা
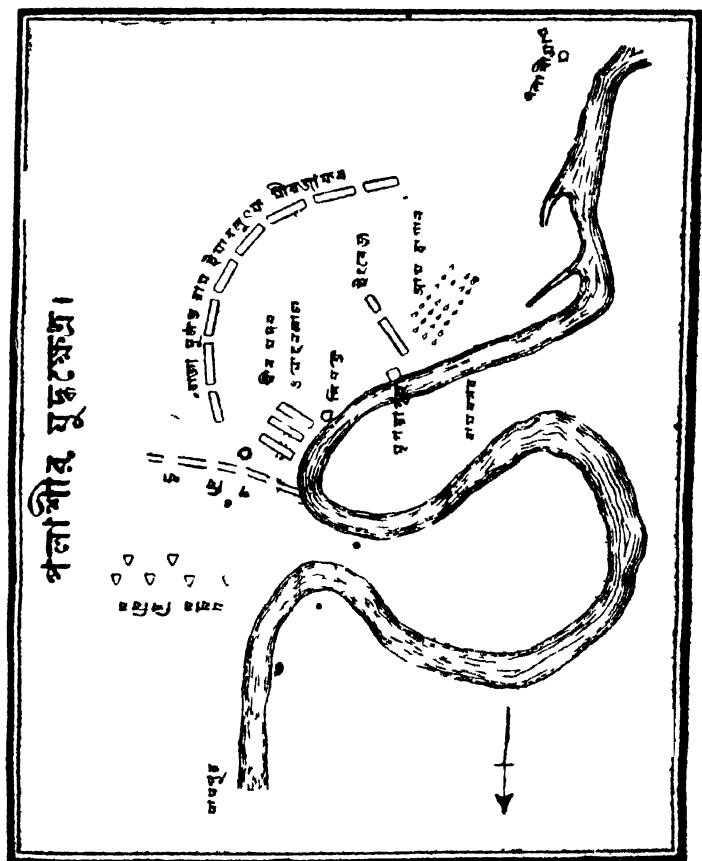
পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র।

ইংরাজদিগের সমস্ত আশা-ভরসা একেবারে নির্ম্মূল হইবে। ক্লাইভ তাড়াতাড়ি সৈন্য সমাবেশ করিয়া ছয়টী কামান সম্মুখে রাখিয়া সিরাজ-সেনার গতিরোধের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। মেজর কূট্‌, মেজর কিলপ্যাট্রিক্‌, মেজর গ্রাণ্ট ও ক্যাপ্টেন গফ্‌ ইংরাজ-সৈন্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। অপর পক্ষে এক পার্শ্বে বীর মোহনলাল, মধ্যস্থলে সেনাপতি মীরমদন, অপর পার্শ্বে ফরাসী সেনাপতি সিন্‌ফ্রেঁ সৈন্য পরিচালনপূর্ব্বক কামানোদ্গীর্ণ ধূমপটলে গগন আচ্ছন্ন করিয়া বীরবিক্রমে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালী বীর মীরমদনের প্রথম-নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতেই ইংরাজ পক্ষের একজন নিহত ও একজন আহত হইল। তৎপর প্রতিমুহূর্ত্তেই নবাবপক্ষের গোলার আঘাতে ইংরাজ সৈন্য ধরাশায়ী হইতে লাগিল; ইংরাজের কামানও নিষ্ক্রিয় ছিল না, তাঁহাদের গোলাবর্ষণেও নবাব-সৈন্য জীবনলীলা সম্বরণ করিতেছিল, কিন্তু ইংরাজের ক্ষতির তুলনায় নবাব-সৈন্যের ক্ষতি সামান্য মাত্র। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ক্লাইভ হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ত্রিশজন সৈনিক শমন-সদনে প্রেরিত হইয়াছে। এইরূপে সৈন্য হ্রাস পাইতে থাকিলে তিন সহস্র সৈন্য কতক্ষণ আর নবাবের অজস্র গোলাবর্ষণ সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবে? তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, সুখস্বপ্ন বিলীন হইয়া গেল, তিনি সম্মুখে পরাজয়ের ভীষণ বিভীষিকা দর্শন করিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। মীরজাফর এবং উমিচাঁদ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিল যে, নবাব-সৈন্য সামান্য একটু কৃত্রিম রণাভিনয় করিবে মাত্র, তাহাতে ইংরাজ পক্ষের বিশেষ কোনও ক্ষতিই হইবে না, তাহারা অল্প সময়ের মধ্যেই জয়লাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ অন্য প্রকার দেখিয়া উমিচাঁদ এবং মীরজাফরকে ধিক্কার দিতে দিতে ক্লাইভ সম্মুখ সমর

হইতে পশ্চাৎপদ হইয়া স্বীয় সৈন্যসহ আম্রকাননের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বীরবর মীরমদন সদর্পে আম্রকাননাভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময় যদি কৃতঘ্ন মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা না করিত, তবে পলাশীর ইতিহাস অন্যরূপে লিখিত হইত। মীরমদন সেনাপতি মীরজাফরের নিকট হইতে কোনও প্রকার সাহায্য পাইলেন না। মীরজাফর, রায়দুর্লভ ও ইয়ার লতিফ স্ব স্ব সৈন্য লইয়া জড় পুত্তলিকার মত দণ্ডায়মান রহিল। সহসা দ্বিপ্রহর সময়ে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া প্রবল বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। এই বৃষ্টিতে মীরমদনের অধিকাংশ বারুদ জলসিক্ত হইয়া অব্যবহার্য্য হওয়ায় তাঁহার আশা-ভরসা নিঃশেষ হইল, কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না, বিপুল উদ্যমে পুনরায় প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্য রূপ; সহসা বিপক্ষের একটা গোলার আঘাতে বীরবর ভগ্ন-উরু হইয়া নিপতিত হইলেন। মীরমদনের পতনে নবাব-সৈন্য অনেকটা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল, কিন্তু মোহনলাল অচিরে সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়া অগ্নিময় বাক্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। নবাব-সৈন্যের হৃদয়ে আবার আশার সঞ্চার হইল, সেনাপতির মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জিঘাংসায় তাহারা অনুপ্রাণিত হইয়া শত্রুদলনে ধাবিত হইল। বীরকেশরী মোহনলাল তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। আর কয়েকদণ্ড মাত্র তিনি এই ভাবে সৈন্যচালনা করিতে পারিলে একটি ইংরাজ-সেনাও বোধহয় আম্রকানন হইতে ফিরিতে পারিত না।

মীরমদনের পতনে সিরাজদ্দৌলার হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মীরজাফরকে শিবিরে আহ্বানপূর্ব্বক স্বীয় রাজ-মুকুট

তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিয়া আকুলকণ্ঠে সজলনয়নে কহিলেন, "আলিবর্দ্দীর পুণ্যস্মৃতি, মুসলমানের গৌরব বুঝি আজ বিলুপ্ত হয়;—বাংলার সিংহাসন ও আমার জীবন তুমি আজ এই মুকুটের বিনিময়ে রক্ষা কর।" ধূর্ত্ত মীরজাফর ধর্ম্মের নামে শপথ করিয়া কহিল, সামান্য শত্রুদলকে পরাজিত করিতে মীরজাফরের কতক্ষণ? শত্রুপক্ষ কিছুতেই জয়লাভ করিতে পারিবে না। তবে আজ আমাদের সৈন্যদল অত্যন্ত রণশ্রান্ত, এখন তাহাদিগকে বিশ্রামের অনুমতি দেওয়া হউক; আগামী কল্য প্রভাতে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে।" সরলপ্রাণ সিরাজ সুচতুর মীরজাফরের চাটুবাক্যে মুগ্ধ হইয়া সৈন্যদিগকে বিশ্রামের আজ্ঞা দিলেন। এই আজ্ঞাই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। বীরবর মোহনলাল যখন বিপুল বিক্রমে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন প্রতিনিবৃত্ত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। শত্রুদলন না করিয়া তাঁহার প্রত্যাবৃত্ত হইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু উপায় নাই, তিনি মন্‌সব্‌দার মাত্র, নবাব এবং প্রধান সেনাপতির আদেশ ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, তিনি পালন করিতে বাধ্য। মোহনলাল অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে হইতে স্বকীয় সৈন্যদল লইয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

নবাব-সৈন্যকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া ইংরাজ-সৈন্যের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের ইঙ্গিতে এইবার তাহারা আম্রকানন হইতে বহির্গত হইয়া গমনোন্মুখ সিরাজ-সেনার উপর গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। বীরবর মোহনলাল সমস্তই বুঝিতে পারিয়া বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসন রক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ ফরাসী বীর সিন্‌ফ্রেঁর সহিত পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু হতোদ্যম সৈন্যদিগের হৃদয়ে পূর্ব্ব বীরত্ব আর প্রকাশ পাইল না।

মোহনলাল সবিস্ময়ে দেখিলেন, কেবল তাঁহার ও সিন্ফ্রে'র সৈন্যদল ব্যতীত নবাবপক্ষের অপর সৈন্যদল মীরজাফরের প্ররোচনায় রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে। অপর পক্ষে ইংরাজ-সেনা বর্ষাপ্লাবিত গিরি-তরঙ্গিনীর প্রবল ধারার ন্যায় ,সবেগে ও সহর্ষে বিজয়-নিনাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। মোহনলাল বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই, আজ এই সন্ধ্যাগমের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ভাগ্য-গগন চির তমসাবৃত হইবে! তথাপি তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না, শরীরের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়া বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষায় যত্নবান্ হইয়া সিংহবিক্রমে সৈন্যপরিচালন করিতে লাগিলেন। বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, তবুও তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, কিন্তু আর কতক্ষণ? যেখানে গৃহ-শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতা, সেখানে কোনওরূপ শক্তিই কার্য্যকরী হয় না।

সিরাজ স্বীয় শিবির হইতে যুদ্ধের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। পলাশী-প্রাঙ্গণে আর বিজয়লাভের আশা নাই দেখিয়া তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদ রক্ষার জন্য শীঘ্র শীঘ্র ধাবিত হইলেন, কিন্তু সেখানেও যাইয়া দেখিলেন সেই অবস্থা! বিশ্বাসঘাতকদলের চক্রান্ত-জাল সেখানেও বিস্তৃত হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। তিনি মুর্শিদাবাদ রক্ষার জন্য সৈন্যসমাবেশে যত্নবান্ হইলেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদলের কৌশলে তাঁহার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। তখন সিরাজ 'ধনাগার উন্মুক্ত করিয়া সৈন্যদিগকে দুই হস্তে ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন,— যদি সৈন্যদল সন্তুষ্ট হইয়া মুর্শিদাবাদ রক্ষায় বদ্ধপরিকর হয়,—কিন্তু তাহাও বিফল হইল। যাঁহারা সিরাজের পরমাত্মীয় ছিলেন তাঁহারাও আজ তাঁহার বিরুদ্ধাচারী, সকলেই স্বার্থান্ধ।

সিরাজ সকলের নিকট করপুটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু, স্বার্থ-বিধির বিশ্বাসঘাতকের দল তাঁহার সে করুণ নিবেদনে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে পলায়নের পরামর্শ দিল। এদিকে স্বদেশদ্রোহী পাষণ্ডের দল চতুর্দ্দিকে সিরাজের পরাজয় সংবাদ রটনা করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে বিজয়ী ইংরাজ সৈন্য আসিয়া মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠনপূর্ব্বক নাগরিকদিগের প্রাণসংহার করিবে এই আশঙ্কায় সমগ্র রাজধানী আতঙ্কিত হইয়া উঠিল; যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল। বহুবর্ষের যত্নে গঠিত সুরপুরীতুল্য মুর্শিদাবাদ একদিনেই শ্মশানের বিভীষিকা ধারণ করিল। সিরাজ প্রাসাদ-শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার শৈশবের আনন্দনিকেতন, যৌবনের স্বপ্নসৌন্দর্য্যভরা মাতামহের স্নেহানুলিপ্ত মুর্শিদাবাদের এই ভীষণ শোচনীয় দৃশ্য একবার শেষ দর্শন করিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল বেদনার আঘাতে শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল, নয়নযুগল অশ্রুসমাগমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। অদূরে বিশ্বাসঘাতক-দলের বিজয়োন্মত্ত উল্লাস-ধ্বনি কামান-গর্জ্জনের সহিত মিলিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ নৈশান্ধকারকে কম্পিত করিয়া তুলিল। আর মুর্শিদাবাদে অবস্থান নিরাপদ্ নহে; বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা সিরাজ সুখে-দুঃখে একমাত্র জীবনসঙ্গিনী লুৎফউন্নিসার হাত ধরিয়া জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্যের সমভিব্যাহারে রাত্রির অন্ধকারে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। হতভাগ্য সিরাজের সেই শেষ ভীষণ মর্ম্মস্পর্শী পরিণতির হৃদয়বিদারক দৃশ্যপট উদ্ঘাটনের আবশ্যকতা নাই।

বাঙ্গালী বীর মোহনলাল ও ফরাসী বীর সিন্‌ফ্রে নবাবপক্ষীয় সৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই মোহনলালের মনে হইল, এখন

তাঁহার ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া বিশ্রামের সময় নহে; মুর্শিদাবাদ, সিরাজের জীবন ও নবাব-অন্তঃপুর রক্ষার জন্য তাঁহার এখনই ধাবিত হওয়া প্রয়োজন। আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, কর্ত্তব্যের অনুপ্রেরণা তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল, তিনি অনতিবিলম্বে রুধিরাক্ত দেহে, রণক্লান্ত শরীরে, সসৈন্য রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন, সিরাজ পলায়ন করিয়াছেন; তাঁহার হৃদয়ে যেটুকু আশা-ভরসা এবং শরীরে যেটুকু শক্তি ছিল, সিরাজের পলায়ন-বার্ত্তা শ্রবণে তাহাও নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। মোহনলাল অগত্যা সিরাজের সঙ্গে যোগদান করিবার জন্য ভগবান-গোলার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু পথেই মীরজাফরের সৈন্য কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে হইল। সিরাজের অনুগত জনপ্রিয় বীরকেশরী মোহনলালকে বেশী দিন ধরাধামে জীবিত রাখা নিরাপদ্ নহে মনে করিয়া, বিদ্রোহী সেনাপতি বাঙ্গালী-হিন্দু-কুলাঙ্গার দুর্ল্লভরাম তাঁহাকে নিহত করিল। বাঙ্গালী-কুলগৌরব মোহনলালের বীরত্বগৌরবোদ্ভাসিত জীবন এইরূপে ঘাতকের শাণিত কুঠারে পরিসমাপ্তি লাভ করিল। ইতিহাস অনন্তকাল বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কময় কাহিনীর সহিত মোহনলালের স্বদেশপ্রাণতার বীরত্বমণ্ডিত কীর্ত্তি-কথা সগৌরবে বক্ষে ধারণ করিয়া থাকিবে। বাঙ্গালি! যদি পার দিনান্তে,—মাসান্তে,—বৎসরান্তেও একবার করিয়া এই বীরের পুণ্যময় স্মৃতির উদ্দেশ্যে তোমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিও। তুমি, তোমার জাতি ও তোমার দেশ ধন্য হইবে।

জাঁদরেল কালু

ইঁহার প্রকৃত নাম কালীচরণ ঘোষ। হুগলী জিলার আক্‌না গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এই পল্লী-গৃহেই তাঁহার বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। শরীর-চর্চ্চার দিকে ইঁহার যতটা প্রবল অনুরাগ ছিল, বিদ্যাশিক্ষার দিকে ততটা ছিল না। ইনি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন, যুবকেরা যে কার্য্য করিতে অথবা যে বিপদের সম্মুখীন হইতে ভয় পাইত, বালক কালীচরণ নির্ভীকচিত্তে তৎসম্পাদনে অগ্রসর হইতেন। বেশী বিদ্যার্জ্জন তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই, সামান্য কিছু লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াই যুবক অন্নসংস্থানের নিমিত্ত এক সওদাগরী অফিসে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু এই কার্য্য বেশীদিন বীর যুবকের পক্ষে ভাল লাগিল না। তিনি উহা পরিত্যাগ করিয়া সরকারী পল্টনের রসদ বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহাকে সৈন্যদলের সহিত বহু রণক্ষেত্রে গমন করিতে হইত, তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সাহসিকতা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কালীচরণ স্বীয় কর্ম্মদক্ষতাগুণে পরে রসদ-বিভাগ হইতে পল্টনের খাস কেরাণীপদে উন্নীত হন। বহু যুদ্ধক্ষেত্র পর্য্যটন করিয়া যুদ্ধনীতি সম্বন্ধেও তিনি অশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এমন কি, অনেক বিপদের সময় এই বাঙ্গালী যুবকের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিয়া উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারিগণ বহু আসন্ন বিপদের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এইরূপে সামরিক বিভাগে কালীচরণের বিশেষ একটু যশঃ ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই সময় ইংরাজদিগের সহিত মারহাঠাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়,

এই যুদ্ধ ইতিহাসে **"দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র-যুদ্ধ"** নামে বিখ্যাত। ইন্দোররাজ যশোবন্তরাও হোলকার ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পাঞ্জাবে গমনপূর্ব্বক ভরতপুর-রাজের শরণাপন্ন হন। ভরতপুর-রাজ শরণার্থীকে সাহায্যদানে কুন্ঠিত হইলেন না, কিন্তু ইহাতে তাঁহার সহিত ব্রিটিশের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড লেক্ একদল সৈন্য লইয়া ভরতপুর দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক জাঠ-রাজকে শাস্তি দিবার

ভরতপুর দুর্গ

জন্য ধাবিত হন। কালীচরণ এই যুদ্ধে কেরাণীরূপে গমন করিয়াছিলেন। ভরতপুরের জাঠগণ প্রবল পরাক্রমে অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিল। ইংরাজপক্ষ পুনঃ পুনঃ এই যুদ্ধে পরাস্ত হইতে লাগিল, তাহাদের বহু সৈন্য রণক্ষেত্রে চিরনিদ্রা বরণ করিয়া লইল। অবশেষে এক যুদ্ধে ইংরাজপক্ষের এক পল্টনদলের সেনাপতির মৃত্যু হইল, সৈন্যগণ সেনাপতির মৃত্যুতে হতাশ হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া

পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। কালীচরণ দেখিলেন, দুর্দ্ধর্ষ জাঠসেনা যে ভাবে ইংরাজ-সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে যদি ইংরাজ-সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে, তবে সকলকেই শত্রু-কবলে নিপতিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইবে। সহসা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-প্রভাবে তাঁহার মস্তিষ্কে এক অভাবনীয় কৌশল উদ্ভাবিত হইল। তিনি দেখিলেন মৃত্যু অনিবার্য্য, শৃগাল কুক্কুরের মত শত্রুর তরবারির নিম্নে জীবন দান করা অপেক্ষা বীরত্বের সহিত আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লওয়াই অধিকতর শ্লাঘনীয়। কালীচরণ কালবিলম্ব না করিয়া অনতিবিলম্বে মৃত সেনাপতির পোষাক পরিধান করিয়া মুক্ত তরবারি হস্তে অশ্বারোহণে পলায়মান সৈন্যদলের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া অসীম উৎসাহ-বাক্যে তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অগ্নিগর্ভ উৎসাহ-বাক্যে হতাশ সৈন্যদিগের হৃদয়ে আবার নবীন আশা এবং বলের সঞ্চার হইল। তাহারা পুনরায় বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কালীচরণের ভীম বিক্রমে জাঠগণ অস্থির হইয়া উঠিল। আর জয়ের আশা নাই দেখিয়া ভরতপুর-রাজ বিশ লক্ষ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দানপূর্ব্বক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কালীচরণ এই সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার মধ্যস্থতায় ব্রিটিশের সহিত ভরতপুর-রাজের সন্ধি স্থাপিত হইল, সেই সন্ধির সর্ত্তানুসারে অজেয় ভরতপুর দুর্গটী ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। যে দুর্গ এতদিন অজেয় বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল, একজন বাঙ্গালীর বীরত্ববলে তাহা বিজিত হইল; কেবল দুর্গ-বিজয় নহে, কালী চরণের সাহসিকতায় সেই যুদ্ধে ব্রিটিশের সুনাম পরিরক্ষিত হইয়াছিল।

কালীচরণ কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত জেনারেলের পোষাক

পরিধান করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালন করিয়াছিলেন বলিয়া অনধিকারে হস্তক্ষেপের জন্য সামরিক নিয়মানুসারে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের দরবারে তাঁহার বিচার হইল। বিচারে তিনি উক্ত অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কিন্তু গুণের পুরস্কার সর্ব্বত্রই আছে। গভর্ণমেণ্ট সেইজন্য আর একটী বিচারে এই বীর বাঙ্গালীকে তাঁহার সাহস ও বীরত্বের জন্য **'জেনারেল'** উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়া ৩০,০০০৲ টাকা পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার প্রশংসা ঘোষণা করিলেন।

সাধারণ লোকে 'জেনারেল' শব্দটি উচ্চারণ করিতে পারিত না, কাজেই তিনি **জাঁদরেল কালু** এই নামেই সকলের নিকট্ পরিচিত হইয়া পড়িলেন। সেই নামেই সকলে তাঁহাকে চিনিত। তিনি সুদীর্ঘকাল সসম্মানে কার্য্য করিয়া অবশেষে অবসর গ্রহণ করিলেন। শেষজীবন তিনি কলিকাতায় সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

মৃত সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন বলিয়া স্ব:সমাজে তাঁহার স্থান হইল না; তিনি সমাজ কর্ত্তৃক অপাংক্তেয় হইয়াছিলেন। হায়, উদার সনাতন হিন্দুসমাজ, তোমার এই অবস্থা! গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা নবকৃষ্ণের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণের সহায়তায় অবশেষে তাঁহার এই অপাংক্তেয়তা দূরীভূত হইয়া তিনি সমাজে প্রবেশের অধিকারী হন। রাজা রাজকৃষ্ণ তখন কায়স্থ-সমাজপতি ছিলেন; তিনি গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে সমাজের একজায়ী নিমন্ত্রণ করিয়া কালীচরণকে তাহাতে পংক্তি ভোজন করান। তাহাতেই কালীচরণের পাতিত্ব দূরীভূত হয়।

আশানন্দ ঢেঁকী

অদূর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বঙ্গ-জননীর ক্রোড়ে বীর সন্তানের অভাব ছিল না। এখনও জনশ্রুতি নানাভাবে তাঁহাদের বীরত্ব-কাহিনী ঘোষণা করিতেছে; যদিও তাহা অতিরঞ্জনের তূলিকা-স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত নহে, তথাপি সে সমুদয় কাহিনীর গর্ভে বহুল পরিমাণে সত্য নিহিত রহিয়াছে। আশানন্দ নদীয়া জিলার অন্তর্গত শান্তিপুর গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে নানাবিধ বিরুদ্ধ মত দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকেই অনেক স্থানে তাঁহার জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বঙ্গের বিভিন্ন জিলায় তাঁহার নানারূপ অদ্ভুত ও অমানুষিক বীরত্বের কথা প্রচারিত আছে। যাহা হউক, আশানন্দের অস্তিত্ব এবং বীরত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও হেতু নাই।

তখন বঙ্গদেশে দস্যুর উপদ্রব অত্যন্ত প্রবল ছিল। জমিদারগণের লাটের খাজনা পাঠাইবার সময় পথে দস্যু কর্তৃক তাহা প্রায়ই লুণ্ঠিত হইত। যশোহর, নদীয়া, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জিলার প্রধান প্রধান জমিদারগণ লাটের খাজনা পাঠাইবার সময় প্রায়ই বীর আশানন্দের শরণাপন্ন হইতেন। আশানন্দ জমিদারদিগের পাইক বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে খাজনা নিরাপদে সদর কালেক্টরীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতেন। অনেক সময় আশানন্দকে সশস্ত্র দস্যুদলের সহিত যুদ্ধ করিয়া খাজনার টাকা রক্ষা করিতে হইত। একবার আশানন্দ বহু টাকা লইয়া কালেক্টরীতে যাইতেছিলেন, সঙ্গে মাত্র কয়েকজন পাইক।

সহসা প্রায় দুইশত অস্ত্রধারী দস্যু আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। এই অতর্কিত আক্রমণে আশানন্দ ভীত বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন না, তিনি বীরদর্পে লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই সশস্ত্র বিরাট দস্যু-দলের সম্মুখীন হইলেন। দস্যুরাও যথাসাধ্য তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল বটে, কিন্তু আশানন্দের লাঠি ঘূর্ণনের সম্মুখে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিয়া থাকিতে সমর্থ হইল না। আশানন্দ দস্যুদলের অগ্রবর্ত্তী দুইজন প্রধান ব্যক্তিকে ধরিয়া বগলে পূরিয়া ফেলিলেন, দস্যুদ্বয় সেই বজ্রকঠিন বাহুবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিল না। তদ্দর্শনে অন্যান্য দস্যুগণ তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। আশানন্দ ধৃত দস্যুদ্বয়কে সেই অবস্থায় লইয়াই কাছারীতে কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। সাহেব এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এই বীরত্বদর্শনে বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং কালেক্টর সাহেব এই বীরত্বের জন্য তাঁহাকে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিলেন।

আর একবার খাজনার টাকা লইয়া যাইবার সময় পথে রাত্রি হওয়ায় আশানন্দ এক গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দস্যুগণ টাকার সন্ধান পাইয়া গভীর নিশীথে উক্ত বাটী আক্রমণ করিল। গোলমালে আশানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি সহসা হাতের কাছে দস্যু তাড়াইবার উপযুক্ত কোনও কিছু না পাইয়া ঢেঁকী-শালা হইতে ঢেঁকীটা তুলিয়া লইয়া তাহাই ঘুরাইতে ঘুরাইতে দস্যুদলকে আক্রমণ করিলেন। ঢেঁকী-প্রহারে কতিপয় দস্যু ধরাশায়ী হইল, অপরাপর সকলে রণে ভঙ্গ দিয়া প্রাণরক্ষা করিল। তদবধি তিনি "আশানন্দ ঢেঁকী" নামে সকলের নিকট বিখ্যাত হইলেন। জীবনে তাঁহাকে এইরূপ অনেকবার দস্যুদলের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে হইয়াছে।

আশানন্দের আহার সম্বন্ধেও নানা অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা যে নিতান্ত কল্পিত কাহিনী এরূপ মনে হয় না। যাঁহার অমন অসাধারণ শারীরিক শক্তি, তাঁহার অমানুষিক আহার-শক্তি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আশানন্দের দয়া-গুণও অসীম ছিল, অনেক দরিদ্র তাঁহার দ্বারা সময়ে-অসময়ে নানারূপে উপকৃত হইত।

———

যোদ্ধা মুন্‌সেফ্‌

—১৩৫ পৃষ্ঠা

যোদ্ধা মুন্‌সেফ্

উত্তরপাড়া নিবাসী ৺প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বীয় বীরত্বের জন্য তৎকালীন রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক 'যোদ্ধা মুন্‌সেফ্' নামে অভিহিত হন। সিপাহী-বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্যারীমোহন বাবু উত্তরপাড়া হইতে কাশীতে গমন করেন। অতঃপর মুন্‌সেফি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলাহাবাদের নিকটস্থ মঞ্জনপুরে মুন্‌সেফ্ নিযুক্ত হন।

কিছু দিন পরেই বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। মঞ্জনপুরের নিকটবর্ত্তী জমিদারবর্গ স্বাধীনতা লাভের আশায় বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিয়া গ্রামবাসী প্রজাদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে; এমন কি, কয়েকখানি গ্রাম তাহাদের দ্বারা ভস্মে পরিণত হয়। জমিদারবর্গ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া 'যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি' রবে ইংরাজ তহশীল আক্রমণ করে। প্যারীমোহন বাবু এই আসন্ন বিপদে ধীরতা এবং বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাবর্গ ও কয়েকজন শান্ত জমিদার দ্বারা একটী সৈন্যদল গঠন করিয়া বিদ্রোহিদলকে আক্রমণ করেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ সাহস এবং বিপুল বিক্রমে অল্পদিনমধ্যেই শত্রুদল পরাজিত হইল। এই সময় প্যারীমোহন বাবুর বয়স ছিল মাত্র ২২ বৎসর। বিদ্রোহ-দলনে এই তরুণ যুবক যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে ভারতের তৎকালীন বড় লাট লর্ড ক্যানিং এবং অন্যান্য রাজপুরুষগণ শতমুখে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। বিদ্রোহীদিগকে

দমনের নিমিত্ত একবার তাঁহাকে একজন প্রকৃত সেনাপতির ন্যায় শিবির সংস্থাপন এবং সেনা সমাবেশ পূর্ব্বক দুর্দ্দমনীয় শত্রুদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধে বিদ্রোহী-দলের নেতা ধাখল সিং এবং অন্যান্য বহু সর্দ্দার নিহত হইয়াছিল। বিদ্রোহিগণ এই যুদ্ধে প্যারীমোহন বাবুর বীরত্বে এতদূর ভীত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা আর যমুনা পার হইয়া আসিতে সাহস করে নাই। সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানে বড় লাট কাণপুর-দরবারে প্যারীমোহন বাবুর বীরত্ব, সাহস এবং নিপুণতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে হাজার টাকা মূল্যের খিলাৎ, বিস্তৃত জমিদারী এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করেন। লর্ড ক্যানিং-ই প্যারীবাবুকে "যোদ্ধা মুন্‌সেফ্" (**Fighting Munsiff**) এই নামে অভিহিত করেন।

এলাহাবাদের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট টম্‌সন্ সাহেব তদীয় রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন,—"প্যারীমোহন বাবু এই জিলায় মঞ্ঝনপুরে বিগত নভেম্বর মাসে মুন্‌সেফ্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়া অবধি তিনি তদীয় এলাকাস্থ বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। যদিও বিদ্রোহ-দমনের জন্য তিনি নিযুক্ত হন নাই, তথাপি তিনি ক্ষতিগ্রস্ত জমিদারবর্গকে সম্মিলিত এবং সন্দেহজনক জমিদারদিগকে শান্ত করিয়া গভর্ণমেণ্ট-পক্ষে আনয়নপূর্ব্বক বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে একটী দল গঠন করেন। ইহাতে তিনি এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে, কয়েকখানি গ্রাম ব্যতীত দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত সমুদয় গ্রামেই পুলিশের শাসনব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

জনৈক ইংরাজ লেখক 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় লিখিয়া-

ছিলেন,—"একজন দেশীয় মুন্‌সেফ্‌ স্বকীয় ক্ষমতা এবং সাহস প্রভাবে এরূপ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ-দমনে অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তজ্জন্য তিনি 'যোদ্ধা মুন্‌সেফ্‌' নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কেবল তাঁহার নিজের এলাকা রক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি আক্রমণের কৌশল উদ্ভাবন করিতেন, বিদ্রোহীদিগের গ্রাম ভস্মীভূত করিতেন, স্বীয় অধীন কর্ম্মচারিগণকে প্রশংসা করিয়া ইংরাজী ভাষায় ডেস্‌প্যাচ্‌ লিখিতেন এবং শাসনদক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন।"

যখন তাঁহাকে মঞ্জনপুর হইতে অন্যত্র বদলী করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব হয়, তখন এলাহাবাদের কমিশনার ছোটলাট সাহেবকে লিখিয়াছিলেন—"প্যারীমোহন বাবু স্বকীয় সাহস এবং দৃঢ়সঙ্কল্পতার জন্য এত উচ্চ সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন যে, আমার মনে হয়, যমুনা নদীর দক্ষিণ তীর হইতে বিদ্রোহ-বহ্নি তাঁহার জন্যই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্যারীমোহন বাবুকে এ সময় স্থানান্তরিত করিলে শীঘ্রই একটা বিভ্রাটের সূচনা হইবে। তাঁহার এই অভিমতের সহিত আমিও সম্পূর্ণ একমত।"

একজন বাঙ্গালীর পক্ষে সেই ভীষণ বিদ্রোহের সময় স্বীয় সাহস ও বীরত্বপ্রভাবে হিংস্রপ্রকৃতি বিদ্রোহিগণের চিত্তে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া রাজ-পুরুষগণ কর্ত্তৃক অযাচিত প্রশংসালাভ পরম গৌরবের সামগ্রী। ইহা একাকী প্যারীমোহন বাবুর গৌরব নহে,—সমগ্র বঙ্গের, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পরম গৌরব।

ব্যাঘ্রবীর শ্যামাকান্ত

বঙ্গের মহাবলশালী সুবিখ্যাত ব্যাঘ্র-ক্রীড়ক শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুরের অন্তর্গত আড়িয়ল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ত্রিপুরা রাজষ্টেটে সেরেস্তাদারের কর্ম্ম করিতেন। শ্যামাকান্ত বাল্যকাল হইতেই সবলকায় ও সুস্থদেহ ছিলেন এবং শারীরিক শক্তি প্রদর্শনের প্রতি তাঁহার একটা প্রবল অনুরাগ দৃষ্ট হইত। যখন তিনি ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন, তখন দেশীয় ও পাশ্চাত্য ব্যায়াম-চর্চ্চায় বিশেষভাবে সময়াতিপাত করিতেন। এই সময় ঢাকার সুবিখ্যাত মল্লবীর পরেশনাথের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। উভয়েই সমবয়স্ক ছিলেন। দুই বন্ধু লক্ষ্মীবাজারের অধর ঘোষের কুস্তীর আখড়ায় প্রবেশ করিয়া তাহার নিকট কুস্তী শিখিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যায়াম-চর্চ্চার নিমিত্তই স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি লেখা পড়ায় তেমন উন্নতি করিতে পারেন নাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শক্তিসঞ্চয়-স্পৃহাও বলবতী হইতে লাগিল। তিনি সময় সময় পাঞ্জাবী পালোয়ানদিগের সহিত মল্লক্রীড়া করিতেন এবং অধিকাংশ সময়েই সেই পালোয়ানগণ পরাস্ত হইত। এই রূপে যৌবনের বিকাশাবস্থাতেই তাঁহার শারীরিক শক্তির কথা জনসমাজে প্রচারিত হইয়া পড়ে। বাঙ্গালী জাতি ভীরু, কাপুরুষ, দুর্ব্বল, আত্মরক্ষায় অক্ষম,—এই সমুদয় জাতীয় কলঙ্ক বিদূরিত করিবার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন; সৈনিকবিভাগই শক্তি এবং সাহস প্রদর্শনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বিবেচনায় তিনি সমর-বিভাগে প্রবেশের নিমিত্ত চেষ্টা

ব্যাঘ্রবীর শ্যামাকান্ত (সন্ন্যাসিবেশে) —১৩৮ পৃষ্ঠা

করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে সে পথ অবরুদ্ধ দেখিয়া কোনও দেশীয় রাজার সৈনিকবিভাগে প্রবেশের জন্য তিনি এবং পরেশনাথ পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন। কিন্তু দেশীয় রাজগণের সামরিক বিভাগের চরম দুঃখদুর্দ্দশা ও দুর্নীতি দর্শন করিয়া তাঁহারা হতাশ হৃদয়ে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কিছু দিন দেশে অবস্থানের পর শ্যামাকান্তের বিবাহ হয়। তদনন্তর ত্রিপুরারাজ্যে পিতার নিকট গমন করেন। ত্রিপুরার তদানীন্তন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর শ্যামাকান্ত বাবুর সুগঠিত দেহ, ব্যায়াম-কৌশল ও শারীরিক শক্তি দর্শনে তাঁহাকে স্বীয় পার্শ্বচর নিযুক্ত করেন। দুই বৎসর কর্ম্ম করার পর তাঁহাকে নানা কারণে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু মহারাজের স্নেহ ও করুণা হইতে তিনি কখনও বঞ্চিত হন নাই।

ত্রিপুরা হইতে আসিয়া শ্যামাকান্ত বরিশাল জিলা-স্কুলের ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেই সময় হইতেই তাঁহার একটী সার্কাসের দল গঠনের ইচ্ছা হয়, এবং সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার আয়োজন করিতে থাকেন। তৎকালীন প্রথা অনুসারে সার্কাসের দল করা সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে নিন্দনীয় এবং তাহাতে পদে পদে জীবননাশের আশঙ্কা, এই জন্য তদীয় পিতৃদেব এবং আত্মীয়বর্গ ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু শ্যামাকান্ত বাবু কাহারও কোনও আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া সার্কাস-দল লইয়া ক্রীড়া প্রদর্শনের নিমিত্ত বহির্গত হন। শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত সুনামগঞ্জ নামক স্থানে একটী সদ্যোধৃত বন্য চিতাবাঘ ক্রয় করেন এবং তদ্দ্বারা ক্রীড়া প্রদর্শনে অভিলাষী হন। সাধারণতঃ সার্কাসদলে ব্যাঘ্রকে অহিফেন অথবা তজ্জাতীয় অন্য কোনও মাদক দ্রব্যে অভিভূত

করিয়া দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু বীর শ্যামাকান্ত সে উপায় অবলম্বন না করিয়া প্রকৃত বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া শারীরিক শক্তি-প্রভাবে ব্যাঘ্রকে বশ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্রের দন্ত ও নখরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও শোণিতাক্ত-কলেবর হইয়া প্রায় দুই মাস পরিশ্রমের পর তিনি উহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, এবং সুনামগঞ্জেই সেই ব্যাঘ্রের সহিত অদ্ভুত ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের ধন্যবাদার্হ হইলেন। এই স্থানেই তাঁহার ব্যাঘ্র-ক্রীড়ার সূচনা।

ক্রমে শ্যামাকান্তের সাহস ও অভিজ্ঞতা এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, যে কোনও প্রকার সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু অনায়াসে বশ করিয়া তিনি পিঞ্জরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার সহিত মল্লক্রীড়া করিতেন। এই ব্যাঘ্র ক্রীড়ায় তাঁহাকে কতবার যে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। অষ্টাদশ বর্ষকাল তিনি ব্যাঘ্র-ক্রীড়া প্রদর্শন করেন, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কয়েকবার তাঁহাকে মৃত্যুর কবল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। বীর শ্যামাকান্ত সুন্দরবনের ভীষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পিঞ্জরমধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যাঘ্রকে সঙ্কেত করিতেন, অমনি সাক্ষাৎ কৃতান্তসদৃশ রক্তচক্ষু ব্যাঘ্রপ্রবর ভীষণ গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক্ কম্পিত করিয়া মুখব্যাদানপূর্ব্বক ছুটিয়া আসিত, শ্যামাকান্ত নির্ভীক চিত্তে স্থির অটলভাবে পর্ব্বত-প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান থাকিয়া ব্যাঘ্রের মুখ-গহ্বরে দক্ষিণ হস্তের কনুই প্রবেশ করাইয়া দিতেন, ব্যাঘ্র দণ্ডায়মান হইয়া শ্যামাকান্তকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া ধরিত, শ্যামাকান্তও ব্যাঘ্রকে অপর হস্তে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতেন, দুইজনেই

থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিত। সেই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া দর্শকগণের মধ্যে একটা মহা আতঙ্ক ও বিস্ময়ের সাড়া পড়িয়া যাইত। কিছুক্ষণ পরে, তিনি ব্যাঘ্রকে ধাক্কা মারিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেন, অনেক সময় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রুধির-ধারা বহিত।

একবার জয়দেবপুরের (ভাওয়াল) রাজা সুন্দরবনের একটা প্রকাণ্ড বাঘ শ্যামাকান্ত বাবুকে তাঁহার বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ উপহার প্রদান করেন। পাটনার নবাব শ্যামাকান্ত বাবুর বীরত্বে সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে স্বীয় সদ্যোধৃতা একটী ভীষণাকৃতি ব্যাঘ্রীর সহিত ক্রীড়া করিয়া তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আদেশ দেন। বীর শ্যামাকান্ত বিরাট জনতার সম্মুখে ব্যাঘ্রীর সহিত ক্রীড়া করিয়া জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার জীবন প্রায় বিপন্ন হইয়াছিল, ভগবান্ তাঁহাকে সে যাত্রা রক্ষা করেন। নবাব শ্যামাকান্ত বাবুর বীরত্ব-কৌশল এবং সাহসে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ঐ ব্যাঘ্রীটী, দুইটী আরবীয় অশ্ব এবং দুই সহস্র মুদ্রা তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন! সেই বাঘিনীটার নাম ছিল 'বেগম'। শ্যামাকান্তের একটী অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ভীষণদর্শন বাঘের নাম ছিল 'রাজা'। এইটীও তিনি ভাওয়ালের রাজা কর্ত্তৃক পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এই বাঘটীকে লইয়া তিনি একবার খেলা দেখাইতে গৌরীপুরে গমন করেন। শ্যামাকান্ত বাঘের খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া খেলা শেষ হইলে যেমন বাহিরে আসিবেন অমনি বাঘটা তাঁহার মুখে এক থাবা মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল। অন্যান্য দিন খেলা শেষ হইবার সঙ্কেত ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বাঘটাকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া ফেলা হইত, কিন্তু সেদিন অসাবধানতা বশতঃ আর তাহা করা হয় নাই। শ্যামাকান্ত মহা বিপদে পড়িলেন, তিনি বাহির হইয়া আসিলে বাঘটাও বাহির

হইয়া সমবেত জনতার উপর লাফাইয়া পড়িবে, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না। অগত্যা তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া আবার খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। অনন্তর উপর হইতে শিকল ফেলিয়া বাঘটাকে বাঁধা হইলে তিনি উহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

ব্যাঘ্রের সহিত ক্রীড়া ব্যতীত তিনি আরও একটী শারীরিক শক্তির পরিচায়ক ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেন। ১০।১১ মণ ওজনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর বুকের উপর রাখিয়া লৌহ-মুদ্গরাঘাতে তাহা চূর্ণ করাইতেন। একবার লাট-ভবনে ক্রীড়া প্রদর্শন কালে ১৪ মণ ওজনের প্রস্তর বুকের উপর ধারণ করিয়াছিলেন; কয়েকজন গোরা সৈনিক এককালে সেই প্রস্তরের উপর লৌহ-মুদ্গরাঘাত করিয়াও তাহা ভাঙ্গিতে সমর্থ হয় নাই। এই বাঙ্গালী বীরের এইরূপ বীরত্ব-কাহিনী তখন প্রায়ই ইংরাজী এবং বাঙ্গালা সংবাদপত্র-স্তম্ভে প্রকাশিত হইত। যে বিদেশিদল বাঙ্গালীকে দুর্ব্বল, ক্ষীণ, ভীরু বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আসিতেছিল, তাহারা শ্যামাকান্তের বীরত্ব দর্শনে বিস্মিত হইল।

শ্যামাকান্ত বাবু একবার ট্রেনে যাইবার সময় দানাপুর ও আরা ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তিনজন গোরা কর্ত্তৃক জনৈক উচ্চবংশীয়া সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী মহিলাকে আক্রান্ত হইতে দেখিয়া পশুত্রয়ের উপর আপতিত হইলেন এবং বজ্রমুষ্টি-প্রহারে তাহাদিগকে নিপাতিত ও নিরস্ত করিয়া মহিলাটীর সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এক বৎসরের জন্য তিনি মাসিক দেড় সহস্র টাকা বেতনে ফ্রেড্ কুকের ইংরাজ সার্কাসদলে প্রধান ক্রীড়করূপে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। কিন্তু পরাধীনতা তাঁহার ভাল লাগিল না, এইজন্য তিনি

পুনরায় স্বাধীনভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। শ্যামাকান্ত স্বীয় সার্কাসদল লইয়া বঙ্গের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে রঙ্গপুরে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে তাঁহার সার্কাসদলের যে অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল, তাহার আর তিনি সম্পূরণ করিতে পারেন নাই। একটী ত্রিতল বাটীর নিম্নে তাঁহার পশুশালা ছিল, ভূমিকম্পে ঐ বাড়ী ভূমিসাৎ হওয়ায় পশুসকল বিনষ্ট হইয়া যায়। মাত্র দুইটী ব্যাঘ্র বাহিরে থাকায় উহারা রক্ষা পাইয়াছিল। শ্যামাকান্ত ঐ ব্যাঘ্র দুইটী লইয়া কলিকাতায় আনিয়া ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে থাকেন। কিছুদিন এই ভাবে ক্রীড়া প্রদর্শনের পর হাতী, পাঁচটী ব্যাঘ্র, কুকুর, বানর, ভল্লুক প্রভৃতি জন্তু সংগ্রহ করিয়া "GRAND SHOW OF WILD ANIMALS" নামে এক প্রকাণ্ড সার্কাস-দল গঠন করেন।

জগৎবিখ্যাত ব্যায়াম-বীর স্যাণ্ডো কলিকাতায় আসিলে তাঁহার সঙ্গে এল্‌মো নামক তাঁহারই মত একজন মল্লবীর আসিয়াছিলেন। গড়ের মাঠে শ্যামাকান্তের সঙ্গে তাঁহার মুষ্টিযুদ্ধ (Boxing) হয়। তিন মিনিট খেলার পরেই শ্যামাকান্ত এল্‌মোকে এমন এক ধাক্কা মারেন যে, ইংরাজবীর সেই ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া মাটীতে পড়িয়া যান এবং ১৫ মিনিট অজ্ঞান হইয়া থাকেন। শ্যামাকান্তের জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল।

বাল্যকাল হইতেই শ্যামাকান্ত বাবুর হৃদয় ধর্ম্মভাবে পূর্ণ ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই ধর্ম্মভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া শেষে ধন, মান যশঃ ও সংসারের প্রতি তাঁহাকে বীতস্পৃহ করিল। সুতরাং সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এই সময় বিলাতের কোনও সার্কাস কোম্পানী তাঁহাকে মাসিক তিন

সহস্র টাকা বেতন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, কিন্তু শ্যামাকান্ত বাবু তখন বৈরাগ্যের পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, কাজেই এই অর্থলোভ তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে পিতার মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে দান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রস্থান করেন। ইহার পূর্ব্বেই তাঁহারা উত্তর বিক্রমপুর হইতে বাসস্থান উঠাইয়া আনিয়া দক্ষিণ বিক্রমপুরস্থ নড়িয়া গ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণান্তর তিনি ভারতের বহু তীর্থ পর্য্যটন করিতেছিলেন। স্বনাম প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী তিব্বতী বাবা তাঁহাকে দীক্ষা দান করিয়া সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিবৃন্দের সম্মুখে "সোহহং স্বামী" নাম প্রদান করেন। অতঃপর তিনি এই নামেই সকলের নিকট পরিচিত। নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি নাইনিতাল হইতে ৭ মাইল্ দূরবর্ত্তী গর্গাচল উপত্যকায় ভাওয়ালী নামক স্থানে যোগাশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানের নৈসর্গিক দৃশ্য বড় মনোরম। চতুর্দ্দিক্ গগনস্পর্শী গিরিমালা বৃক্ষ ও লতাগুল্মে পরিশোভিত, লতায় লতায় ফুল, বৃক্ষে বৃক্ষে বিহঙ্গের কলগীতি, অদূরে কল কল শব্দে শৈলসুতা প্রবাহিতা, স্থানে স্থানে নির্ঝরসমূহ রজতশুভ্র বারিধারা অবিশ্রান্ত ঢালিয়া দিতেছে। পরম শান্তিময় এই আশ্রমস্থল। নিকটেই মানবের চিরবিশ্রামস্থল শ্মশান। সোহহং স্বামী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি এই স্থানেই যোগারাধনায় অতিবাহিত করিতেন।

একদিন বৈকালে আশ্রম হইতে বেড়াইতে বাহির হইয়া সোহহং স্বামী কতকগুলি পাহাড়িয়া লোককে চীৎকার করিতে শুনিতে পাইলেন। নিকটে যাইয়া দেখিলেন, একটা মাতাল গোরা সৈন্য এক

খানা শাণিত ছোড়া লইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিতেছে। গোরাটাকে তিনি অনেক প্রকারে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে কোনও কথাই গ্রাহ্য করিল না। অবশেষে তিনি তাহাকে ধরিয়া আনিয়া আশ্রমে বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিয়া দিলেন। সে রাত্রে দুর্ব্বৃত্তের সেই ভাবেই কাটিল, পরদিন প্রভাতে সোহহং স্বামী তাহাকে তাহাদের কর্ত্তার নিকট লইয়া গেলেন এবং সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন।

বেদান্তের যাহা সার মর্ম্ম সেই অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া তিনি "সোহহংতত্ত্ব", "সোহহংগীতা" ও "সোহহং-সংহিতা" নামে তিনখানি ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত "বিবেকগাথা", "Truth", "ভগবদ্গীতার সমালোচনা" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সমুদয় পুস্তক তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আজ আর সোহহং স্বামী ইহজগতে নাই, ১৩২৫ সালের পৌষ মাসে স্বনির্ম্মিত আশ্রম-গৃহে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রম আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং দিন দিন ভক্ত ও শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

ব্যাঘ্রবীর শ্যামাকান্তের অমানুষিক বীরত্ব-কাহিনী আজও উপকথার মত বাঙ্গালীর চিত্তাকর্ষণ করিতেছে।

মল্লবীর যতীন্দ্রচরণ (গোবর) গুহ

ইউরোপ ও আমেরিকা-বিজয়ী এই মল্লবীর যতীন্দ্র ওরফে গোবর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বাগবাজারের গুহবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বাবু রামচরণ গুহ। এই গুহবংশ পূর্ব্ব হইতেই শক্তিমত্তায় বিশেষ বিখ্যাত। যতীন্দ্রের পিতামহ স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ গুহ অম্বু বাবু নামে পরিচিত, তিনিও একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। ইনি বিখ্যাত পাঞ্জাবী পালোয়ান রাখিয়া কুস্তী লড়িতেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইত। তাঁহার একটী প্রকাণ্ড কুস্তীর আখড়া ছিল। কুস্তীর পর রীতিমত বলকারক খাদ্য প্রয়োজন, নতুবা শরীরের অপচয় সাধিত হয়, এই জন্য অম্বু বাবু তাঁহার বিস্তৃত আখড়ায় প্রায় ৪০টী দুগ্ধবতী গাভী এবং প্রায় ৩০টী ছাগল রাখিয়া ছিলেন। তাঁহার মল্লশিষ্যেরা কুস্তীর কসরৎ অভ্যাসান্তে প্রত্যহ এই গাভী ও ছাগলের দুগ্ধ এবং অন্যান্য পুষ্টিকর সামগ্রী আহার করিত। তখনও এই বাংলাদেশে শক্তিচর্চ্চার যথেষ্ট আদর ছিল, এখন যেমন আমরা পাশ্চাত্যের বিলাস-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি,—শক্তিমত্তার পরিচয় দেওয়া যেমন আমাদের নিকট বর্ব্বরতা বলিয়া মনে হয়, তখনও বাংলায় এই রকম বাতাস বহিতে আরম্ভ করে নাই। তখনো এই বাংলাদেশে 'আধমণে কৈলাসের' অভাব ছিল না,—তখনো এই বাংলাদেশে এমন অনেক লোক ছিলেন, যাঁহাদের জলযোগের জন্য বড় বড় ২।১ ধামা খৈ আবশ্যক হইত। এখন রুগ্নশরীর কোটরগত-চক্ষু আদ্দির সূক্ষ্ম পাঞ্জাবী-পরিহিত মরাল-গ্রীব সারস-চরণ বাঙ্গালী বাবুবর্গের নিকট তাহা আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের গল্পের মত কাল্পনিক মনে হইবে। কিন্তু সত্য সত্যই

গোবর গুহ

—১৪৬ পৃষ্ঠা
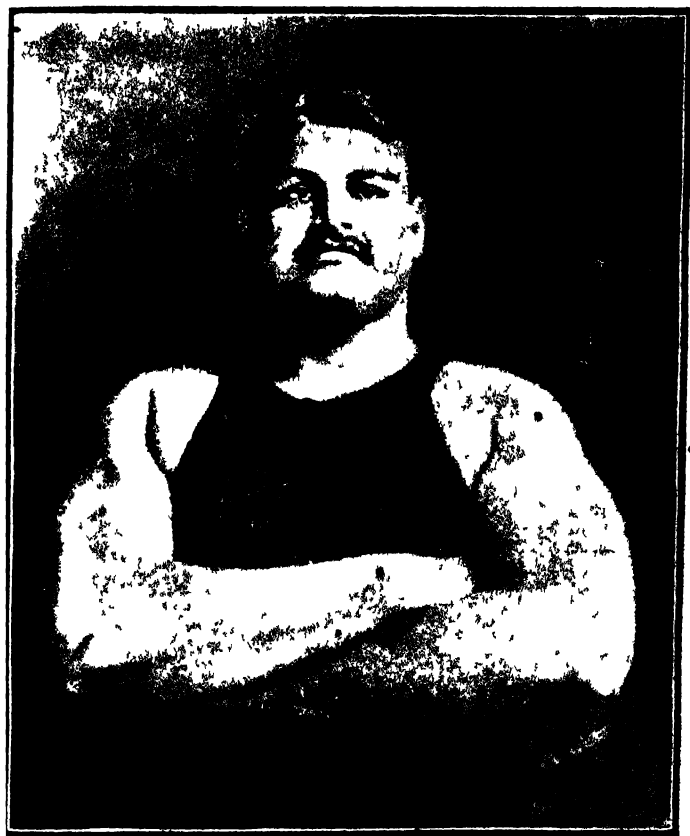
একদিন এই বাংলা দেশে সে প্রকার লোক যথেষ্টই ছিল। আজকাল বাঙ্গালী পথে-ঘাটে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইয়াও শারীরিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করিতেছে না। শারীরিক শক্তিলাভ বিলাসিতার পরিপন্থী বলিয়া তাহাদের মনে ঘৃণা হয়। জানিনা, কবে আবার এই হতভাগ্য ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে ভগবান্ সুমতি প্রদান করিবেন।

অম্বুবাবুর পুত্র (যতীন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত) স্বর্গীয় ক্ষেত্রবাবুও একজন বীর ছিলেন। তিনি এবং অম্বুবাবু উভয়েই কুস্তীর অনেক নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে অম্বুবাবু অপেক্ষা তদীয় পুত্র ক্ষেত্রবাবুর মৌলিকত্বই অধিক। বিখ্যাত বিখ্যাত পাঞ্জাবী পালোয়ানেরা তাঁহাদের নিকট সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিত। তাহারা কলিকাতায় আসিলেই অম্বুবাবু ও ক্ষেত্রবাবুর নিকট হইতে কুস্তীর কিছু কিছু নূতন কৌশল শিক্ষা করিয়া যাইত। "ক্ষেতুবাবুর আখড়া" ছিল তখনকার বাংলা দেশের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান।

ক্ষেত্রবাবু এক সদাগরী আফিসের একজন মুৎসুদ্দি ছিলেন, লাঠি এবং ছোরা খেলায়ও তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি দৈনিক খাদ্য ব্যতীত প্রত্যহ ৮ সের দুগ্ধ খাইতেন। বাল্যকাল হইতেই শক্তিচর্চ্চার আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া যতীন্দ্রের অন্তঃকরণও সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠতাত ক্ষেত্রবাবুর নিকট তাঁহার কুস্তী শিক্ষা আরম্ভ হয়। তাঁহার পরলোক গমনের পর গামা, রহমান, কাল্লু প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত মল্লবীরগণের নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু বালকের এমনই আশ্চর্য্য শক্তি এবং শিক্ষা-কৌশল যে, তাহারা কেহই যতীন্দ্রকে ফেলিতে পারে নাই। এই শিক্ষক-পালোয়ানেরা প্রত্যহ ৪ টাকা হইতে ৬ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইত।

যতীন্দ্র বাল্যকাল হইতে গৃহেই পড়াশুনা করিতেন, পরে মেট্রো-পলিটান স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া সেখান হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। অতঃপর শিক্ষালাভের জন্য বিলাত গমন করেন (১৯১০ খ্রীঃ অঃ মার্চ্চ মাস)। এই সময় তাঁর বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। তিন মাস পরেই তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

যতীন্দ্রবাবু কুড়ি বৎসর বয়সেই বাঙ্গালীদিগের প্রাত্যহিক খাদ্য ব্যতীত তিন পোয়া ঘি মিশ্রিত মাংসের আখ্‌নি, ৪০০ বাদাম, এক ছটাক ছোট্‌ এলাচ, দেড়সের বেদানার রস, এক টাকার সোণার পাত, দুই আনার রূপার পাত, বাদাম ও মসলা মিশ্রিত ঠাণ্ডাই, এক সের দুধ এবং এক্‌ টাকার ফল খাইতেন! এই বয়সে তাঁহার দৈর্ঘ্য ৬ ফিট ১ ইঞ্চি, ছাতির বেড় ৪৮ হইতে ৫০ ইঞ্চি, কোমর ৪২ ইঞ্চি, কব্জি ৮ ইঞ্চি, জানু ৩০ ইঞ্চি, পায়ের ডিম ১৮ ইঞ্চি, গলা ১৮৷৷০ ইঞ্চি এবং ওজন তিন মণ ২০ সের ছিল।

তাঁহার দুই জোড়া মুগুর আছে! এক জোড়ার প্রত্যেকটির ওজন ২৫ সের। অপর জোড়ার প্রত্যেকটীর ওজন ১ মণ ১০ সের। তিনি এই শেষোক্ত মুগুর জোড়াই ১৯৷২০ বৎসর বয়সে ভাঁজিতেন। গ্রীবা-দেশের পেশীসমূহ দৃঢ় করিবার জন্য তিনি একটী দুইমণ ওজনের পাথরের হাঁসুলি (Collar) গলায় পরিয়া একতলা দু'তলা উঠা নামা করিতেন। তিনি বলেন, তিনি যখন আপোষে পালোয়ানদিগের সহিত কুস্তী লড়েন তখন কেহই তাঁহার গ্রীবাদেশ ধরিতে পারে না, সুতরাং গ্রীবার যথোপযুক্ত ব্যায়ামও হয় না, গ্রীবার ব্যায়ামের জন্যই পাথরের হাঁসুলি পরিতে হয়। তাঁহাদের বাড়ীতে বহু পূর্ব্ব হইতেই একখানি বড় ভারী পাথর আছে, তাহার মধ্যস্থলে হাতলের মত একটী লৌহদণ্ড সংযুক্ত

আছে। যতীন্দ্র কুড়ি বৎসর বয়সে চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া লোহার হাতল ধরিয়া সেই পাথরটাকে টানিয়া নিজের বুকের উপর তুলিয়া লইতেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে গোবর ইউরোপীয় মল্লবীরদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য পুনরায় ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তখন তাঁহার বয়স ২০ বৎসর মাত্র। এখানে এই অল্পবয়স্ক বীর যুবকের বীরত্বকাহিনী নানা সংবাদপত্রে ঘোষিত হইতে থাকে। ইংলণ্ডের "Health and Strength" পত্রিকার সম্পাদক শতমুখে গোবরের প্রশংসা করিয়াছেন; উক্ত সংবাদপত্রের মতে গোবরের সামান্য মুগুরটী পর্য্যন্ত সাধারণ ইংরাজ ভূমি হইতে উত্তোলন করিতে অক্ষম।—"Gobar, for instance, who is now in England, swing clubs that no ordinary Englishman could lift." বিলাতের জনসমাজ ইঁহার অদ্ভুত মল্ল-কৌশল এবং দৈহিক শক্তি সন্দর্শনে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

৩০শে আগষ্ট গ্লাসগো নগরে ওলন্দাজ মল্লবীর জিমি ক্যাম্বেল সাহেবের সহিত প্রায় ৫০ মিনিট কুস্তী করিয়া গোবর তাঁহাকে পরাস্ত করেন। এবং স্কটিস চ্যাম্পিয়ানশিপ (Scottish Championship) লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বাঙ্গালী বীরের বীরত্ব-খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইয়া পড়ে। তৎপরে এই বৎসর ৩রা সেপ্টেম্বর তিনি এডিনবরা নগরে ওলিম্পিয়া নামক মল্ল-মঞ্চে অজেয় জিমি এসনের সহিত লড়িবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কোথায় বিংশতি বর্ষ বয়স্ক একজন বঙ্গীয় যুবক, আর কোথায় পৃথিবী-বিখ্যাত অজেয় বীর এসন্! এই অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়া দেখিবার জন্য ক্রীড়ামঞ্চ লোকে লোকারণ্য হইল। গোবর এসনের সহিত মল্ল-ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন, এসন্ তাঁহার সাধ্যমত গোবরকে

ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; এমন কি, সময় সময় কুস্তীর নিয়ম ভঙ্গ করিয়া নিষিদ্ধ আচরণ করিতেও ক্রটী করেন নাই, এই জন্য তাঁহাকে কয়েকবার সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। যাহা হউক, এসনের নিষিদ্ধ আচরণ সত্ত্বেও বাঙ্গালী বীর গোবর তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল চাপিয়া রাখিয়া দেন, তাহাতে ইংরাজ বীর হাঁপাইতে থাকেন! কিছুক্ষণ পরে এসন্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু গোবর তাঁহাকে ৩৯ মিনিটের চেষ্টায় এক আছাড় দেন, আর একবার আছাড় দিতে পারিলেই গোবর জয়ী হইবেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও যখন এসন্ নিষিদ্ধ কৌশল প্রয়োগ করিতে বিরত হইলেন না, তখন মধ্যস্থ লোকেরা তাঁহাকে আর লড়িতে না দিয়া গোবরকেই জয়ী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই কুস্তীতে যতীন্দ্রচরণ Champion of the United Kingdom (চ্যাম্পিয়ন অফ দি ইউনাইটেড কিংডম্) খ্যাতি লাভ করেন। এত অল্প বয়সে এই গৌরবলাভ খুব কম বীরের ভাগ্যেই ঘটে। তাঁহার পূর্ব্বে মাত্র ফরাসী বীর কার্পেন্টিয়ার ঐ বয়সে ইহা লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া গোবর ১৫০০ পাউণ্ড পুরস্কার ও সাধারণ জমা এবং টিকেট বিক্রয়ের শতকরা ৭০৲ পান।

সেখান হইতে যতীন্দ্র ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে গমন করেন। সেখানে বহু প্রথিতযশা ইউরোপীয় বীরের সহিত তাঁহাকে লড়িতে হইয়াছিল। এখানে জার্ম্মাণ দিগ্বিজয়ী মল্লবীর কার্ল সাপ্টের (Karl Saft) নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। গোবর তিনঘণ্টা পঁচিশ মিনিট কুস্তীর পর তাঁহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। প্যারিসে কুস্তী প্রদর্শনপূর্ব্বক মাসিক প্রায় ৭ হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন। প্যারিস হইতে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কুস্তীগীর গচের সহিত লড়িবার

জন্য আমেরিকা যাত্রা করেন, কিন্তু গচ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হওয়ায় গোবরের আশা পূর্ণ হয় নাই।

বিদেশ হইতে এইরূপে বিজয়-গৌরবে বিভূষিত হইয়া গোবর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে গোবর আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখানে বহু বিখ্যাত বিখ্যাত বীরের সহিত তাঁহাকে মল্লক্রীড়ায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট তিনি সানফ্রান্সিস্কো সহরে আড্ স্যান্টেলকে কুস্তী-যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া "Light Heavy-Weight Championship of the World"—খ্যাতি লাভ করেন। এইরূপে সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাল আমেরিকায় বাঙ্গালীর শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া গোবর ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে জন্মভূমির ক্রোড়ে ফিরিয়া আসেন।

দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতিকে শক্তি-সামর্থ্যে উপযুক্ত করিয়া তোলাই তাঁহার একান্ত প্রাণের বাসনা। তিনি বলেন,—"যাহাতে দেশের সুশিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যায়াম-চর্চ্চার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রৎ হয় তাহাই আমার ইচ্ছা। যাহাতে সুস্থ ও সবলদেহ যুবকেরা সমাজ ও দেশের সেবা করিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদিগকে উপযুক্ত করিয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য।"—তাঁহার এই শুভেচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি একটী ব্যায়াম-শালা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের বাড়ীর পুরাতন আখড়ায় এখনও বহু যুবক শরীর-চর্চ্চা করিয়া থাকেন।

দেশের ধনিসম্প্রদায় গোবরের এই সদেচ্ছার পৃষ্ঠপোষক হইলে তিনি যে অচিরেই সাফল্য লাভ করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভগবানের চরণে প্রার্থনা, যতীন্দ্র বাবু দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন করুন।

ভীম ভবানী

মানুষ ইচ্ছা করিলেই যে অসীম শারীরিক শক্তির অধিকারী হইতে পারে ভীম ভবানী তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। শৈশবের সেই রোগ-দুর্ব্বল শীর্ণশরীর ভবানী এক কালে যে এমন অমানুষিক বলশালী হইয়া স্বীয় শক্তিমত্তা প্রদর্শনে জনমণ্ডলীকে বিস্ময়াবিষ্ট করিবেন তাহা তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই।

তাঁহার প্রকৃত নাম **ভবানীচরণ সাহা**। তিনি ১২৯৮ সালে কলিকাতার বিডন ষ্ট্রীটস্থ সুপরিচিত সাহা বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ভবানীর পিতার নাম উপেন্দ্রনাথ সাহা, তিনিও শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। ভবানী পিতার মধ্যম পুত্র, তাঁহারা নয় সহোদর। শৈশবে ভবানী রুগ্ন ছিলেন; এমন কি, পনের যোল বৎসর পর্য্যন্ত সর্ব্বনাশিনী ম্যালেরিয়া তাঁহার চিরসঙ্গিনী ছিল। ম্যালেরিয়ার কবলে নিপতিত হইয়া তিনি দিন দিন অস্থিচর্ম্ম-সার হইয়া পড়েন। জীবনের সুখ-শান্তি, আনন্দ উল্লাস, অধরের হাসি, এবং দেহের লাবণ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবনকে তিনি দুর্ব্বিষহ বলিয়া মনে করিতে থাকেন।

একদিন তাঁহাদের পাড়ার একটী সমবয়স্ক বালকের সহিত কোনও একটা বিষয় লইয়া ভবানীর বচসা আরম্ভ হয়, সেই বচসা অবশেষে হাতাহাতি মারামারিতে পর্য্যবসিত হয়। দুর্ব্বল ভবানী বলিষ্ঠ প্রতিপক্ষের হস্তে প্রহার খাইয়াই অপমান-বিক্ষত হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু সেই অবমাননাই তাঁহার জীবনের মঙ্গলাশীর্ব্বাদে পরিণত হয়। ভবানী সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞা করেন, যেরূপেই হউক তাঁহাকে শক্তি অর্জ্জন করিয়া অপর দশজনের সমকক্ষ হইতে হইবে;—শক্তিহীন অকর্ম্মণ্য দেহ

ভীম ভবানী

—১৫২ পৃষ্ঠা

লইয়া বাঁচিয়া কি সুখ? ইহার পর হইতেই তিনি শক্তি-চর্চ্চার দিকে মনোযোগী হইলেন।

শক্তি-চর্চ্চা রীতিমত একটা গুরুতর সাধনা। দুই এক দিন একটু হস্তপদাদি সঞ্চালন করিলেই শরীর বলিষ্ঠ হয় না, নিয়মানুযায়ী কিছুদিন নিবিষ্ট মনে ব্যায়ামের অনুশীলন করিলে তবে সফলকাম হওয়া যায়। ভবানীও শক্তি অর্জ্জনে কায়মনপ্রাণ অর্পণ করিলেন।

তখন কলিকাতার মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীটে ৺ক্ষেত্রনাথ গুহ মহাশয়ের (মল্লবীর গোবরের জ্যাঠা মহাশয়) বাড়ীতে এক বিখ্যাত কুস্তীর 'আখড়া' ছিল। সে আখড়াটা যেমন তেমন নয়, ভারতের তৎকালীন প্রথিতযশা সমস্ত মল্লবীরই একদিন না একদিন সে আখড়ায় আসিয়া 'মাটী মাখিয়া গিয়াছে'। ভবানীচরণও যাইয়া সেই আখড়ায় ভর্ত্তি হইলেন। তখন গোবর বাবুও সেখানে কুস্তী শিখিতেন।

চারি বৎসর একান্ত আগ্রহ এবং মনোযোগের সঙ্গে ভবানী শারীর-সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন। সকলেই তাঁহার সুগঠিত বলিষ্ঠ শরীর দর্শনে বিস্মিত হইয়া গেল। কে বলিতে পারে যে, এই সেই চারি বৎসর পূর্ব্বের ম্যালেরিয়া-জীর্ণ ভবানীচরণ?

সেবার সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর রামমূর্ত্তি তাঁহার সার্কাসের দল লইয়া কলিকাতায় খেলা দেখাইতে আসেন। তখন ভবানীর বয়স ১৯ বৎসর। এই সময় ভবানী রামমূর্ত্তির খেলা দেখিতে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হন। এই পরিচয় ভবানীকে 'গায়ে পড়িয়া' করিতে হয় নাই! রাম-মূর্ত্তিই স্বয়ং ভবানীর অপূর্ব্ব বলিষ্ঠ অঙ্গসৌষ্ঠব এবং বীরমূর্ত্তি দর্শনে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন। এই আলাপেই বীরযুগলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। রামমূর্ত্তি তাঁহাকে স্বীয় সার্কাসের দলে ভর্ত্তি

করিয়া লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ভবানী সানন্দে তাহাতে সম্মতি দান করেন। গৃহে বিধবা জননী আছেন, তিনি জানিতে পারিলে পুত্রকে অমন বিপজ্জনক কার্যো ছাড়িয়া দিতে কিছুতেই সম্মত হইবেন না। অথচ ভবানী স্বীয় শারীরিক ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিবার এমন সুযোগও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন, কাজেই তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া রামমূর্ত্তির দলের সঙ্গে একেবারে রেঙ্গুণে চলিয়া গেলেন।

তাঁহারা সিঙ্গাপুর হইতে যবদ্বীপে উপস্থিত হইলে একজন ওলন্দাজ মল্লবীর রামমূর্ত্তির সঙ্গে কুস্তী লড়িতে চাহিলেন। রামমূর্ত্তি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবেন, এমন সময় ভবানী অতি বিনীত ভাবে তাঁহাকে বলিলেন,—আমি আপনার অধম শিষ্য, আগে আমার সঙ্গেই উনি লড়ুন, তারপর আপনার সঙ্গে। রামমূর্ত্তি ইহাতে আপত্তি করিলেন না। তিন মিনিট লড়িবার পরেই ওলন্দাজ বীর এই বাঙ্গালী যুবকের নিকট পরাস্ত হইলেন।

নানা কারণে ভবানীর বেশী দিন রামমূর্ত্তির সার্কাসের দলে থাকা হইল না। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া সুবিখ্যাত কে. বসাকের বিখ্যাত সার্কাসের দলে যোগদান করিলেন। তখন এই সার্কাসের দল সমগ্র এশিয়া মহাদেশ ভ্রমণ করিতেছিল। এই সার্কাসের দল যখন সাংহাই-এ উপস্থিত হইল, তখন একজন আমেরিকাবাসী পালোয়ান তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেন। সেই কুস্তীতে একহাজার ডলার বাজী রাখা হইয়াছিল। ভবানী সেই প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী বীরের নিকট হইতে সেই বাজীর টাকা আদায় করিয়া লন। এখানকার কনসাল্ ভবানীর শক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে বলিলেন,—"আমি নিজে আমার মোটর-গাড়ীখানা চালাইব, যদি ধরিয়া রাখিতে পার তবে সেখানা তোমার।"

ভবানী কৃতকার্য্য হইয়া সেই নূতন মিনার্ভা মোটর গাড়ীখানা পুরস্কার লাভ করিলেন।

জাপানের সম্রাট্ ভবানীর অমানুষিক শক্তি দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাড়ে সাতশত টাকা এবং একখানা সুবর্ণ পদক পুরস্কার দান করিয়াছিলেন।

ভবানী চলন্ত মোটর গাড়ী থামাইতে বড়ই পটু ছিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি এক সময়ে দুইখানা চলন্ত মোটর থামাইয়া আসিতে ছিলেন। ভরতপুরে তাঁহাকে তিন খানা মোটর গাড়ী একসঙ্গে থামাইতে হইয়াছিল। মহারাজ বাঙ্গালী বীরের শক্তি পরীক্ষার জন্যই এই আয়োজন করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া তিনখানা মোটর গাড়ী সারি সারি দাঁড়াইল, একখানাতে মহারাজ নিজে, দ্বিতীয় খানাতে মন্ত্রী, তৃতীয় খানাতে রেসিডেণ্ট সাহেব উঠিয়া বসিলেন। ভবানী গাড়াগুলির পেছনে মোটা দড়ি বাঁধিয়া দুই হাতে দুই গাছি ধরিলেন এবং অপর দড়ি গাছি কোমরের সঙ্গে জড়াইয়া বাঁধিয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তারপর তিনজনেই একসঙ্গে পুরাদমে মোটর চালাইয়া দিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ইঞ্জিন ভীষণ শব্দে পূর্ণ শক্তিতে চলিতেছে, অথচ গাড়ী এক তিলও নড়িতেছে না! মহারাজ বাঙ্গালী বীরের শক্তিদর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন। চতুর্দ্দিক্ বীরবরের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল।

ভীম ভবানী ক্রীড়া প্রদর্শনের জন্য একবার মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে নবাব সাহেব তাঁহার শক্তি পরীক্ষার জন্য একটী হাতী বুকের উপর লইতে আদেশ করেন। ভবানী ইতঃপূর্ব্বে রামমূর্ত্তির নিকট

হাতী বুকে লওয়ার অভ্যাস করিয়াছিলেন, কাজেই তিনি নির্ভয়ে নবাবের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। যে হাতীটাকে সে বার ভবানীকে বুকে লইতে হইয়াছিল তাহা সবেমাত্র অল্পদিন হয় বন হইতে ধরিয়া আনা হইয়াছে, সুতরাং সাধারণ হস্তী অপেক্ষা উহার ওজন অনেক বেশী। এত বড় এবং এত বেশী ওজনের হাতী ভবানী ইহার পূর্ব্বে আর কখনও বুকে লন নাই। ভবানী যখন সেই বন্য হস্তীটাকে বুকের উপর অনায়াসে চালাইয়া দিয়া সুস্থ শরীরে ও প্রফুল্ল বদনে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে দণ্ডায়মান্ হইলেন, তখন চতুর্দ্দিকে করতালি এবং জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল।

ভবানী কিরূপে **ভীম ভবানী** আখ্যা লাভ করেন সে কথা এখনও বলা হয় নাই। একবার কলিকাতার স্বদেশী মেলায় ভবানী তাঁহার ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেই মেলায় ৺ সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ বিপিনচন্দ্র পাল ৺, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি দেশ-নেতৃগণ উপস্থিত ছিলেন; সকলেই ভবানীর অদ্ভুত শারীরিক শক্তি দর্শনে বিস্মিত হইলেন। তখনই রসরাজ ৺ অমৃতলাল তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি দেখছি কলিকালের ভীম। সে যুগের ভীম এমনি এক জন বীর পুরুষ ছিলেন। আজ থেকে তুমি শুধু ভবানী নও,—**ভীম ভবানী**।" তদবধি ভবানীচরণ সাধারণের নিকট ভীম ভবানী নামে পরিচিত হইলেন।

ভবানীর কতকগুলি অমানুষিক শক্তির পরিচায়ক ক্রীড়ার কথা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি সর্ব্বাঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া চক্ষের নিমেষে তাহা সামান্য সূত্রখণ্ডের মত পটাপট্ ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। পাঁচ মণ ওজনের বারবেল অতি সহজ ভাবে ঘুরাইতেন। তাঁহার

বুকের উপরিস্থিত চল্লিশ মণ ওজনের প্রস্তরখণ্ডের উপর ২৫।৩০ জন লোক বসিয়া গান বাজনা করিত। সিমেণ্টের পিপার উপর ৭।৮ জন লোক বসাইয়া ভবানীচরণ উহার একধার দাঁতে কামড়াইয়া ধরিয়া শূন্যে ঘুরাইতেন। ভবানীর বক্ষ এবং উরুর উপর দিয়া এক সময়ে পঞ্চাশ জন লোক পূর্ণ দুইখানি গরুর গাড়ী সবেগে চলিয়া যাইত। মোটর ধরিয়া রাখিবার এবং হাতী বুকে লওয়ার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ভীম ভবানী জীবনে সর্ব্বশুদ্ধ ১২০ খানি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মোটর গাড়ী, আংটী, নগদ টাকা প্রভৃতি বহু সামগ্রী পাইয়াছিলেন।

শারীরিক শক্তির তুলনায় ভবানীর দৈনিক আহারও সামান্য ছিল না। তিনি প্রাতে ২০০ বাদামের সরবৎ এক ছটাক গব্যঘৃত; দ্বিপ্রহরে সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্য; বৈকালে ২॥০ টাকার ফল, ৫০টা বাদামের সরবৎ ও এক সের মাংস; রাত্রে আধসের আটার রুটি ও তিন পোয়া মাংস আহার করিতেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে ভীম ভবানী আগাসীর সার্কাসে সাপ্তাহিক দেড়শত টাকা বেতনে ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেন।

বাংলার এই ভীম ১৩২৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

কলির অর্জ্জুন মহেন্দ্রনাথ

বাংলার সুবিখ্যাত ব্যায়াম-বীর মহেন্দ্রনাথ মজুমদার ১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার নয়না গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মহেন্দ্রনাথ যখন বজ্রযোগিণী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের চতুর্থশ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন সেই সময় তাঁহার পিতা ভগবানচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পরলোক গমন করায় অর্থাভাবে তিনি সেই স্থানেই পড়াশুনা শেষ করিয়া চাকুরীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইতে বাধ্য হন। কিন্তু কিছুদিন চেষ্টা করিয়াও যখন কোথাও কিছু জুটিল না তখন মহেন্দ্রনাথ শারীর চর্চ্চায় মনোযোগী হইলেন। ভগবান্ তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিলেন না।

কিছুদিন নানাস্থানে ব্যায়াম-শিক্ষকের কার্য্য করিয়া মহেন্দ্রনাথ সুবিখ্যাত এবেল সাহেবের সার্কাসের দলে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বেশী দিন পরের অধীন চাকুরী করা স্বাধীনচেতা মহেন্দ্রনাথের পক্ষে ভাল লাগিল না, তিনি নিজেই একটী ক্ষুদ্র সার্কাসের দল গঠন করিয়া বাংলা দেশের সর্ব্বত্র ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সার্কাসের দল লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মহেন্দ্রনাথ একবার দিনাজপুর জেলার পার্ব্বতীপুর রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী এক মেলায় খেলা দেখাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় জমীদারের হাতীর মাহুত প্রত্যহ মহেন্দ্রনাথের তাঁবুর নিকট দিয়া একটা পাগলা হাতীকে নদীতে স্নান করাইবার জন্য লইয়া যাইত। যাইবার সময় হাতীটা প্রায়ই তাঁবুর খুঁটি ইত্যাদি তুলিয়া বা দড়ি ছিঁড়িয়া উৎপাত এবং অনিষ্ট
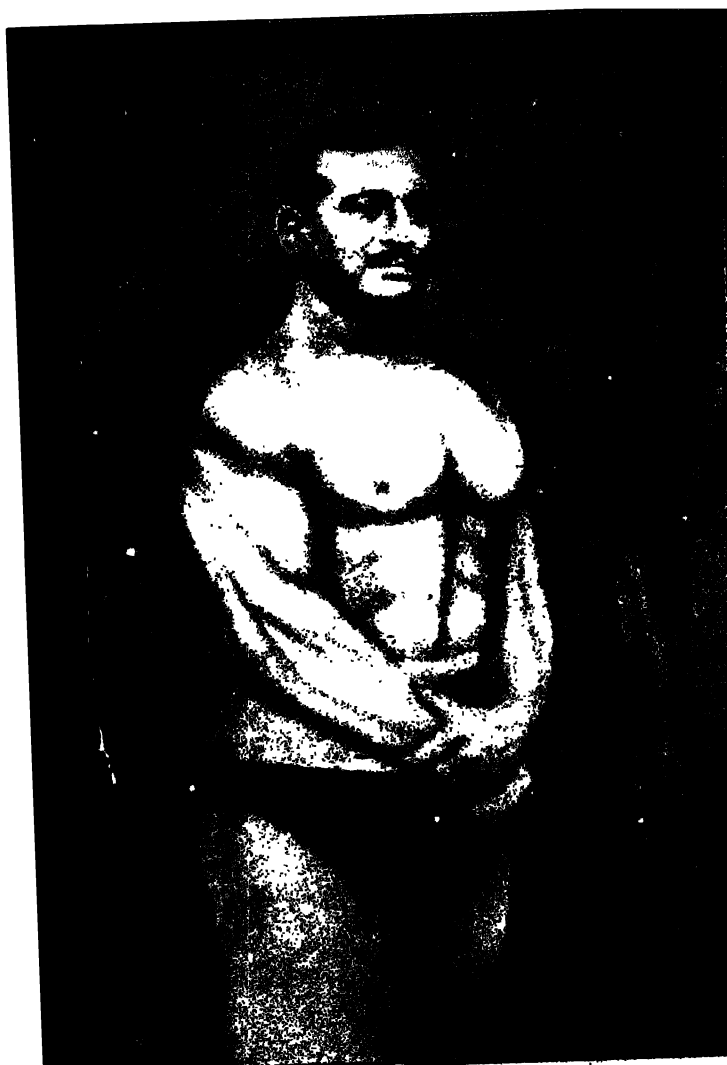
করিত। মহেন্দ্রনাথ মাহুতকে বলা সত্ত্বেও সে তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিত না। আর একদিন পাগলা হাতীটা অন্যান্য দিনের মত তাঁবুর অনিষ্ট করিতে উদ্যত হওয়ায় মহেন্দ্রনাথ উহাকে বাধা দিতে আসিলেন; বাধা পাইয়া হাতীটা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বীর মহেন্দ্রনাথ তাহাতে বিন্দুমাত্রও ভীত না হইয়া একটা মোটা বাঁশ লইয়া হাতীটাকে ভীষণ ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। হাতীটা তখন ব্যাপার গুরুতর মনে করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল।

মহেন্দ্রনাথ পরেশনাথকে খুব ভক্তি করিতেন। একবার রামমূর্ত্তি পরেশনাথের সহিত কথা প্রসঙ্গে বাঙ্গালীর শারীরিক শক্তির প্রতি একটু ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, "শারীরিক ক্ষমতার নূতন কিছু পরিচয় দেওয়া বাঙ্গালী বাবুর পক্ষে অসম্ভব।" স্বজাতির প্রতি এই শ্লেষ বীর পরেশনাথের হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রদান করিল। তিনি মহেন্দ্র নাথকে সমস্ত কথা বলিলেন। মহেন্দ্রনাথ মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন, নূতন একটা কিছু দেখাইতেই হইবে। কিন্তু কি দেখাইবেন? একদিন পথে একটা বিরাট রোলার পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া মহেন্দ্রনাথের মনে হইল, এই রোলারটাকে বুকের উপর দিয়া চালাইতে পারা গেলে একটা নূতন কিছু করা হয় বটে। উহার ওজন ছিল ১৬২ মণ! সেই রাত্রেই তিনি উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন; পরীক্ষার ফল আশানুরূপই হইল। কয়েক দিন পরেই বিরাট জনতার সম্মুখে রোলারটা বুকে লইয়া তিনি ক্রীড়া প্রদর্শন করিলেন। সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। রামমূর্ত্তি তখন হাতী বুকে লইতেন, কিন্তু এই রোলারটার ওজন হাতীর ওজনের অপেক্ষা ঢের বেশী, রামমূর্ত্তির মাথা হেঁট হইয়া গেল।

মহেন্দ্রনাথ আর একটী খেলা খেলিতেন। তাঁহার বুকের উপর কুড়িমণ ওজনের একখানা পাথর চাপাইয়া দিয়া সেই পাথরের উপর একটী দণ্ডের শীর্ষে রাধাচক্রের উপর চার পাঁচ জন লোক কিছুক্ষণ ঘুরিতে থাকিত। তারপর রাধাচক্রটা নামাইয়া লইলে মহেন্দ্রনাথ স্বয়ং দুই হস্তে পাথরটা এক পার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িতেন।

ভার উত্তোলনে মহেন্দ্রনাথ অসীম শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পাঁচ মণ ওজনের লোহার গোলা তিনি দুই হাতে মাথার উপর শূন্যে তুলিয়া ধরিতেন, তারপর, উহা মাথার উপর দিয়া পাঁচ হাত দূরে পশ্চাৎদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। এক এক মণ ওজনের এক একটী গোলা তিনি অনায়াসে এক হাতে এগারো বারো হাত দূরে নিক্ষেপ করিতেন এবং প্রায় চার পাঁচ হাত উর্দ্ধে ছুঁড়িয়া দিতেন।

তিনি এক সঙ্গে দুই খানি চলন্ত মোটরগাড়ী ধরিয়া রাখিতে পারিতেন। 'মোটর জাম্প' (Motor Jump) মহেন্দ্রনাথের একটা সম্পূর্ণ নূতন দুঃসাহসিক ক্রীড়া, পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত আর কেহ এ খেলা দেখাইতে সমর্থ হয় নাই। একখানি চলন্ত মোটর গাড়ী লইয়া তিনি প্রায় ২১ ফুট উর্দ্ধে ৪০ ফুট ফাঁকা যায়গা এক লাফে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেন। তাঁহার এই অদ্ভুত ও দুঃসাহসিক কার্য্য দেখিয়া সমাগত দর্শক মণ্ডলী বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকিত।

মহেন্দ্রনাথ কেন **"কলির অর্জ্জুন"** নামে অভিহিত হইতেন সে কথা এখন বলিব। ধনুর্ব্বিদ্যায় তিনি অদ্বিতীয় পারদর্শী ছিলেন। আমরা মহাভারতে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের ধনুর্ব্বিদ্যার কথা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া উড়াইয়া দেই। কিন্তু সে যুগের অর্জ্জুনের ধনুর্ব্বিদ্যার কথা যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে তাহা মহেন্দ্রনাথের ধনুর্ব্বিদ্যার অপূর্ব্ব কৌশল

দর্শন করিয়াই বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। তাঁহার 'সপ্ততাল ভেদ', 'শব্দ ভেদী বাণ' প্রভৃতি তীরের খেলা বাস্তবিকই বিস্ময়োৎপাদক। মহেন্দ্রনাথ স্বীয় সাধনার বলে ধনুর্ব্বিদ্যা এই ভাবে আয়ত্ত করিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। একবার মান্দ্রাজ অঞ্চলের একটী তীরন্দাজের কতকগুলি তীরের খেলা দেখিয়া মহেন্দ্রনাথের উহা শিক্ষা করিবার একান্ত আগ্রহ জন্মে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি সেই লোকটীর নিকট যাইয়া তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু মান্দ্রাজীটী বাঙ্গালীকে তাহার বিদ্যা শিক্ষা দিয়া স্বীয় ব্যবসায় নষ্ট করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় মহেন্দ্রনাথ দুঃখিত হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; কিন্তু তিনি হতাশ হন নাই, আত্মশক্তির উপর তাঁহার একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং তিনি জানিতেন যে, একাগ্র চিত্তে কোনও কিছু লাভ করিবার জন্য সাধনা করিলে তাহাতে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। একলব্যের কথা মনে পড়িল। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া কাহারও সাহায্য ব্যতীত শর-সাধনায় ব্রতী হইলেন। সেই সাধনার ফলে কালে তিনি অদ্বিতীয় ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ হইয়া দাঁড়াইলেন। লোকে তাঁহার তীর চালনায় অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়া তাঁহাকে **"কলির অর্জ্জুন"** আখ্যা প্রদান করিল।

বাংলার ছাত্র দিগকে শক্তিমান্ করিয়া তোলার একটা প্রবল আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল মহেন্দ্রনাথের। তিনি যেখানেই ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে যাইতেন সেখানেই ছাত্রদিগের ব্যায়াম-চর্চ্চায় উৎসাহ দান করিতেন। এই জন্য তিনি অনেক সময় পদক বা নগদ টাকাও ছাত্রদিগকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিতেন।

তিনি বলিতেন, বাংলার যুবকেরা যদি পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া অবশিষ্ট জীবন সংযমী হইয়া চলে তবে বাঙ্গালীর দুর্নাম

দূরীভূত হইবে, তাহারা একটা অমিতবলশালী জাতি হইয়া উঠিবে। দেশীয় ব্যায়ামই আমাদের পক্ষে অতি উত্তম। বাঙ্গালী তাহার সাধারণ খাদ্য খাইয়াই নিয়মিত ব্যায়াম করিলে যথেষ্ট শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে,—কিন্তু তাহাকে মিতাচারী হইতে হইবে।"

১৩৩৭ সালে মহেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করিয়াছেন।

বাংলার ছাত্র-সমাজকে ভগবান্ সুমতি প্রদান করুন। তাহাদেরর প্রাণে যেন মহেন্দ্রনাথের উপদেশ পালন করিয়া, বঙ্গজননীর মুখ উজ্জ্বল করিবার একান্ত বাসনা জাগিয়া উঠে।

কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস

—পৃষ্ঠা ১৬
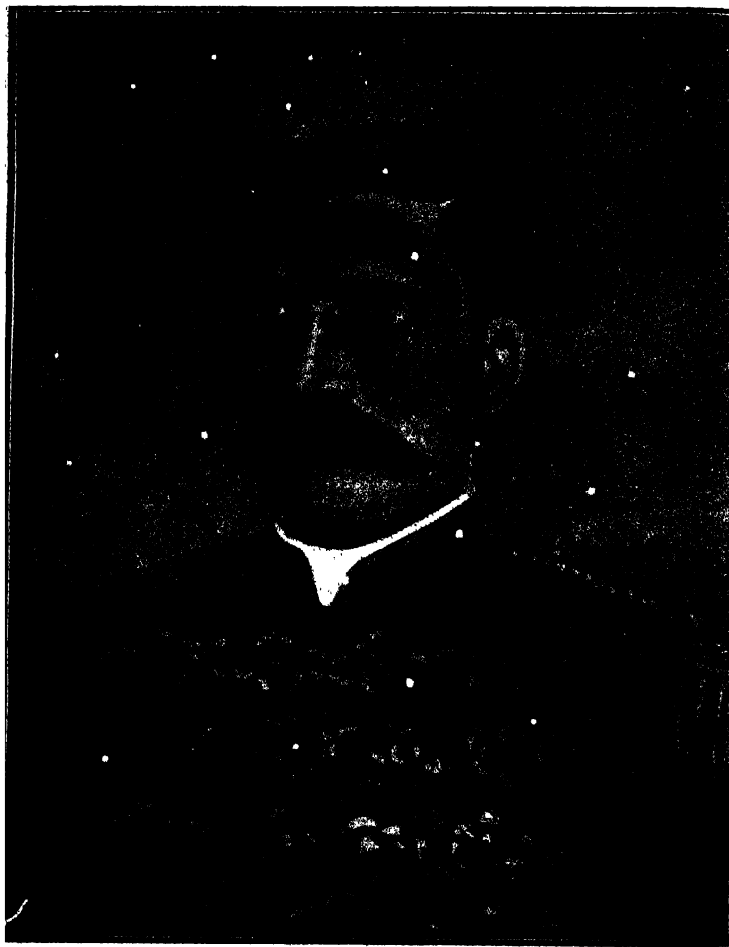
কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার নাথপুর নামক একটী গ্রামে সম্ভ্রান্ত বিশ্বাস-বংশে সুরেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস। ইচ্ছামতীর তীরে শান্তস্নিগ্ধছায়াচ্ছন্ন পল্লীজননীর নিভৃত নিকেতনে যে শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, একদিন তাঁহার রণনিনাদে, বীর্য্যমত্তায়, সাহসে ও অসিঘূর্ণনে সুদূর ব্রেজিল-রাজ্যও বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিল।

বালকের বিকাশোন্মুখ জীবনের কার্য্য-ধারা হইতেই তাঁহার গৌরব-দীপ্ত ভবিষ্যজ্জীবনের একটা ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। যে বালক একদিন বড় হইবে বাল্যকালেই তাহার বৃত্তিসমূহ স্ফুরিত হইতে থাকে। সুরেশচন্দ্রও তাঁহার সুকুমার শৈশবজীবনে যে সাহস, অকুতোভয়তা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তদ্দর্শনে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, এই বালক কালে একজন বীর বলিয়া খ্যাতিলাভে সমর্থ হইবে। সুরেশচন্দ্র লেখাপড়ার প্রতি মোটেই মনোযোগী ছিলেন না, কিন্তু তিনি ভ্রমণ ও বীরত্বকাহিনী শ্রবণে ও দুঃসাহসিক কার্য্য সম্পাদনে খুবই আনন্দ উপভোগ করিতেন। যেখানেই বীরত্ব-কাহিনীর আলোচনা হইত বালক সুরেশ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই বীরত্বগাথা শ্রবণ করিতেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহার মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। উচ্চ বৃক্ষচূড়ায় আরোহণ করিয়া পক্ষিশাবক আহরণ, নদীতে সন্তরণ, দাঁড় টানা, মাছধরা, কাহারও উদ্যানের ফলমূল অপহরণ, গভীর অন্ধকার রাত্রিতে বাজী রাখিয়া দূরবর্ত্তী স্থান হইতে কোনও দ্রব্য

আনয়ন, পক্ষিশিকার, গর্ত্ত খুঁড়িয়া শৃগালশাবক বাহির করা,—এই সমুদয় দুর্ব্বৃত্তজনোচিত কার্য্যসাধনে বালক অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিতেন। তাঁহার আর একটী প্রিয়কার্য্য ছিল সতরঞ্চ খেলা; লোকাভাবে তিনি একাকীই উভয়পক্ষীয় গুটিকা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া উহা পরিচালনা করিতেন। সুরেশচন্দ্রের একটী দল ছিল, সহচরেরা তাঁহার আদেশ ভয়ে হউক, ভালবাসায় হউক, নতশিরে পালন করিত। মুকুন্দরাম-বর্ণিত ব্যাধ-বালক কালকেতু 'শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল', সুরেশচন্দ্রও তদ্রূপ সমুদয় বালকের নেতা ছিলেন। এই বালকদিগকে লইয়া সুরেশ সময় সময় কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় করিতেন। বালক নেপোলিয়ন, যেমন বরফের দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বরফখণ্ড নিক্ষেপপূর্ব্বক গোলাবর্ষণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতেন, সুরেশচন্দ্রও তদ্রূপ টিনের তরবারি, বংশদণ্ড, বৃক্ষশাখা, উপলখণ্ড এবং নবকর্ষিত ক্ষেত্রের মৃত্তিকা-রাশি লইয়া রণাভিনয় করিতেন।

সুরেশচন্দ্র তখন একাদশ বৎসর বয়সের বালক। একটি বৃক্ষে পক্ষিশাবক হইয়াছে দেখিয়া তিনি আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, শাবক পাড়িবার জন্য বৃক্ষে আরোহণ করিয়া পক্ষিনীড়ের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময় ভীষণ গর্জ্জন শুনিয়া নীচের দিকে চাহিয়া দেখেন, এক ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প কোটর হইতে বহির্গত হইয়া ফণা বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে। সর্পের ক্রোধদীপ্ত নয়ন হইতে যেন অনলশিখা নির্গত হইতেছিল। অবতরণ করিয়া পলায়ন করিতে গেলে তিনি সর্পের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবেন না, এবং অত উর্দ্ধ হইতে লম্ফ দিলেও মৃত্যু অনিবার্য্য! বালক আসন্ন মৃত্যু দর্শনে ভীত হইলেন না; কর্ত্তব্য স্থির করিয়া শাখার উপর উপবিষ্ট রহিলেন। উদ্যতফণ সর্প

লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে নিকটে আসিয়া যেমন তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল, অমনি বালক দৃঢ়মুষ্টিতে সর্পের মস্তক চাপিয়া ধরিলেন। সর্প তখন লাঙ্গুলদ্বারা সুরেশচন্দ্রের হস্ত বেষ্টন করিতে আরম্ভ করিল। সুরেশচন্দ্র বামহস্তে পকেট হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরি বাহির করিয়া দন্তদ্বারা খুলিয়া ফেলিয়া সর্পের গ্রীবাদেশ কর্ত্তনপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন।

পূর্ব্বেই পিতা গিরিশচন্দ্র পুত্রকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া ভবানীপুরস্থ লণ্ডন মিশন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতার বদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে সুরেশচন্দ্রের ভাল লাগিত না। জন্মভূমির বিস্তৃত মাঠ, নদীর তীর, উন্মুক্ত বাতাস, বিহঙ্গ-কল-কূজিত বনভূমি, পক্ক ফলভারাবনত বৃক্ষরাজিপরিপূর্ণ উদ্যান সুরেশচন্দ্রকে যেন সমস্বরে আহ্বান করিত; সুরেশচন্দ্র ছুটি পাইলেই নাথপুরে আসিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতেন। কি একটা অবকাশ উপলক্ষ সুরেশচন্দ্র সেবার নাথপুরে আসিয়াছেন। ছিপ দিয়া মাছ ধরা তাঁহার একটা প্রিয়কার্য্য ছিল। সেদিন তাঁহারা তিন বন্ধু মিলিয়া গ্রামান্তর হইতে মাছ ধরিয়া ছিপ স্কন্ধে গৃহাভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। তাঁহারা একটা মাঠের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইলেন, একটা বন্য বরাহ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, একদল কুকুর লইয়া কয়েকজন শিকারী সাহেব গুলি নিক্ষেপ করিতে করিতে বরাহটীকে তাড়া করিতেছেন। সুরেশ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেখানে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গিদ্বয় নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িল। নিকটে কোনও বৃক্ষ নাই যে, তাহাতে আরোহণ করিয়া এই আসন্ন বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। সুরেশচন্দ্রের একান্ত ইচ্ছা যে, তিনি

বরাহ-শিকার দর্শন করেন, তাই তিনি সঙ্গিদ্বয়কে পলাইতে ইঙ্গিত করিয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। আহত ক্রুদ্ধ বন্যবরাহ অতীব ভীষণ, উহারা যাহাকে সম্মুখে পায় তাহারই উপর আপতিত হইয়া দন্তাঘাতে তাহার প্রাণবিনাশ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। শিকারী সাহেবগণ চীৎকার করিয়া সুরেশচন্দ্রকে পলায়ন করিতে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু বীর বালক নির্ভীক চিত্তে তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রক্তাক্তকলেবর ক্রোধ-কণ্টকিতদেহ বরাহ বজ্র-নির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া সুরেশের উপর নিপতিত হইল। বালক অমনি দৃঢ়মুষ্টিতে ছিপ ধরিয়া বরাহের মস্তকে আঘাত করিলেন, বরাহ ঘূর্ণিত হইয়া পড়িয়া গেল। বালকের পুনঃ পুনঃ আঘাতে আর বরাহ প্রতি আক্রমণের অবসর পাইল না। ইত্যবসরে শিকারীদিগের কুকুরের দল আসিয়া বরাহটাকে আক্রমণ করিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যে সাহেবেরাও আসিয়া পড়িলেন, সুতরাং বরাহ আর নিস্তার পাইল না, বন্দুকের গুলির আঘাতে সেই স্থানে পঞ্চত্বলাভ করিল। সাহেবেরা অদূরবর্ত্তী গ্রামের নীলকুঠির কর্ম্মচারী। ইংরাজ জাতির একটা বিশেষ গুণ এই যে, তাহারা বীরত্বের আদর করিতে জানে। বালক সুরেশচন্দ্রের এই নির্ভীকতায় সাহেবেরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া তাঁহার উপর অজস্র প্রশংসাবাদ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই বরাহ-শিকার হইতেই তাঁহার ভাবী উজ্জ্বল গৌরবময় জীবনের সূচনা হইল।

তিনি প্রায়ই নাথপুরের নীলকুঠীতে যাতায়াত করিতে করিতে ক্রমশঃ সাহেব ও মেমদিগের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন। কুঠীর অধ্যক্ষ সাহেবের মেম সুরেশচন্দ্রকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন, সুরেশও মেমকে মায়ের মত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। এই কুঠীতে যাতায়াতে

সুরেশচন্দ্র ইংরাজী কথোপকথনে সুদক্ষ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিক দিন তিনি এই সৌভাগ্য ভোগ করিতে পারিলেন না; অল্পদিন পরেই তাঁহাকে বালিগঞ্জে ফিরিতে হইল।

সুরেশচন্দ্র একদিন সঙ্গীদিগকে লইয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। মাঠে দুই জন ইংরাজ যুবক তাঁহাদিগকে 'নেটিভ', 'নিগার', 'ব্রুট' প্রভৃতি নীচজনোচিত ভাষায় বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তিনি প্রথমতঃ কিছু বলিলেন না, কিন্তু যখন দেখিলেন, ইংরাজদ্বয় নিবৃত্ত না হইয়া ক্রমশঃ বিদ্রূপের মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছে, তখন আর তাঁহার সহ্য হইল না; তিনিও যাহা মুখে আসিল তাহা বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। তারপর ঘুষাঘুষি আরম্ভ হইল। কিন্তু সুরেশের বজ্রমুষ্টির আঘাত সহ্য করিয়া ইংরেজ যুবকদ্বয় বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, রক্তাক্তশরীরে ভূমিসাৎ হইল।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুরেশচন্দ্রের দুর্দ্দমনীয়তা প্রশমিত না হইয়া আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি লণ্ডন মিশন স্কুলের ছাত্র বটে, কিন্তু মাসের অধিকাংশ দিনই স্কুলে যাইতেন না, যেদিন যাইতেন সেদিনই শিক্ষকেরা তাঁহার দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া উঠিতেন,—সহপাঠীরা প্রমাদ গণিত। সুরেশচন্দ্র মস্তিষ্ক চালনা অপেক্ষা শরীর চালনাই বেশী ভাল বাসিতেন এবং তাহাতেই তাঁহার তৃপ্তি সাধিত হইত। তাঁহার মাতাপিতা এবং খুল্লতাত তাঁহার এই উচ্ছৃঙ্খলতায় বড়ই মনঃপীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্র পুত্রকে সৎপথে আনিবার জন্য তিরস্কার এবং অবশেষে প্রহার পর্য্যন্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিরস্কৃত ও প্রহৃত হইয়া তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া খ্রীষ্টান বন্ধুদিগের গৃহে অবস্থান এবং তাহাদের সহিত আহার-বিহার

করিতেন, এইরূপে ক্রমশঃ তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রতি অন্তরিকতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরম বৈষ্ণববংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার এই যবনোচিত ব্যবহারে পিতা গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া একদিন সুরেশচন্দ্রকে ভীষণভাবে প্রহারপূর্ব্বক বলিয়া দিলেন, যদি তিনি খ্রীষ্টানদিগের সংস্রব পরিত্যাগ না করেন, তবে তিনি তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিবেন। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রয়াসী স্বেচ্ছা-পরতন্ত্র বালক এই তাড়নায় ক্রুদ্ধ হইয়া মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন এমন কি হিন্দু-সমাজের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ভাগ্যনির্দ্দিষ্ট পথাবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। লণ্ডন মিশন কলেজের অধ্যক্ষ আষ্টন সাহেব সুরেশকে তাঁহার নির্ভীকতার জন্য সমধিক স্নেহ করিতেন। সুরেশ তাঁহার নিকট গমন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর। পিতা পুত্রের এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ-সংবাদ শ্রবণমাত্র ক্রুদ্ধ ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিলেন, স্নেহময়ী জননী কাঁদিয়া বুক ভাসাইলেন। আষ্টন সাহেব সুরেশচন্দ্রের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পরের গলগ্রহ হইয়া থাকা তাঁহার মোটেই ভাল লাগিল না। তিনি স্বীয় জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত একটী চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্প বয়স এবং সামান্য শিক্ষা তাঁহার কর্ম্মপ্রাপ্তির পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হইল। আষ্টন সাহেবের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি ইচ্ছামত লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া অনায়াসে স্বীয় জীবিকার্জ্জনের পথ সুগম করিয়া লইতে পারিতেন কিন্তু লেখাপড়া তাঁহার মোটেই ভাল লাগিল না। তিনি আফিসে আফিসে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া চাকরীর সন্ধান করিতে লাগিলেন, তাঁহার দুর্গতির একশেষ হইল, কিন্তু চাকরী জুটিল না। খ্রীষ্টান মিশনারীরা এদেশীয়

দিগকে খ্রীষ্টান করিবার সময় নানা প্রলোভন দেখায়, এমন কি, অর্দ্ধ রাজ্য ও রাজকন্যা হাতে হাতে পাওয়াইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্ত করিয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যোদ্ধার হইয়া গেলে যাহার সর্ব্বনাশ করিল সে দুই বেলা দুই মুষ্টি পেট ভরিয়া খাইতে পারিতেছে কিনা তাহা দেখিবারও বড় একটা অবসর পায় না। সুরেশচন্দ্রের অবস্থাও তাহাই হইল। তথাপি তিনি হৃদয়ের বল এবং আত্মপ্রত্যয় হারাইলেন না। অবশেষে স্পেন্‌সেস্ হোটেলে স্বল্প বেতনে একটা কর্ম্ম জুটিল। এইবার তাঁহার দাঁড়াইবার একটু স্থান হইল। এই হোটেলে সাহেব-মেমদিগের মধ্যে সর্ব্বদা থাকিয়া তিনি ইংরাজদিগের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকটা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিলেন ও বেশ দ্রুত ইংরাজীতে কথা কহিতে শিখিলেন। ইহা তাঁহার ভাবী জীবনে বিশেষ উপকারে আসিয়াছিল।

স্পেন্‌সেস্ হোটেলে কর্ম্ম করিবার সময় তাঁহাকে স্বদেশ হইতে নবাগত সাহেবদিগকে হোটেলে লইয়া আসিবার জন্য জাহাজ-ঘাটে যাইতে হইত। এইরূপে যাওয়া-আসা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় আর একটা অভিনব আকাঙ্ক্ষায় মাতিয়া উঠিল। বিলাত-যাত্রার জন্য তিনি উৎসুক হইলেন। কিন্তু অর্থ কোথায়? তাঁহার ন্যায় সহায়-সম্বল বিহীন নিঃস্ব দরিদ্রের পক্ষে বিলাত-যাত্রার কল্পনা স্বপ্নমাত্র! যখন তিনি দেখিলেন যে, বিলাত-যাত্রা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, তখন তিনি রেঙ্গুণে যাইয়া সমুদ্র-যাত্রার সাধ মিটাইবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার নিকট যে অর্থ ছিল, তদ্দ্বারা রেঙ্গুণ-যাত্রা অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারিবে। অবশেষে একদিন সত্য সত্যই তিনি রেঙ্গুণ-যাত্রা করিলেন। রেঙ্গুণে অবতরণ করিয়া জনৈক পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহার

খুবই সুবিধা হইল। বন্ধুর বাসাতেই অবস্থান করিয়া তিনি চাকরীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

রেঙ্গুণ তখন নিরাপদ্ স্থান ছিল না। পথে ঘাটে দিবা দ্বিপ্রহরে দস্যুতস্করেরা পথিকের প্রাণসংহার করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। একদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সুরেশচন্দ্র ইরাবতী নদীতে দাঁড় টানিয়া শ্রান্তদেহে বাসায় ফিরিতেছিলেন। তাঁহার সহিত একটী রুল ব্যতীত আর কোনও অস্ত্রই ছিল না। সহসা একটা গলির মধ্যে দুইজন মগদস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সুরেশ তৎক্ষণাৎ একজনের মস্তকে রুল দিয়া এমন দারুণ প্রহার করিলেন যে, মগ সেই আঘাতেই ঘুরিয়া পড়িয়া ধরাশায়ী হইল। তখন অপর সঙ্গী মগটা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল, এই আক্রমণের ফলে উভয়েই ভূশায়ী হইয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ করিল। অমিতবলশালী মগের আক্রমণে চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। এমন সময় সৌভাগ্য বশতঃ একদল বরযাত্রী সেই পথে আসিয়া পড়ায় মগেরা প্রস্থান করিল।

রেঙ্গুণে অবস্থান-কালে সুরেশচন্দ্র একদিন একটী রমণীকে গৃহদাহ হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক তাহাকে আসন্ন মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

রেঙ্গুণে কিছুদিন কাটাইয়াও তিনি কোনও চাকরী জুটাইতে পারিলেন না। রেঙ্গুণের মোহ তাঁহার ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি অন্যত্র চাকরীর সন্ধান করিতে মনস্থ করিয়া একদিন মান্দ্রাজ যাত্রা করিলেন। মান্দ্রাজে আসিয়া তাঁহার দুর্দ্দশার সীমা রহিল না, এখানে কোনও পরিচিত লোক নাই যে, তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইবেন। একটা জঘন্য পল্লীতে শৃগাল-কুক্কুরাদির বাসেরও অযোগ্য একটা ঘর ভাড়া লইয়া তিনি চাকরীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তামিল-তেলুগুর

রাজ্যে কে তাঁহাকে দয়া করিয়া চাকরী দিবে? তাঁহার হাতে যে কয়টী টাকা ছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া সামান্য কয়েকটী আনায় পর্য্যবসিত হইল। তাঁহার অনাহারক্লিষ্ট মুখ ও শতছিদ্রবিশিষ্ট মলিন পরিচ্ছদ কাহারও দয়া আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইল, দেশে ফিরিলে হয় ত দুই বেলা দুই মুষ্টি আহার যে কোন উপায়ে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। কিন্তু দেশে ফিরিবার কথা ত দূরে থাকুক, একবেলা আহারের উপযোগী পয়সা পর্য্যন্ত তাঁহার হাতে নাই। তিনি দারিদ্র্যের তাড়নায় উন্মাদের মত হইয়া সাগর-তীরে ভ্রমণ করিতেন, সময় সময় সাগর-জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু ভাগ্যদেবী যে তাঁহার জন্য বিজয়-মুকুট সযত্নে রক্ষা করিতেছেন, সমুদ্রে জীবন বিসর্জ্জন দিলে সে গৌরব-কিরীট ধারণ করিবে কে? সহসা এক পাদ্রীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। পাদ্রী তাঁহার দুরবস্থা দর্শন করিয়া স্বীয় গৃহে তাঁহাকে একটী চাকরী করিয়া দিলেন। কিছুদিন চাকরী করিয়া কলিকাতায় ফিরিবার উপযুক্ত অর্থ সঞ্চিত হইলে তিনি পাদ্রী সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া এবারও আষ্টন সাহেবের আশ্রয়ে লণ্ডন মিশন স্কুলের বোর্ডিংএ তিনি আহার ও বাসস্থান পাইলেন। এই সময় তিনি মধ্যে মধ্যে জননীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, পুত্রবৎসলা জননী সন্তানের ক্লিষ্ট মুখ দর্শন করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না, তিনি স্বামীর অজ্ঞাতসারে পুত্রকে দুই একটী করিয়া টাকা দিয়া সাহায্য করিতেন। বিলাত-যাত্রার জন্য তাঁহার মন আবার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, তিনি সুযোগের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এবার সত্য সত্যই তাঁহার

ভাগ্যবিধাতা প্রসন্ন হইলেন। জেটিতে যাতায়াত করিতে করিতে বি, এস্, এন্, কোম্পানীর একখানি বিলাতগামী জাহাজের অধ্যক্ষের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। ক্রমে এই আলাপ-পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ হইল যে, সাহেব তাঁহার বিলাত-যাত্রার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে উক্ত জাহাজের সহকারী ষ্টুয়ার্ডের পদে নিযুক্ত করিয়া বিলাতগমনের পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে জাহাজ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গোপসাগরের দিকে চলিল। সপ্তদশবর্ষীয় বালক সুরেশচন্দ্র চিরদিনের মত স্বদেশ, জনকজননী ও আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়া অপরিচিত অজ্ঞাত দেশে যাত্রা করিলেন।

জাহাজ লণ্ডনে আসিয়া নঙ্গর করিল। সুরেশচন্দ্র জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া লণ্ডনের "ইষ্ট-এণ্ড" নামক পল্লীতে একটী ঘর ভাড়া লইলেন। এই পল্লীটী লণ্ডনের একটী অতি জঘন্য স্থান। যত রকম পাপ, যত রকম ব্যভিচার, দুর্নীতি, কদাচার আছে, তাহা যেন এই পল্লীটির নিজস্ব। এই পল্লীতে যাহারা বাস করে তাহাদের মত ঘৃণিত ও জঘন্য জীব বোধ হয় অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। তিনি কয়েক দিন এই অসৎসঙ্গে বাস করিয়া রিক্তহস্তে পথে দাঁড়াইলেন। এক টুকরা রুটী কিনিবার পয়সা পর্য্যন্ত তিনি মদ্যপানে ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অবশেষে সংবাদপত্র-বিক্রেতা এক সহৃদয় ইংরাজ বালকের অনুগ্রহে তিনি সংবাদপত্র বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, ইহাতে তাঁহার দৈনন্দিন ব্যয় এক প্রকার নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু বেশী দিন সংবাদপত্র বিক্রয় তাঁহার ভাল লাগিল না, তিনি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আবার কষ্টে পতিত হইলেন। লণ্ডন বড় ভীষণ স্থান। এখানে পয়সা থাকিলে দরদী বন্ধুর অভাব হয় না, কিন্তু নিঃসম্বল হইল কেহ

ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না। সুরেশচন্দ্র দারিদ্র্যের তাড়নায় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মুটেগিরি করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহাতে তাঁহার দু'পয়সা আয় হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুদিন পরে এ কর্ম্মও পরিত্যাগ করিলেন।

এবার তাঁহার লণ্ডনের সহরতলীস্থ পল্লীসমূহ দেখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইল। তিনি সামান্য কিছু জিনিস ক্রয় করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তাহা বিক্রয় করিতে লাগিলেন, ইহাতে তাঁহার বেশ লাভ হইতে লাগিল। এই সময় তিনি রসায়ন, গণিত, গ্রীক, লাটিন এবং কিছু ইন্দ্রজাল-বিদ্যাও শিক্ষা করেল ; এখন তিনি পূর্ণমাত্রায় সাহেব।

ফিরিওয়ালারূপে ভ্রমণ করিতে করিতে এক সার্কাসদলের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়া সপ্তাহে ১৫ শিলিং বেতনে উক্ত সার্কাসদলে ভর্ত্তি হন। সার্কাসে প্রবিষ্ট হইয়া দিন দিন তাঁহার উন্নতি হইলে লাগিল। তাঁহার অদ্ভুত ক্রীড়াদর্শনে দর্শক-মণ্ডলী বিমোহিত হইয়া করতালি দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিত। তাঁহার জন্য সার্কাসদলের প্রসার-প্রতিপত্তিও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সার্কাসের ম্যানেজার তাঁহাকে নিরতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বেতনও বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিল। বহু দুঃখ-কষ্টের পর তিনি সুখের মুখ দেখিতে পাইলেন। এই সময় সার্কাসদলের জনৈক জার্ম্মাণ-বালিকার নিকট তিনি কিছু কিছু জার্ম্মাণ এবং ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সুরেশচন্দ্র ভীষণ হিংস্র বন্য পশু বশ করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, সদ্যোধৃত ভীষণাকৃতি সিংহব্যাঘ্রের পিঞ্জরে প্রবেশ করিয়া তিনি তাহাদের সহিত মল্লক্রীড়া প্রদর্শনপূর্ব্বক দর্শকমণ্ডলীকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতেন। একদিন প্রসিদ্ধ পশুবশকারী জামবাক্ সাহেবের

সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি সুরেশচন্দ্রকে সহকারিরূপে তাঁহার পশুশালায় নিযুক্ত করেন। জ্যামবাক্ সাহেবের পশুশালায় কর্ম্ম করিবার সময় তিনি সিংহব্যাঘ্রাদির সহিত ক্রীড়া করিবার উত্তম সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমেই তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। দুর্দ্দান্ত হিংস্র পশুদিগকে গৃহপালিত বিড়াল-কুকুরের ন্যায় বশীভূত করিয়া অবলীলাক্রমে তিনি তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেন। নিতান্ত অনুগত ভৃত্যের মত তাহারা তাঁহার আদেশ অবনত মস্তকে পালন করিত। সুরেশচন্দ্রের দারিদ্র্য-কষ্ট তিরোহিত হইল, তিনি ধনে, মানে ও যশে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিলেন। তিনি আবার সার্কাস দলে ভর্ত্তি হইয়া ইয়োরোপের সমুদয় দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমেরিকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

নিউইয়র্ক সহরে অদ্ভুত ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া সুরেশচন্দ্র সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিলেন। চতুর্দ্দিকে তাঁহার নাম ও খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। নানা সংবাদপত্রে তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি ও চিত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেখান হইতে তিনি মেক্‌সিকো এবং মেক্‌সিকো হইতে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলরাজ্যে উপনীত হইলেন। ব্রেজিলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার অন্তরকে মুগ্ধ করিল, তিনি এই দেশে স্থায়ী বসবাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ব্রেজিলের রাজধানী রাইও-ডি-জেনিরো। সুরেশচন্দ্র সেখানে যাইয়া সার্কাস দেখাইতে লাগিলেন। এই সময়ে নানা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াও তিনি বিদ্বৎ-সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, পর্ত্তুগীজ, জার্ম্মাণ, স্পেনীয়, ডানিস্, ডাচ, ইটালিয়ন, গ্রীক্, লাটিন এই কয়টী ভাষায় তিনি দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। গণিত, দর্শন ও

রসায়ন শাস্ত্রেও তিনি বক্তৃতা প্রদান করিতেন। অতঃপর ব্রেজিলের সরকারী পশুশালায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ শূন্য হওয়াতে তিনি উক্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমেই তাঁহার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। অতঃপর সুরেশচন্দ্র ব্রেজিলের রাজকীয় অশ্বারোহী সৈন্যশ্রেণীতে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তথা হইতে তিনি সেণ্টাক্রুজে একদল পদাতিক সৈন্যের কর্পোরালরূপে প্রেরিত হন। সৈনিক বিভাগেও তিনি প্রতিভা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়া কর্ত্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যাঁহাদের ভিতর প্রতিভার বীজ নিহিত রহিয়াছে, তাঁহারা সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব অবস্থার মধ্যেই স্বীয় শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হন। সেণ্টাক্রুজে কিছুদিন কার্য্য করিবার পর তিনি রাইও-ডি-জেনিরোর সামরিক চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়া তথায় প্রেরিত হন। এই কার্য্যে অবস্থানকালে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায়,—বিশেষতঃ অস্ত্রচিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করেন। এই সময় মার্কিন দেশে পীতজ্বরে বহু-সংখ্যক নরনারী আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে চিকিৎসার্থ আসিতে লাগিল। তাহার উপর আবার এদেশে ঘোর বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায় বহু শত মরণোন্মুখ আহত বিদ্রোহী ও সৈনিক প্রত্যহ ঐ হাসপাতালে প্রেরিত হইতেছিল। তিনি গভীর মনোনিবেশ ও কঠোর পরিশ্রম সহকারে উহাদের তত্ত্বাবধান করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসাভাজন হন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সামরিক হাসপাতাল একটী মৃত্যু-নিকেতনে পরিণত হয়, বীর সুরেশচন্দ্র নির্ভীক চিত্তে সেই মৃত্যু-পথ-যাত্রিগণের দারুণ বিকট চীৎকার এবং বিকৃত-বদন শবরাশির বীভৎস দৃশ্য উপেক্ষা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন।

ইহার পর তিনি পদাতিক সেনাদলের সার্জ্জেণ্ট পদে উন্নীত হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন ব্রেজিল-রাজ্যের সর্ব্বত্র বিপ্লব-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এই বিপ্লব দমনের জন্য নানাস্থানে বিদ্রোহীদিগের সহিত রাজকীয় সৈন্যের খণ্ড-যুদ্ধ হইত। সুরেশচন্দ্র একদল সৈন্য পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইয়া এই যুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি এই সকল যুদ্ধে যে নির্ভীকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অমানুষিক বীরত্ব ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত: তিনি কৃষ্ণকায় বলিয়া তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার পদোন্নতি হইল না, সার্জ্জেণ্ট পদেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে বীরত্ব দেখাইয়া শ্বেতকায় সৈনিকগণ ক্রমশঃ উচ্চতর পদে আরোহণ করিতে লাগিলেন, বাঙ্গালী সুরেশচন্দ্র তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ বীরত্ব দেখাইয়াও উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হইলেন না। সর্ব্বত্রই এই বর্ণ-বৈষম্য! কিন্তু আমাদের সকল কর্ম্মের বিচারক ভগবান্, এই পক্ষপাতিত্ব তিনি বেশী দিন সহ্য করিতে পারিলন না, বীর সুরেশচন্দ্র তাঁহার কর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ লেপ্টেনাণ্টপদে উন্নীত হইলেন। কমলা বীর-ভোগ্যা। কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহারা প্রকৃত বীরত্ব এবং প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদের উন্নতির পথ কোনও বাধাবিঘ্ন দ্বারাই রুদ্ধ থাকিতে পারে না।

নানা যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া সুরেশচন্দ্র অনেক দিন পরে রাজধানী রাইও-ডি-জেনিরো নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন তিনি লেপ্টেনাণ্ট। এইবার তিনি এক চিকিৎসক-দুহিতাকে বিবাহ করিয়া সুখের সংসার সাজাইয়া বসিলেন। সুরেশ-চন্দ্রের বিক্ষিপ্ত, বিপর্য্যস্ত জীবন-ধারা এখন হইতে একটী কলনাদিনী-

কল্লোলিনীর মত আনন্দে তুই কূল প্লাবিত করিয়া যশঃ ও প্রতিভার স্বর্ণশীর্ষ বীচিমালায় বিভূষিত হইয়া বাহিয়া চলিল। সম্মান, অর্থ, প্রণয় শান্তি, সুখ,—এ সংসারে মানুষের যাহা প্রার্থনীয়, সবই তাঁহার হইল। তিনি তখন ব্রেজিলের সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগের অন্যতম। যে সুরেশচন্দ্র একদিন মান্দ্রাজে অনাহার-ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া সমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন,—আজ সেই সুরেশচন্দ্র যশে, সম্পদে, পদ-মর্য্যাদায় রাইও-ডি-জেনিরো নগরের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

সেই উন্নতিই তাঁহার চরম উন্নতি নহে, ভাগ্যলক্ষ্মী তখনও জয়-মাল্য হস্তে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ব্রেজিলের রাষ্ট্র-বিপ্লব ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। রাজকীয় নৌ-সেনা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া রাজধানী রাইও-ডি-জেনিরো আক্রমণ করিয়া গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নৌ-সৈন্য স্থল-সৈন্য অপেক্ষা অধিক বিক্রমশালী ছিল, কাজেই তাহারা প্রথমতঃ জয়লাভ করিতে লাগিল। তাহাদের রণপোত-নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে রাজ-ধানীর কতক অংশ ধ্বংস হইয়া গেল। স্থল-সৈন্যেরাও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিপক্ষ-সৈন্যের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র একদল সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার বীরত্বে, নির্ভীকতায় এবং সৈন্য-পরিচালন-কৌশলে বিপক্ষদল স্তম্ভিত হইল। অবিরত গোলাবর্ষণের মধ্যে তিনি, স্বীয় সৈন্য লইয়া বিপক্ষ-দিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহী নৌ-সেনাদল তখন রাজধানী অবরোধের আশা বিসর্জ্জন দিয়া উহার নিকটবর্ত্তী নাথেরা নামক স্থান আক্রমণের জন্য ধাবিত হইল। সাণ্টাক্রুজ প্রভৃতি নগরের তুর্গ সকল শত্রুদলের গোলার আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ

হইতে লাগিল। ব্রেজিল-সৈন্যগণও তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতেছিল। সুরেশচন্দ্র একদল সৈন্য লইয়া সমরক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। উভয় পক্ষে কয়েকদিন ধরিয়া তুমুল সংগ্রাম চলিল। কোনও পক্ষেরই জয়পরাজয় নির্দ্ধারিত হইল না। বিদ্রোহিগণ যখন দেখিল যে, এইরূপ আক্রমণে বিশেষ কোনই লাভ হইবে না, তখন তাহারা এক বিরাট বাহিনী পশ্চাৎ দিক্ হইতে নগর আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিল। গভীর তামসী রজনী, শত্রুমিত্র কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। রাজকীয় সৈন্যগণ উভয় দিক্ হইতে শত্রু-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিষম বিপদে পতিত হইল। সৈন্যাধ্যক্ষগণ বিচলিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন, এখন কোন্ দিক্ রক্ষা করিবেন? বুঝি বা বিদ্রোহীদিগের হস্তে সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়। শত্রুদিগকে এক দিক্ হইতে দূরীভূত করিতে না পারিলে নগর রক্ষার আর আশা নাই, অথচ অধিক সংখ্যক সৈন্যও সেই দিকে প্রেরণ করা অসম্ভব। তখন প্রধান সেনাপতি অধীন সেনাপতি-দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমাদিগের মধ্যে এমন কে বীর আছ যে মাত্র ৫০ জন সৈন্য লইয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস কর?" সকলেই নীরব। কে এমন দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইবে? একজন সেনাপতি উত্তর করিলেন, "আমি পারি।"—ইনি আর কেহ নহেন, আমরা যাঁহার জীবন-কথা লিখিতে বসিয়াছি, ইনি বাংলার সেই বীর-সন্তান সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস। সুরেশচন্দ্র অন্ধকার রাত্রিতে মাত্র ৫০ জন সৈন্য লইয়া সেই মৃত্যুমুখে ধাবিত হইলেন। যেখানে বিদ্রোহী সৈন্যগণ অবস্থান করিতেছিল, তিনি বিপুল বিক্রমে সেই দিক্ আক্রমণ করিলেন। বিরাট বিদ্রোহী বাহিনীর নিকট এই ৫০ জন সৈনিক প্রচণ্ড দাবানলের সম্মুখে সামান্য তৃণখণ্ড মাত্র। বিপক্ষ সৈন্যের

আক্রমণে সুরেশচন্দ্রের সৈন্যদল স্থির থাকিতে পারিল না। সুরেশচন্দ্র দেখিলেন, হয় ত ক্ষণকাল পরেই তাঁহার সৈন্যগণ পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে, তিনি বীরদর্পে হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "সৈন্যগণ, ভীত হইও না, আমরা নিশ্চয় আজ জয়লাভ করিব, এস, আমার অনুসরণ করিয়া শত্রু-পক্ষকে আক্রমণ কর।"—এই বলিয়া তিনি শত্রুপক্ষের গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইলেন। সেনাপতির বীরবাণীতে সৈন্যগণের হৃদয়েও বীরত্বের সঞ্চার হইল, তাহারা তাঁহার অনুগমন করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিল। শত্রু-সৈন্য সংখ্যায় অধিক হইলেও এই আক্রমণ প্রতিরোধের সাধ্য তাহাদের হইল না; তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু পলায়ন করিয়াও নিষ্কৃতি পাইল না, তাঁহার সৈন্যগণ হস্তস্থিত তরবারি ও সঙ্গীণের আঘাতে তাহাদিগকে দ্বিখণ্ডিত ও বিদ্ধ করিয়া শমন-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। বিজয়ী সুরেশচন্দ্র কতকগুলি শত্রু-সৈন্যকে বন্দী করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

নাথেরা সমরাঙ্গণে ব্রেজিল-রাজকীয় সৈন্যের জয়লাভের গৌরব একমাত্র সুরেশচন্দ্রেরই প্রাপ্য। তিনি যদি সেই গভীর রাত্রিতে অসম সাহসে নির্ভর করিয়া বীরবিক্রমে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ না করিতেন, তবে নাথেরা নগর শত্রুকর্তৃক অনায়াসে অধিকৃত হইত; অধিকন্তু, উভয় দিক্ হইতে আক্রমণে রাজকীয় সৈন্য নিষ্পেষিত হইয়া মরণ বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইত। কিন্তু সুরেশচন্দ্র বিদেশীয় বলিয়াই কেহ তাঁহার এই বীরত্বের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিল না। যদি তিনি বিদেশীয় না হইয়া তদ্দেশবাসী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্মৃতির প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শিত হইত সন্দেহ নাই। যাহারা বাঙ্গালী জাতিকে ভীরু, গৃহ-প্রিয়, কাপুরুষ, দুর্ব্বল বলিয়া ঘৃণাভরে নাসিকা

কুষ্ঠিত করে, তাহারা সুরেশচন্দ্রের বীরত্ব-মহিমামণ্ডিত জীবনের কথা ভাবিয়া দেখুক। বাঙ্গালী উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে যে বীরত্ব প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত ও অক্ষম নহে, একথা গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।' চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে সুরেশচন্দ্র মাতাপিতা ও আত্মীয়স্বজনের স্নেহে বঞ্চিত হইয়া জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কত দুঃখকষ্ট,—কত বিড়ম্বনা,—কত আপদ্‌বিপদ্‌ ঠেলিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে! সংসার-সাগরের বীচি-বিক্ষোভ দর্শনে তিনি ভীত হন নাই। তখন যদি তিনি অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তবে আজ কে তাঁহার নাম জানিত? স্বাবলম্বন, আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মানুষকে উন্নত করে,—তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখে। বীর সুরেশচন্দ্রের জীবন-কথা আমাদের ঘরে ঘরে রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় শ্রদ্ধায় কীর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।

সুরেশচন্দ্র ক্রমে কর্ণেল পদে উন্নীত হইয়া ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর মহাপ্রস্থান করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তিন পুত্র, এক কন্যা এবং অগাধ সম্পত্তি রাখিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। হয় ত জন্মভূমি দর্শনের জন্য সুরেশচন্দ্র একদিন ভারতে আসিতেন, কিন্তু অকাল-মৃত্যু তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ করিতে দিল না।

আজ সুরেশচন্দ্র নাই। কিন্তু যতদিন বাঙ্গালীর ইতিহাস থাকিবে, ততদিন তাঁহার বীরত্বের কাহিনী সে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া বিরাজিত রহিবে।

সন্তরণ-বীর প্রফুল্লকুমার

সন্তরণ-বীর প্রফুল্লকুমার

আজ যে প্রফুল্লকুমার সন্তরণে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক সমগ্র বিশ্ব-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন,—যাঁহার কৃতিত্বে বাঙ্গালীর সন্তরণ-গৌরব সমগ্র জগতে বিঘোষিত হইয়াছে তিনি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্ল কলিকাতার হেঁদুয়ার সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে ভর্ত্তি হইয়া সন্তরণ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সন্তরণ-বিদ্যার গুরুর নাম শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রিয় পাল। উপযুক্ত গুরুর অধীন থাকিয়া স্বীয় একাগ্রতা এবং অধ্যবসায়ের বলে প্রফুল্ল দিন দিনই উন্নতিলাভ করিতে থাকেন। শিক্ষার প্রথমাবস্থা হইতেই তাঁহার মনে এই দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল যে, তিনি পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সন্তরণ-বীর রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। তখনও আমাদের দেশে সন্তরণ শিক্ষা এখনকার মত প্রচার লাভ করে নাই। প্রফুল্ল বিদেশীয় সন্তরণ-বীরদের অমানুষিক কাহিনী পাঠ করিয়া তাঁহাদেরই মত একজন সন্তরণপটু হওয়ার জন্য মনে মনে কল্পনা করিতেন। তখন কে জানিত এই বাঙ্গালী শীর্ণকায় যুবক একদিন জগতের যাবতীয় সন্তরণ-বীরকে পরাজিত করিয়া জয়মাল্যে বিভূষিত হইবেন?

১৯২৯ সালে প্রফুল্লকুমার কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে দীর্ঘকালব্যাপী সন্তরণে অগ্রসর হন। ইহাই বোধ হয় তাঁহার প্রকাশ্যে সর্ব্বপ্রথম দীর্ঘকাল

সন্তরণের প্রচেষ্টা। এইবার তিনি ২৮ ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত সন্তরণ করিয়াছিলেন। প্রফুল্লকুমারের সেই সন্তরণ-চক্রের দূরত্ব ২৫ মাইলেরও অধিক হইবে। বীরেন্দ্রপাল এবং মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী ঐ বৎসরই যথাক্রমে ৩২ এবং ২৯ ঘণ্টা সাঁতার দিয়া প্রফুল্লকুমারের সময়-নির্দ্দেশ (Record) ভঙ্গ করেন। তৎপর ঐ বৎসরই এলাহাবাদের রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতার কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ারে ৫৪৷৷০ ঘণ্টা সাঁতার দিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। রবীন্দ্রের এই সন্তরণ-দক্ষতা দর্শনে কলিকাতায় এক অপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়া যায়।

১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে মিসেস্ লতিমুর স্কোমেল নাম্নী এক মহিলা ৭২ ঘণ্টা ২ মিনিট সাঁতার দিয়া পৃথিবীর সমুদয় পুরাতন সময়-নির্দ্দেশ ভঙ্গ করিয়া দেন। তৎপর মিসেস্ ক্যাথারিন নেহুয়া নাম্নী আর একজন মহিলা ৭২ ঘণ্টা ২১ মিনিট সাঁতার দেন। এই সমস্ত অপূর্ব্ব সন্তরণ-দক্ষতার কাহিনী পাঠ করিয়াই বাঙ্গালা দেশে সন্তরণ-শিক্ষার প্রবল সাড়া পড়িয়া যায়। আর্থার রিজো নামক এক ব্যক্তিই তৎকালে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তরণ-বীর বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, কারণ উক্ত মহিলা-দ্বয়ের সন্তরণের সময় সম্বন্ধে নানা সন্দেহ বর্ত্তমান ছিল। আর্থার রিজো ভূমধ্যসাগরে ৬২ ঘণ্টা কাল সাঁতার দিয়াছিলেন।

১৯৩০ সালে প্রফুল্লকুমার আর্থার রিজোর সময়-নির্দ্দেশ ভঙ্গ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে (হেঁদুয়া) অবতরণ করেন। তখন অনেকেই বাঙ্গালী যুবকের এই প্রচেষ্টাকে বাতুলের কল্পনা বলিয়া সহাস্যে উপেক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু যখন প্রায় ৬০ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইয়া গেল, অথচ প্রফুল্লকুমারের কোনও প্রকার অবসাদের লক্ষণ দেখা গেল না, তখন সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল, প্রফুল্লের দ্বারা বাঙ্গালীর

মুখ উজ্জ্বল হইবে। তাহাদের সে ধারণা সত্য সত্যই সফল হইল। প্রফুল্লকুমার ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট সন্তরণের পর সহস্র কণ্ঠের সমবেত বিজয়-ধ্বনির মধ্যে যখন জল হইতে উঠিয়া আসিলেন, তখন সকলেই বিস্মিত-নেত্রে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। সমস্ত জগতে বিঘোষিত হইয়া গেল, বাঙ্গালী প্রফুল্লকুমার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সন্তরণ বীর। আর্থার রিজো বাঙ্গালীর দ্বারা তাঁহার এই অবমাননা সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি ৬৯ ঘণ্টা সাঁতার দিয়া তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রফুল্লকুমার তাঁহাকে পরাস্ত করিবার জন্য ১৯৩১ সালে পুনরায় সন্তরণে অবতীর্ণ হন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেবার তাঁহার রেকর্ড পূর্ব্বের বারের অপেক্ষা আরও ৩৫ মিনিট কম হইয়া গেল।

প্রফুল্লকুমার তাঁহার এই পরাজয়ে মনঃক্ষুণ্ণ হইলেও হতাশ হইলেন না। তিনি রিজোকে পরাস্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ১৯৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার হেঁদুয়ার পুষ্করিণীতে একাদিক্রমে ৭২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট সাঁতার দিয়া বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তরণ-বীরের গৌরব লাভ করিলেন। জগৎ-সভায় বাঙ্গালীর এই আসন লাভ অনেক বিদেশীয়েরই মনঃপূত হইল না। তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিল যে,—মিস্ রুথলিজ নাম্নী এক জার্ম্মাণ বালিকা ৭৩ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট বিরামহীন সাঁতার দিয়াছেন, সুতরাং প্রফুল্লকুমারকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তরণ-বীর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

ইহাতে বীর যুবক প্রফুল্লকুমার দমিত হইলেন না। তিনি মনে মনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তরণ-বীর হওয়ায় সঙ্কল্প লইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বৎসরই রেঙ্গুণ সহরের "রয়েল লেক" নামক একটী কৃত্রিম হ্রদে ২২শে

অক্টোবর তারিখে তিনি প্রাতে ৮টা ৬ মিনিটের সময় বিরাট জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে সন্তরণের জন্য অবতরণ করেন। অবিশ্রান্ত সন্তরণ করিয়া তিনি ২৫শে অক্টোবর বেলা সাড়ে তিনটার সময় জল হইতে উঠিয়া আসিলেন। সেবার তিনি ৭৯ **ঘণ্টা ২৪ মিনিট** সাঁতার দিলেন। তখন পৃথিবীর লোক স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে,—**প্রফুল্লকুমারই জগতের শ্রেষ্ঠ সন্তরণ-বীর।**

রেঙ্গুণ-সহরের লক্ষাধিক লোক তখন সেই সন্তরণস্থলে উপস্থিত ছিল! প্রফুল্ল জল হইতে উঠিয়া আসিলে সেইখানেই রেঙ্গুণের মেয়র মিঃ ডুগাল তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। অতঃপর রেঙ্গুণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রফুল্লকুমারকে তাঁহার এই অপূর্ব্ব কৃতিত্বের জন্য যথোপযুক্ত ভাবে সম্বর্দ্ধিত করিয়া মান-পত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক এবং কয়েক সহস্র টাকা উপহার প্রদান করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে নাগরিক দলের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিরাট ভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়।

প্রফুল্ল মনে করিয়াছিলেন, শীঘ্রই হয় ত তাঁহাকে শুনিতে হইবে যে, অমুক ব্যক্তি তাঁহার সময়-নির্দ্দেশ ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে তিনি একশত ঘণ্টাব্যাপী বিরামবিহীন সন্তরণের জন্য অবতরণ করিবেন। কিন্তু আর কেহই তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অগ্রসর না হওয়ায় প্রফুল্লকুমার **হাতকড়া বদ্ধাবস্থায় ২৪ ঘণ্টাকাল নিরবসর সন্তরণ** করিতে সঙ্কল্প করেন।

১৯৩৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ শনিবার কলিকাতার হেঁদুয়ার পুষ্করিণীতে সন্তরণের দিন ধার্য্য হইল। ঐ দিন কলিকাতার মেয়র এবং পুলিশের কর্ম্মচারীকর্ত্তৃক হাতকড়া বদ্ধ হইয়া প্রফুল্লকুমার ৫টা ৩৪ মিনিটের সময়

জলে অবতরণ করেন। পরদিন (রবিবার) ৫টা ৪৪ মিনিট পর্য্যন্ত সহাস্য বদনে সন্তরণ করিয়া ২৪ ঘণ্টাকাল পূর্ণ হইলে তিনি বিপুল জয়-ধ্বনির মধ্যে বিনা সাহায্যে স্বয়ং জল হইতে সিঁড়ি বাহিয়া সন্তরণ-মঞ্চের উপর আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন কলিকাতার তৎকালীন মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয় আসিয়া তাঁহার হস্তের বন্ধন মুক্ত করিয়া দেন। অতঃপর মাত্র অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তির মত তিনি রাজপথে বহির্গত হইলেন। এই ধরণের দীর্ঘকাল সন্তরণ **পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম।**

ইহার পর প্রফুল্লকুমার বহরমপুরে ঐরূপ হাতকড়া বদ্ধাবস্থায় **২৫ ঘণ্টা** সাঁতার কাটেন। অতঃপর তিনি হাতকড়া বদ্ধাবস্থায় **৫০ ঘণ্টা** সাঁতার দেওয়ার সঙ্কল্প করিলেন। সেবার তাঁহার সন্তরণের স্থান নির্ব্বাচিত হইল ঢাকা সহরে তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী পুষ্করিণীতে। সকলেই মনে করিতে লাগিল, "এও কি সম্ভব? এবার প্রফুল্লকুমার নিশ্চয়ই অকৃতকার্য্য হইবেন।" ৪ঠা আগষ্ট শনিবার প্রাতঃকাল ৮টা ৩৩ মিনিটের সময় তিনি হস্তবদ্ধাবস্থায় পুষ্করিণীতে অবতরণ করিলেন। ঢাকা সহরের সমস্ত লোক যেন একেবারে আসিয়া সেখানে ভাঙ্গিয়া পড়িল, সন্তরণের স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। ৬ই আগষ্ট বৈকাল বেলা ৫টা ১৬ মিনিটের সময় ঢাকার সিভিল সার্জ্জন মহাশয়ের নির্দ্দেশমত তাহাকে জল হইতে উঠিতে হইল, তখন যদিও প্রফুল্লকুমারের সঙ্কল্পিত ৫০ ঘণ্টা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি আরও কিছুক্ষণ সাঁতার দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু ডাক্তার সাহেব সে অনুমতি দিলেন না। এইবার তিনি **৫৭ ঘণ্টা ৩ মিনিট** সাঁতার দিয়াছিলেন।

প্রফুল্লকুমার তাঁহার উল্লিখিত সন্তরণ-সময়ে কখন কি কি দ্রব্য আহার করিয়াছেন তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল :—

৭২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট কালে—

বার্লি, হর্লিকস্, গ্লুকোস, সন্দেশ পান।

৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট কালে—

কাফি, কোকো, হর্লিকস্, দুগ্ধ, সন্দেশ, পান।

হস্তবদ্ধাবস্থায়

গ্লুকোস্, কোকো, কাফি, সিঙ্গাড়া, সন্দেশ, লিমনেড, ডাব ও পান।

ভবিষ্যতের জন্য তাঁহার সন্তরণের সঙ্কল্প :—

(১) হস্তবদ্ধাবস্থায় জাপানে ৬০ ঘণ্টা সন্তরণ; (২) 'আমেরিকায় ১০০ ঘণ্টাকাল অনবসর সন্তরণ। (৩) সন্তরণে ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম। (৪) ভূমধ্যসাগরের মালটা হইতে সাঁতার কাটিয়া সিসিলি পর্য্যন্ত গমন।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, প্রফুল্ল তাহার এই সঙ্কল্পে সিদ্ধিলাভ করিয়া বাংলার ও বাঙ্গালীর মুখ অধিকতর সমুজ্জ্বল করুন।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে বাঙ্গালী

যুদ্ধের কারণ—অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড সপত্নীক সার্ভিয়া-রাজ্যের বোস্‌নিয়া নামক স্থানে পরিভ্রমণ কালে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন জনৈক আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হন। এই সামান্য কারণেই সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ভীষণ ধ্বংস-লীলা চলিতে থাকে তাহাই ইতিহাসে "**বিংশ শতাব্দীর মহাসমর**" নামে স্থান লাভ করিয়াছে। প্রথমে অস্ট্রিয়া সার্ভিয়াকে শাস্তিপ্রদান মানসে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিল; এই যুদ্ধ ঘোষণার ফলে ইউরোপীয় প্রধান প্রধান অধিকাংশ শক্তিরই স্বার্থে ব্যাঘাত উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারাও স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইলেন।

ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে তদীয় ভারতবর্ষীয় প্রজাবৃন্দকে যে অভিভাষণ-পত্র প্রদান করেন তাহা পাঠ করিলে বৃটিশ-শক্তির মহাসমরে যোগদানের কারণ উপলব্ধি করিতে পারা যায়—"* * * * এই সর্ব্বনাশকর সংগ্রাম আমার ইচ্ছায় সংঘটিত হয় নাই। আমি পূর্ব্বাপরই শান্তির অনুকূলে অভিমত প্রদান করিয়া আসিতেছিলাম। যে সমুদয় বিসম্বাদের মূলকারণের সহিত আমার সাম্রাজ্যের কোনও সংস্রব নাই, আমার মন্ত্রিগণ সেই সকল বিবাদ-বিসম্বাদ প্রশমিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যে সকল প্রতিশ্রুতি পালনার্থ আমার রাজ্য অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল, সেই সকল প্রতিশ্রুতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া যখন জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক বেলজিয়ম

আক্রান্ত ও তাহার নগরসমূহ বিধ্বস্ত হইল,—যখন ফরাসী জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার আশঙ্কা হইল, তখন যদি আমি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতাম তাহা হইলে আমাকে আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া আমার সাম্রাজ্য এবং মানবজাতির স্বাধীনতা ধ্বংস-গ্রাসে সমর্পণ করিতে হইত। * * * *"

ইউরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালী নানা বিভাগে যোগদান করিয়া তাঁহাদের অতীত শূরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। "ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী অধিবাসিবৃন্দ সমরক্ষেত্রের সম্পূর্ণ অযোগ্য"—ইংরাজ ঐতিহাসিকের এই অভিমত যাহারা এতদিন অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া আসিতেছিল, বিগত মহাসমরে তাহারা বঙ্গীয় যুবকের রণদক্ষতার কাহিনী শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছে। বাঙ্গালী যে একটা অকর্ম্মণ্য, ভীরু, দুর্ব্বল, রণবিমুখ জাতি নহে, সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হইলে তাহারা যে রণোল্লাসে উন্মত্ত হইয়া সমর-প্রাঙ্গণে প্রকৃত বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতে পারে, বিগত ইউরোপীয় কুরুক্ষেত্রে তাহা সপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। বহু ইংরাজ যোদ্ধৃপুরুষ বঙ্গীয় যুবকের সাহস, বুদ্ধিমত্তা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও যুদ্ধপটুতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাঙ্গালীর ধমনী হইতে আজও যে, প্রতাপ, সীতারাম, চাঁদরায়-কেদাররায়, মুকুন্দরায় প্রভৃতি বীরপুরুষগণের শোণিত-কণা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায় নাই তাহার প্রমাণ **বেঙ্গল আম্বুলেন্স কোর, ডবল কোম্পানী, ৪৯ সংখ্যক বঙ্গবাহিনী ও ভারত-রক্ষী সৈন্যদলের** কার্য্যকুশলতা। তথাপি বাঙ্গালী এমনই হতভাগ্য জাতি যে, দুই শত বৎসরের পরাধীনতায় তাহারা যে কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছে, বুঝি শত বৎসরের কার্য্যদক্ষতায়ও তাহা ক্ষালিত হইবে না।

বঙ্গীয় শুশ্রূষাকারী স্বেচ্ছাসেবকদল

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে স্বর্গীয় ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালী শুশ্রূষাকারী স্বেচ্ছাসেবকদল লইতে স্বীকৃত হইলেন। বাঙ্গালী বুঝিল,—বাঙ্গালী অনুভব করিল,—আজ ভগবান্ তাহাদিগকে যে সেবাধর্ম্মের মহাব্রত উদ্‌যাপনের সুযোগ দিয়াছেন ইহার ভবিষ্যৎ ফল অতীব উজ্জ্বল, ইহাই রণক্ষেত্রে বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপনপূর্ব্বক তাহাদের জাতীয় কলঙ্কাপনোদনের সূচনা,—এ সুযোগ অবহেলা করা উচিত নহে,—ইহা বিধাতার আশীর্ব্বাদ, তাহাদিগকে ইহা শির পাতিয়া লইতে হইবে। বাঙ্গালী যুবকেরা দলে দলে আসিয়া **"বেঙ্গল আম্বুলেন্স কোর"** নামক শুশ্রূষার্থিদলে যোগদান করিতে লাগিল। রণক্ষেত্রের ভীষণতা, জীবনের মমতা, পিতার স্নেহের বন্ধন, মাতার করুণ ক্রন্দন, পত্নীর আসন্ন বিরহ-কাতর সজল দৃষ্টি, পুত্রকন্যার প্রস্ফুটিত শতদল বিনিন্দিত মুখকান্তি,—কিছুই তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে পারিল না। বাঙ্গালী কর্ত্তব্যের আহ্বানে জাতীয় গৌরব অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে যাত্রা করিল। ইহারা স্বেচ্ছাসেবক, গভর্ণমেণ্ট হইতে কোনও প্রকার বেতন তাহারা পাইল না। বাঙ্গালীর সংগৃহীত অর্থে ভূষিত হইয়া রণক্ষেত্রে আর্ত্তের সেবাকল্পে তাহারা অগ্রসর হইল। অনেকে হয় ত মনে করিতে পারেন, কেবল ডানপিটে ও অকর্ম্মণ্য ভবঘুরের দলই এই শুশ্রূষার্থিদলে যোগদান করিয়াছিল; কিন্তু আমাদের পরবর্ত্তী লিখিত বিবরণ পাঠে তাঁহারা অবগত হইবেন যে, এই শুশ্রূষা-কারী স্বেচ্ছাসেবকদলের অধিকাংশই বঙ্গজননীর কৃতী সন্তান, সকলেই সুশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ এবং উচ্চবংশসম্ভূত। তাঁহারা মেসোপটেমিয়া,

কূট-আলমারা ও বাগদাদ প্রভৃতি রণক্ষেত্রে ভীষণ অগ্নিবর্ষণের মধ্যে নির্ভীক চিত্তে যে সেবাকার্য্য সাধন করিয়াছেন তাহা সত্যই ত্যাগী বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর প্রভৃতি ঋষিবৃন্দের পবিত্র চরণ-রেণুপূত ভারতের উপযুক্ত এবং সমগ্র জগতের আদর্শ। সেবা-ধর্ম্মের পবিত্র সুদৃঢ় বর্ম্মে তাঁহারা আচ্ছাদিত, ভারতের পবিত্র উচ্চ আদর্শে তাঁহাদের প্রাণ গঠিত, রণ-ক্ষেত্রের বিভীষিকা তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারিবে কেন?

রণক্ষেত্রে শুশ্রূষাকারিদলের কর্ত্তব্য অতীব কঠিন, দায়িত্ব অতিশয় গুরুতর। অনাহারে অনিদ্রায় দিবারাত্র অমানুষিক পরিশ্রম সহকারে সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হয়। জননীর ন্যায়—ভগিনীর ন্যায়—কন্যার ন্যায়—বন্ধুর ন্যায় স্নেহ ও যত্নে আর্ত্তের বেদনাভার অপনোদনের জন্য তাঁহাদিগকে স্বীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য জলাঞ্জলি দিতে হয়; এমন কি, পীড়িতের মূত্রপুরীষাদি পর্য্যন্ত স্বহস্তে পরিষ্কার করা শুশ্রূষাকারিদলের কর্ত্তব্য। রণক্ষেত্রে জীবন-মরণের সংশয়স্থলে থাকিয়া তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। এই সমুদয় কঠোরতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যে দিন 'ভেতো' ও ভীত বাঙ্গালী যুবকদল সেচ্ছাসেবকরূপে সাগর-পারে যাত্রা করিল, জাতীয় ইতিহাসের তাহা একটী চিরস্মরণীয় দিন সন্দেহ নাই।

হাসপাতাল-জাহাজ যখন প্রথম শুশ্রূষার্থী স্বেচ্ছাসেবকদল লইয়া বঙ্গোপসাগরের বীচিবিক্ষোভিত বক্ষ বিদারণপূর্ব্বক মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তখন জানি না ভগবান্ কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহার উপর ধ্বংসের অমোঘ বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। শুশ্রূষার্থিদলবাহী সামরিক হাসপাতাল-পোত বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিবার সময় জার্ম্মাণ-রক্ষিত গুপ্ত মাইনের আঘাতে চূর্ণ-

বিচূর্ণ হইয়া অনন্ত সলিল-সমাধিলাভ করিল। এইরূপে বাঙ্গালীর প্রথম যুদ্ধযাত্রা ব্যর্থ হইল। কিন্তু বাঙ্গালীর হৃদয়ে যুদ্ধযাত্রার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রৎ হইয়াছিল তাহা উক্ত প্রতিকূল ঘটনার সংঘাতে দমিত হইল না। পুনরায় নবীন দল সংগৃহীত হইয়া মেসোপটেমিয়ায় প্রেরিত হইল।

রণদাপ্রসাদ সাহা

ইনি বেঙ্গল আম্বুলেন্স কোরের একজন স্বেচ্ছাসেবক; তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কর্ম্মতৎপরতা ও সাহসিকতায় বেঙ্গল আম্বুলেন্স্ কোর গৌরবান্বিত; তাঁহার কার্য্যকুশলতায় সুদূর তুর্কিস্থানে বাঙ্গালীর নাম সগৌরবে ঘোষিত হইয়াছে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রণদাপ্রসাদ অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত অমরেন্দ্রনাথ চম্পটীর নেতৃত্বে মেসোপটেমিয়ার রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। ইংরাজ সৈন্যদলের মধ্যে তখন ভীষণভাবে স্কার্ভি-পীড়া (দন্তরোগ বিশেষ) আরম্ভ হইয়াছিল। ফলমূল এবং নবীন শাকপত্র এই রোগের প্রধান ঔষধ। যুবক রণদা শত্রুদিগের অনলবর্ষণে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শাক-পত্র সংগ্রহের জন্য বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিতেন এবং শাক-পত্রাদি লইয়া নির্ব্বিঘ্নে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তৎকর্ত্তৃক এইরূপ নিত্য নিত্য নব নব শাকপত্র সংগ্রহের ফলে সৈন্যগণ স্কার্ভিপীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। তখন চতুর্দ্দিকে এমন ভাবে শত্রুর গুলিবর্ষণ চলিতেছিল যে, যে কোনও মুহূর্ত্তে রণদার জীবনলীলার অবসান হইতে পারিত, কিন্তু তিনি সেবা-ধর্ম্মরূপ অভেদ্য বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কাজেই বিপন্নিবারক মধুসূদন স্বয়ং তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন।

বাগদাদে অবস্থান-কালে একদিন সহসা অস্ত্রাগার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বিস্ফোরক পদার্থসমূহ বিদারণের ভীষণ শব্দে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইল, ধূম্রপটলে গগন সমাচ্ছন্ন করিয়া সহস্রজিহ্ব অগ্নিদেব যেন সর্ব্বগ্রাসে উদ্যত হইলেন। বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক-দলের অনেকেই তৎকালে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়াভিলাষে অদূরবর্ত্তী পণ্যশালায় গিয়াছিলেন। দূর হইতে বজ্রনির্ঘোষবৎ মুহুর্মুহুঃ ভীষণ গর্জ্জন শ্রবণ ও কৃষ্ণ ধূমজালে গগন আচ্ছন্ন দর্শন করিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, বুঝি অতর্কিতে শত্রুদল বাগদাদ আক্রমণ করিয়া গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে। তখন আর্ত্ত-নিবাসে আগুন ধরিয়াছে; চব্বিশ জন বঙ্গীয় শুশ্রূষাকারী সে সময় উক্ত আর্ত্তনিবাসে আহত বৃটিশ সৈন্যের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। বীর রণদাপ্রসাদ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সেই অগ্নি-কবলিত আর্ত্ত-নিবাসের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন তুর্কীয় ফায়ার-ব্রিগেড্ অগ্নিনির্ব্বাপণে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল সত্য, কিন্তু অগ্নি-বেগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। অগ্নিনির্ব্বাপণ অসম্ভব ভাবিয়া ফায়ার-ব্রিগেড্ অবশেষে হতোদ্যম হইয়া ভগ্নমনে প্রস্থান করিল। রণদাপ্রসাদ জানিতেন, ত্রিশজন সৈনিক এরূপভাবে আহত হইয়া আর্ত্তনিবাসে শায়িত ছিল যে, অপরের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের নিষ্ক্রমণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। রণদাপ্রসাদকে উৎকণ্ঠিত দেখিয়া কাপ্তেন কিং বলিলেন, "অত উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই, আহত সৈনিকগণ নিরাপদে আর্ত্ত-নিবাস হইতে বহির্গত হইয়াছে।" রণদাপ্রসাদ কাপ্তেনের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "না সাহেব, তুমি ভুল বুঝিয়াছ, ত্রিশজন সৈনিক এরূপভাবে আহত যে, তাহাদের বহির্গমন অসম্ভব, নিশ্চয়ই তাহারা ঐ অগ্নিকবলিত শিবিরাভ্যন্তরে রহিয়াছে, আমাকে আদেশ প্রদান

কর, আমি ঐ আর্ত্তনিবাসে প্রবেশ করিয়া হতভাগ্যদিগকে উদ্ধার করি।” যদিও কিং জানিতেন যে, ঐ ভীষণ অগ্নির গ্রাস হইতে কিছু রক্ষা করিতে অগ্রসর হওয়া মৃত্যুকে বরণ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে, তথাপি তিনি রণদাপ্রসাদের ঐকান্তিক আগ্রহ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। রণদাপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ সেই অগ্নি সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া আর্ত্তনিবাস হইতে আহত সৈন্যদিগকে বাহিরে লইয়া আসিতে লাগিলেন, কাপ্তেন কিংও তাঁহার অনুগমন করিলেন। যখন প্রায় বিংশতি সংখ্যক আহত সৈনিক সেই মৃত্যু-গ্রাস হইতে রক্ষা পাইল, তখন অন্যান্য বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় অবশিষ্ট আহত সৈন্যগণ অগ্নি-গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া নিরাপদ্ স্থলে নীত হইল। একমাত্র বীর রণদা-প্রসাদের উদ্যোগ, সাহস ও বীরত্বের জন্যই অতগুলি মানবসন্তান শোচ-নীয় অকাল মৃত্যু-গ্রাস হইতে রক্ষা পাইল। রণদাপ্রসাদের এ বীরত্ব একজন সমর-বিজয়ী সেনাপতির বীরত্বের অপেক্ষা কম শ্লাঘার বিষয় নহে। এই বীরত্ব-কাহিনী আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার উপযুক্ত। রণদাপ্রসাদের কর্ত্তব্যপালনে মেসোপটে-মিয়ার উচ্চ সামরিক কর্ম্মচারিবর্গ এতই সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন, —“বঙ্গদেশে যদি আরও রণপ্রসাদের ন্যায় বীর যুবক থাকেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদিগকে সাদরে ও সানন্দে গ্রহণ করিবেন।”

রণদাপ্রসাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন—“ * * * টেসিফোণের যুদ্ধে ফণিভূষণ ঘোষ, শিশির সর্ব্বাধিকারী এবং আমি হাবিলদার চম্পটীর নেতৃত্বাধীনে সৈন্যদলের পশ্চাতে ছিলাম। আমাদের কুটে গমন এবং

অবরোধ-কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। যাহাতে খাদ্যসামগ্রী নিঃশেষ না হয় তজ্জন্য প্রথম হইতেই সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদের প্রাত্যহিক আহারের পরিমাণ অর্দ্ধেক করা হইয়াছিল। কয়েক দিন সেই ভাবেই অতিবাহিত হইল। আমরা অবরুদ্ধ অবস্থায় দিন কাটাইতে লাগিলাম। যতই দিন যাইতে লাগিল, আহার্য্যের পরিমাণও ততই হ্রাস পাইতে লাগিল। আমরা যেদিন বিপক্ষের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলাম, তাহার ১০।১২ দিন পূর্ব্ব হইতেই আমাদের প্রত্যেকের জন্য দুই আউন্স আটা, দুই আউন্স তৈল, বার আউন্স অশ্বমাংস এবং দুই আউন্স ডাইল প্রদত্ত হইতেছিল। শত্রু-হস্তে বন্দী হইবার এক পক্ষ পূর্ব্বে চারিখানি বিমান-পোতে আটা, টিন-বদ্ধ মাংস, চকোলেট, স্যাকারিণ ইত্যাদি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। প্রত্যেকখানিতে মাত্র ৮ মণ করিয়া রসদ আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা সাগরে বারিবিন্দুবৎ। * * * ”

রণদাপ্রসাদের সার্ভিস বহিতে ক্যাপ্টেন এইচ্, এফ্, কিং লিখিয়াছেন :—

বাগ্দাদ, ১৬ই জুন,
১৯১৬

আর, পি, সাহা আমার অধীনে প্রথমে কুটে, পরে ৫৭ নং ভারতীয় ষ্টেসনারী হস্‌পিটালে এবং শেষে বাগ্দাদে ছয় মাস কার্য্য করিয়াছিলেন। বাগ্দাদে তাঁহাকে বন্দী-অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল। তিনি যে কেবল পরম উৎসাহে শ্রমসাধ্য কর্ম্মসাধন করিয়াছেন, তাহা নহে; অস্ত্রোপ-চারের পর ক্ষতস্থান বন্ধন, পীড়িত ব্যক্তিগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ও বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার উপর আমার এমনই বিশ্বাস ছিল যে, আর্ত্তনিবাসে কার্য্য করিতে করিতে যখন আমার ক্লান্তি

বোধ হইত, তখন বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবকদল এবং রণদার মত কয়েক জনের হস্তে ব্যতীত আর কাহারও হস্তে সে কার্য্যের ভার অর্পণ করিতে সাহস করিতাম না।”

১৯১৬ অব্দের জুন মাসে যখন বাঙ্গালী সৈনিক গ্রহণের প্রস্তাব মঞ্জুর হয়, রণদাপ্রসাদ তখন তাঁহার রণসাধ পূর্ণ করিয়া “রণদা” নাম সার্থক করিবার জন্য পুনরায় সৈনিকদলে ভর্ত্তি হইলেন। তিনি সামান্য সৈনিক হইতে জমাদার-পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। স্বকীয় বীরত্ব এবং কর্ম্মকুশলতায় তিনি কর্তৃপক্ষের এরূপ প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন যে, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধাবসানে যখন ইংলণ্ডে শান্তি-উৎসব সম্পন্ন হয়, তখন তিনি বঙ্গীয় সৈন্যমণ্ডলীর প্রতিনিধিস্বরূপ সেই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। হাবিলদার মোহিতকুমার মুন্সী এবং প্রাইভেট নৃত্যলাল চক্রবর্ত্তীও রণদাপ্রসাদের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ চম্পটী

“বেঙ্গল আম্বুলেন্স কোরের” অন্যতম গৌরবান্বিত সেবক অমরেন্দ্র নাথ চম্পটী। ইনি কলিকাতা পুলিশ-কোর্টের একজন উদীয়মান উকীল ছিলেন। যখন বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবকদলের গঠন আরম্ভ হয়, তখন অমরেন্দ্রনাথ ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় পরিত্যাগপূর্ব্বক আর্ত্তসেবা বরণ করিয়া লইলেন। সুখশান্তিময় আইন-ব্যবসায় তাঁহার ভাল লাগিল না, তিনি মৃত্যুর লীলাভূমি রণাঙ্গণে আহতের সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের অনুরোধ উপেক্ষাপূর্ব্বক বাঙ্গালীর ললাটের কলঙ্ক-টীকা অপনোদনের নিমিত্ত মেসোপটেমিয়ায় যাত্রা করিলেন। অনেকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “অমন ব্যবসায় পরিত্যাগ

করিয়া কেন,—কোন্ প্রলোভনে আপনি এইরূপে স্বীয় জীবনকে আহুতি দিতে চলিয়াছেন!” অমরেন্দ্রনাথ ধীর-গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, “কেন, আমি যে একজন বাঙ্গালী; এই সেবক-সম্প্রদায়ের নাম কি ‘বঙ্গীয় সেবক-সম্প্রদায়’ নহে? প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবককেই এই জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করা উচিত।”

সেবকদল যখন আলিপুরে শিক্ষানবিশী করিতেছিলেন, তখন হইতেই অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁহাকে আপন আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত শ্রদ্ধা কবিতেন ও ভালবাসিতেন। স্বীয় অমায়িক ব্যবহারে তিনি সেবকদলের ভক্তি-প্রীতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর্ত্তনিবাসের দৈনিক কর্ত্তব্য, প্রহরীর কার্য্য, রন্ধনশালা ও, আহারের তত্ত্বাবধান, সমস্তই তাঁহাকে করিতে হইত। তিনি অনায়াসে এতগুলি গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কর্তৃপক্ষের প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। কুট-অল-আমারায় স্বেচ্ছাসেবকদল অমরেন্দ্রনাথের কর্ত্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে বলিতেন,—“যখন বঙ্গীয় আর্ত্তাশ্রমে যাইবে, তখনই দেখিবে, এক জন হৃষ্টকায় বলিষ্ঠ যুবক কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে ব্যস্ত আছেন।” এই অমরেন্দ্রনাথ কুট-অল-আমারায় সেনাপতি টাউনসেণ্ডের সহিত শত্রু হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। অমরেন্দ্র আর ইহলোকে নাই, অকালে তাঁহার এই গৌরবময় জীবনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শান্ত নেহাল সিং বেঙ্গল আম্বুলেন্স কোরের জনৈক সেবক সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—“একদিন একখানি হাসপাতাল-জাহাজে তুর্কি-নিক্ষিপ্ত একটী বোমা আসিয়া পতিত হয়। বোমার মুখে তখনও আগুন জ্বলিতেছিল, কিন্তু তখনও উহা বিদীর্ণ হয় নাই। একজন বাঙ্গালী

স্বেচ্ছাসেবক তৎক্ষণাৎ উক্ত স্ফুটনোন্মুখ বোমাটী তুলিয়া লইয়া অগ্নি-সংযুক্ত সলিতাটী ছিন্ন করিয়া উহাকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা, ক্ষিপ্রকারিতা ও নির্ভীকতা বশতঃই সেইদিন হাসপাতাল-পোতখানি আসন্ন ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। পোতাশ্রয়ে যে সকল আহত সৈনিক চিকিৎসার্থ অবস্থান করিতেছিল, সেই অজ্ঞাতকুলশীল বীরযুবকের বীরত্ববলেই তাহারা মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।"—এই বীর যুবকের নাম-ধাম কিছুই প্রকাশিত হয় নাই।

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক আহত স্বেচ্ছাসেবকের ক্ষত হইতে শোণিত-নিঃসরণ দর্শন করিয়া একজন ইংরাজ কাপ্তেন আই, এম্-এস্ তাঁহার পকেট-বুকে লিখিয়াছিলেন,—"This is the first time I have seen Bengalee blood spilt on a battle-field. It is an investment which will bring a huge return for his race by and by."—অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালীর শোণিত-পাত এই আমি সর্ব্বপ্রথম দর্শন করিলাম। এই ঋণ কালে তাঁহার জাতিকে অতুল সম্পদ্ প্রত্যর্পণ করিবে।

কর্ণেল জে, হেনেসী বলিয়াছেন,—"৬ই অক্টোবর তারিখে ১৬শ সংখ্যক বিগ্রেড্ যখন আজিজিয়ার অভিমুখে যাত্রা করে, তখন ইহারা (বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবকদল) তাহাদের সহিত তিন দিবসে ৭০ মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছিল ;—কেবলমাত্র কয়েকজন এই পথ-পর্য্যটনে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। আজিজিয়ায় অবস্থান-কালে ৯ই অক্টোবর হইতে ১৪ই নভেম্বর পর্য্যন্ত বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ সানন্দচিত্তে দক্ষতা সহকারে যুদ্ধক্ষেত্রস্থ চিকিৎসাগারের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিল। ২২শে

নভেম্বর হইতে ২৫শে নভেম্বর পর্য্যন্ত টেসিফোনের যুদ্ধে আম্বুলেন্সের বাহকগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভীষণ অনলবৃষ্টির মধ্যে তাহারা কর্ত্তব্যকর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক যে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে তাহা শীঘ্র বিস্মৃত হইবার নহে। সৈন্যদলের কুটে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবকদলের একজন হত, একজন আহত এবং ছয়জন শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিল।"

সার জন নিক্‌সন তাঁহার ডেস্‌পাচে লিখিয়াছেন,—"১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষভাগে আম্বুলেন্স কোরের অনুরোধে তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে কার্য্য করিতে দেওয়া স্থির হইল। আম্বুলেন্স কোরস্থ ডাক্তার-দিগের দ্বারাই একটী সন্তোষজনক কর্ম্মসম্পাদনকারী কর্ম্মঠ দল গঠন করা সুসঙ্গত বোধ হওয়ায়, এই দল অমেন্দ্রনাথ চম্পটীর নেতৃত্বে ৬ষ্ঠ বিভাগীয় ২নং ফিল্ড আম্বুলেন্সের সহিত সংযুক্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইল। কুট-অল-আমারার যুদ্ধের দুই এক দিবস পরে এই দল অগ্রবর্ত্তী বাহিনীর সহিত মিলিত হইয়া ৬ষ্ঠ বিভাগের সহিত অগ্রসর হইয়াছিল। ইহারা টেসিফোণের যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া ভীষণ গোলাবর্ষণের মধ্যে প্রভূত বীরত্ব সহকারে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিল এবং আহত সৈনিকদিগকে নদীতীরে আনয়ন-সম্পর্কে যতদূর সম্ভব সাহায্যদানে ত্রুটী করে নাই। নভেম্বর মাসের শেষভাগে যুদ্ধক্ষেত্রের অসীম কষ্ট অন্যান্য সৈনিকদিগের ন্যায় ইহারাও সমভাবে সহ্য করিয়াছিল। তৎপরে পীড়া ও শৈত্য ইত্যাদি নানা কারণে ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইলেও ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে কার্য্য করিতে থাকে।"

২৮।৯।১৬ তারিখের দৈনিক বেঙ্গলী পত্রের ডাক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল—"যে চল্লিশ জন স্বেচ্ছাসেবক জেনারল টাউনসেণ্ডের সহিত

টেসিফোণ-যুদ্ধে গমন করিয়া অদ্ভুত সাহস সহকারে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন,—যাঁহাদের কথা সার জন্ নিক্সন 'স্বকীয় ডেস্‌পাচে এবং বড়লাট বাহাদুরের প্রদত্ত বক্তৃতায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের সাতজন গতকল্য বোম্বাই মেলে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এই স্বেচ্ছাসেবকগণের চব্বিশজন কুট-অল-আমারার চিরস্মরণীয় অবরোধ-কালে টাউনসেণ্ডের সঙ্গে থাকিয়া তুর্কিদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁহারা 'সিগ্‌ন্যাল সার্ভিসে' কর্ম্ম করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বন্দি-বিনিময়ে তাঁহারা মুক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।"

স্বেচ্ছাসেবকগণ যখন চিরস্নিগ্ধ বঙ্গভূমির শ্যামল ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেশবাসী তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য স্থানে স্থানে বিপুল আয়োজন করিয়াছিল। তাঁহারা বঙ্গের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, সসম্ভ্রমে আহূত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিবার জন্য,—তাঁহাদের মুখে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের বর্ণনা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিবার জন্য, দুর-দূরান্তর হইতে বালক, যুবক ও বৃদ্ধ সেই গৌরবময় আনন্দোৎসবে যোগদান করিতে লাগিল। বাঙ্গালী সেই বীরবৃন্দকে মহাসমারোহে কুসুম-মাল্যে ভূষিত করিয়া তাঁহাদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসার অর্ঘ্য অর্পণ করিল। তাঁহারা রণক্ষেত্র হইতে যে গৌরব-কিরীটে বিভূষিত হইয়া আসিয়াছেন তাহার নিকট এ সম্মানপ্রদর্শন কত তুচ্ছ !

কাপ্তেন কল্যাণকুমার মুখার্জ্জী আই-এম্-এস্ ও কাপ্তেন জ্যোতিলাল সেন আ-ইএম্-এস্ মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্যে বীরত্ব ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়া সামরিক বিভাগের একটী অন্যতম উচ্চ সম্মান "মিলিটারী-ক্রস্" লাভ করিয়া বাঙ্গালীর

জাতীয়তার শিরে যে জয়-মুকুট পরাইয়াছেন, ইতিহাস তাহা চিরদিন সগৌরবে বক্ষে ধারণ করিয়া থাকিবে।

গভর্ণমেণ্ট আরও স্বেচ্ছাসেবক চাহিলে প্রায় একশত জন বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবকদলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন; কিন্তু হঠাৎ সরকার পক্ষের মতি পরিবর্ত্তন ঘটে এবং বেঙ্গল আম্বুলেন্স কোরকে বিদায় দেওয়া হয়।

সৈনিক বাঙ্গালী

বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবকদলকে বিদায় দেওয়ায় বাঙ্গালী নিরতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হইল, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিধাতা যে তাহাদের জন্য আরও উচ্চতর সম্মানের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন,—ভবিষ্যতের ভাণ্ডারে তাহাদের জন্য যে উজ্জ্বল রত্নহার সঞ্চিত ছিল, তাহা তখন কেহ জানিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর প্রাণে যে রণ-ক্রীড়ার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল, এইবার বিধাতার অনুগ্রহে সেই কর্ম্মক্ষেত্রের চির অর্গলরুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইল। বঙ্গীয় নেতৃবৃন্দের আবেদনে গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীদিগকে সৈনিকরূপে গ্রহণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সমগ্র বঙ্গদেশে বিদ্যুৎবেগে এই ঘোষণাবাণী প্রচারিত হইল। বঙ্গের গ্রাম-নগর এই শুভ-আহ্বানের পাঞ্চজন্য-রবে মুখরিত হইয়া উঠিল। দলে দলে যুবকগণ জাতীয় মহাযজ্ঞে যোগদান করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের জাতীয়তার ললাটে শত শত বর্ষের যে কলঙ্ক-টীকা অঙ্কিত ছিল, সেদিন তাহারা স্ব স্ব শোণিত দানে সেই কলঙ্ক-চিহ্ন প্রক্ষালন করিবার জন্য ব্রিটীশ রণ-পতাকার নিম্নে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল,—কোনও আকর্ষণ তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। ম্যাক্সিম্-গানের সম্মুখে বাঙ্গালী বীর বক্ষ প্রসারণ করিয়া দণ্ডায়মান

হইবে, ইহাই বিধাতার ইচ্ছা। যে দিন রণ-দুন্দুভির গভীর নিনাদে সুপ্ত বাঙ্গালীর হৃদয়ে জাগরণের প্রেরণা অনুভূত হইল,—যে দিন বঙ্গসন্তান তাহার ছায়াশীতল শান্তিময় নিবিড় গৃহকোণ পরিত্যাগ করিয়া দেশমাতৃকার শিরে গৌরব-মুকুট পরাইবার জন্য রণ-সমুদ্রের ভীষণতার মধ্যে ঝম্প প্রদান করিল, বাংলার ইতিহাসে সে এক মহাগৌরবময় স্মরণীয় দিন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে একবার বাঙ্গালী সৈনিক হইবার জন্য আবেদন করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিল। ১৯১৬ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার এক সৈন্য-সংগ্রহ-সভায় বলিয়াছিলেন,—"১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন আফগান সীমান্ত প্রদেশে পাঁজদা ব্যাপার লইয়া রুষের সহিত ব্রিটিশের সংঘর্ষের সূচনা হয় তখন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ৫৭০ শত সুশিক্ষিত বাঙ্গালী স্বেচ্ছা-সৈনিক হওয়ার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন,—আমিও তাঁহাদের মধ্যে একজন; কিন্তু আমাদের আবেদন গ্রাহ্য হইল না। ১৮৮৫ সালের সেই আকাঙ্ক্ষা জাতির ভিতর এতদিন সুপ্তিমগ্ন ছিল,—একেবারে প্রাণ হারায় নাই।"

স্বর্গীয় ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক মহাশয় এই বার সৈন্য সংগ্রহের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করিলেন। বঙ্গীয় শুশ্রূষাকারিদলে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, সৈন্যবিভাগে তাঁহাদের অনেকে আসিয়া যোগদান করিতে লাগিলেন। কর্ণেল ট্যানার যে দিন সর্ব্বপ্রথম ৩০শে আগষ্ট তারিখে বাঙ্গালী সৈন্যদিগের নাম লিখাইয়া তাঁহাদিগকে ভর্ত্তি করিতে লাগিলেন, সেই দিনই ১২০ জন বাঙ্গালী যুবক তাঁহাদের সম্মেলন-স্থান প্রিন্সেপঘাট হইতে ফোর্ট উইলিয়মে গমন করিয়াছিলেন। এত উৎসাহী যুবক সৈনিক-ব্রত ধারণ করিবার জন্য সেই দিন উপস্থিত হইয়াছিলেন

যে, তাঁহাদের নাম লিখাইতেই ৭ দিন সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। যে সকল যুবক "সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ভদ্রবংশোদ্ভব শিক্ষিত পরিবারের, এবং অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তাঁহারা সিপাহীর সামান্য মাসিক বেতন ১১ টাকার লোভে ধাবিত হইতেছিলেন না, জননী জন্মভূমির গৌরববর্দ্ধনই তাঁহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। মাতৃভূমির গৌরবরূপ দেবী-মূলে তাই তাঁহারা তাঁহাদের বিদ্যা ও ধনার্জ্জনের অভিলাষকে বলিদান করিয়াছিলেন। ৪৮ দিনের মধ্যেই দুইটী সম্পূর্ণ বাঙ্গালী সৈন্যদল (২২৮ জন) গঠিত হইল। বাঙ্গালী সৈন্যদল 'ডবল কোম্পানী' নামে অভিহিত হইল। প্রথম দলেই মেডিকেল কলেজের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর কয়েক জন ছাত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল কুমার অধিক্রম মজুমদার এবং মাছদাঘির জমিদার মিঃ এস, রায় যোগদানপূর্ব্বক শিক্ষা-ক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছিলেন। যে দেশে বহু দিন যাবৎ সামরিক শক্তি সুপ্ত ছিল, সে দেশের পক্ষে এত শীঘ্র এত সৈন্য সংগ্রহ হওয়াই খুব আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। ভারতের তৎকালীন বড়লাট বাহাদুর এবং প্রধান সেনাপতি এই সৈন্যসংগ্রহ-ব্যাপারে আনন্দপ্রকাশ করিয়া সৈন্যসংগ্রহ-কমিটীর সম্পাদক ডাঃ এস, কে, মল্লিক মহাশয়ের নিকট তার প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী সৈনিক যখন শিক্ষাকেন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন প্রত্যেক রেল-ষ্টেশনে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন হইয়াছিল;—তাঁহাদের গমন-পথ জয়নিনাদ-মুখরিত, কুসুমসমাকীর্ণ, আলোকোদ্ভাসিত এবং পুরনারীবর্গের মঙ্গলাশীর্ব্বাদসূচক শঙ্খধ্বনি-নিনাদিত ও লাজমণ্ডিত হইয়াছিল। রণগমনোন্মুখ বাঙ্গালী সৈন্যের হাস্যপ্রফুল্ল

বীরত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী দর্শন করিয়া তখন প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়ে উৎসাহ ও আনন্দের একটা তড়িৎ-ক্রীড়া চলিতেছিল। বঙ্গের প্রত্যেক নগরে সৈন্য-সংগ্রহের সভায় নবগৃহীত যুবকদলের উপর অজস্র কুসুমবর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগেকে বিদায় দেওয়া হইতে লাগিল। বঙ্গের জল-স্থল, গগন-পবন যেন বহুযুগ পরে আবার গাণ্ডীবের টঙ্কার এবং পৌণ্ড্র ও পাঞ্চজন্যের গভীর নিনাদে মুখরিত হইয়া উঠিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য যে সব যুবক অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদের অধিকাংশকেই শারীরিক অযোগ্যতার জন্য হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইতেছিল; কারণ সামরিক বিভাগের নিয়মানুসারে প্রত্যেক সৈনিকের উচ্চতা ৫ ফিট ৪ ইঞ্চি হওয়া আবশ্যক, কিন্তু বাঙ্গালী জাতি উচ্চতায় ইউরোপীয় জাতির তুল্য নহে। ইউরোপীয় অথবা উত্তর ভারতীয় জাতিসমূহের পরিমাপ বাঙ্গালীদিগের প্রতি প্রযোজ্য হইলে অধিকাংশকেই যে অযোগ্য বিবেচনায় ফিরিয়া যাইতে হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গুর্খাদিগের উচ্চতা ৫ ফিট হইলেই তাহারা সমর-বিভাগে প্রবেশলাভ করিতে পারে, বাঙ্গালী সৈন্যের প্রতিও যদি সেই নিয়ম প্রযোজ্য হইত, তবে একটী রেজিমেন্ট * গঠন করিতে বোধ হয় অতটা সময়ক্ষেপ হইত না।

যখন বঙ্গের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বাংলার নেতৃবৃন্দ সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন, তখন বঙ্গের মাতৃশক্তিও জাগরিত হইয়া এই জাতীয় মহাশক্তির উদ্বোধনে আপন শক্তি নিয়োগপূর্ব্বক ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যত্নবতী হইয়াছিলেন। মাতৃজাতির যে স্নেহ-কাতরতা বাঙ্গালী সন্তানকে এতদিন অকর্ম্মণ্য, দুর্ব্বল ও গৃহকোণবাসী

* একটী রেজিমেন্টে প্রায় ১৭০০ সৈন্য থাকে।

করিয়া রাখিয়াছিল, সেই দিন সেই পাঞ্চজন্য-নিনাদে মাতৃজাতি তাঁহাদের চিরাচরিত স্নেহদুর্ব্বলতা বিসর্জ্জন দিয়া উৎসাহবাণীতে সন্তানদিগকে সমরাঙ্গণে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বঙ্গের সে একটা চিরস্মরণীয় দিন। সম্ভ্রান্তগৃহের মহিলাগণ অবরোধকে উপেক্ষা করিয়া রেল-ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া সমাগত জনমণ্ডলী-সমক্ষে রণক্ষেত্র-যাত্রী পুত্রগণকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক জাতীয়তার প্রাচীন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। বেঙ্গলী ডবল কোম্পানীর ২য় সৈন্যদল যখন শিক্ষাকেন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করে, তখন কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল কুমার অধিক্রম মজুমদার এবং অটলবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জননীদ্বয় হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া বঙ্গের তরুণ বীরপুত্রগণকে ধান্যদূর্ব্বা এবং চন্দনদ্বারা আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন। সমাগত জনগণ বিংশশতাব্দীর এই অভাবনীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলেন। সংবাদপত্রের ইংরাজ সম্পাদকগণ এই ব্যাপার উপলক্ষে স্ব স্ব পত্রিকায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"বঙ্গের এই অভাবনীয় অনুষ্ঠান বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসকে সত্য সত্যই গৌরবমণ্ডিত ও উজ্জ্বল করিয়াছে,—এই অনুষ্ঠান জাতির নবচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে।"

এই সময় বঙ্গের মাতৃজাতি সমবেত হইয়া **'মহিলা সমিতি'** নামে একটী সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অর্থ সঞ্চয়পূর্ব্বক তাঁহাদের যুদ্ধযাত্রী বীরপুত্রদিগকে নিত্য আবশ্যক দ্রব্য-পরিপূর্ণ এক একটি ব্যাগ উপহার দিতে আরম্ভ করিলেন। এই ব্যাগে একখানা বিছানার চাদর, ১ খানা তোয়ালে, ১টি তুলার ফতুয়া, ১ জোড়া মোজা, ১ প্যাকেট চিঠির কাগজ, ৫০ খানা

থাম, ২ প্রকার সাবান, ১টী পেন্সিল, ১ খানা চিরুণী, ১টী ব্রুস, ১ খান আর্শি, ২ খানা খাকি রুমাল, মসলা পরিপূর্ণ ১টী থলে, ১ খানা ছুরি ১ খানা এলুমিনামের থালা, ১টা এলুমিনামের গ্লাস, ১টা খাকি সার্ট ১ জোড়া জুতার ফিতা, ১ ডজন সার্টের বোতাম, ৬টা ছুঁচ, ৬টা সেফ্‌টি পিন, ১ কৌটা টুথ পাউডার, ৪ প্যাকেট সিগারেট এবং দুই বাক্স দেয়াশলাই ছিল। প্রত্যেকটী ব্যাগে ৯ টাকার সামগ্রী থাকিত। যাহারা প্রথম প্রথম ডবল কোম্পানীতে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে উক্ত ব্যাগ ব্যতীত শীতপ্রধান দেশের ব্যবহারোপযোগী একটা সোয়েটার, একটা সার্ট, তুলাভরা কোট, এবং মোজা প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু যখন ক্রমশঃই সৈনিক-সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন অর্থাভাবে মহিলা-সমিতি অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাদের কার্য্যবন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। বঙ্গের মাতৃজাতির এই সাধু প্রচেষ্টার মূলে যে কতটা জাতীয় জাগরণের বীজ নিহিত রহিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। "**না জাগিলে ভারত-ললনা ভারত যে আর জাগে না জাগে না**";—বঙ্গনারী সেই দিন কবির এই মহাবাণী হৃদয়ঙ্গম করিয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া ছিলেন, তাই বঙ্গসন্তানও অমন করিয়া একটা বিরাট অনুপ্রেরণায় রণবেশে সজ্জিত হইয়া মহাশক্তি সাধনকল্পে রণাঙ্গণে ধাবিত হইয়াছিল। বঙ্গের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গগনে পবনে চিরদিন বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হইতে থাকুক, "না জাগিলে ভারত-ললনা ভারত যে আর জাগে না জাগে না।"

১৯১৬ সালের ৩০শে আগষ্ট তারিখে বাঙ্গালী ডবল কোম্পানীতে সৈন্য ভর্ত্তি হইতে আরম্ভ করে। ১৫ই নভেম্বর যুদ্ধবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ডবল কোম্পানী পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহা হইলে

দেখা যাইতেছে, ডবল কোম্পানী পূর্ণ হইতে ৭৫ দিবস লাগিয়াছিল, কিন্তু ৭৫ দিবসের মধ্যে পূজাবকাশ পড়ায় সেই এক মাস সৈন্যসংগ্রহ হয় নাই, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে ৪৮ দিবসের মধ্যেই ডবল কোম্পানী পূর্ণ হইয়াছিল বলিতে হইবে। আরও সৈন্য লওয়া হইবে কি না কর্তৃপক্ষ কোনও মতামত প্রকাশ না করায় সৈন্যসংগ্রহেব জন্য তেমন কোনও চেষ্টা করা হয় নাই,—দুই চারি জন যাহারা আসিতেছিল, তাহাদিগকেই ভর্ত্তি কবা হইতেছিল মাত্র। বেঙ্গল ডবল-কোম্পানীব নির্দ্ধারিত সৈন্যসংখ্যা পূর্ণ হওয়ায় এবং উক্ত সৈন্যদলের শ্রমশীলতা, সচ্চরিত্রতা, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দর্শন করিয়া গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালী সৈন্য দ্বারা একটী ব্যাটেলিয়ান (Battalion) * গঠনেব ইচ্ছা করিয়া ডাক্তাব ৺শরৎকুমাব মল্লিক মহাশয়কে এ বিষয়ে যত্নবান্ হইতে অনুরোধ করেন। এই সময় গভর্ণমেণ্ট গোলন্দাজ বিভাগেব (Artillery) জন্য বাঙ্গালী অশ্বচালক, সাঙ্কেতিক দলের (Singal Companies) জন্য বাঙ্গালী কর্ম্মচারী এবং ফ্রান্সে সমর-ক্ষেত্রের জন্য ৩টী শ্রমিক দল চাহিয়াছিলেন। প্রত্যেক শ্রমিক দলে ২০০০ শ্রমিক থাকিবে।' বলা বাহুল্য, এই সব বিভাগই বাঙ্গালীর দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল।

ডবল কোম্পানী পূর্ণ হওয়ায় কয়েকদিন যে একটা নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছিল, আবার এই ব্যাটেলিয়ন গঠনের ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী একটা জাগরণের সাড়া পড়িল। নেতৃগণ নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। জাতীয় উন্নতির পথ মুক্ত দেখিয়া দলে দলে বঙ্গজননীর সন্তানগণ আসিয়া এই জাতীয় যজ্ঞে যোগদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৯১৭ সালে ৩রা জুলাই

* একটি Battalion এ ৫০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত সৈন্য থাকে।

কলিকাতা টাউন-হল-সভায় ডাঃ মল্লিক ঘোষণা করিলেন,—"বিগত ২৬ শে জুন মঙ্গলবার বাঙ্গালী ব্যাটেলিয়নের প্রথম দল (৯১২ জন) পূর্ণ হইয়াছে, এখন যাহারা ভর্ত্তি হইতেছে, তাহাদের দ্বারা দ্বিতীয় দল গঠিত হইতেছে। উক্ত ৯১২ জনের মধ্যে মাত্র ৬৮ জন মুসলমান, অবশিষ্ট হিন্দু।" ব্যাটেলিয়নের ১ম দল পূর্ণ হওয়ায় গভর্ণর মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী ডাঃ মল্লিককে জানাইলেন, "গভর্ণর বাহাদুর ১ম ব্যাটেলিয়ন পূর্ণ হইয়াছে শুনিয়া বিশেষ আনন্দপ্রকাশ-পূর্ব্বক যাহাতে ২য় ব্যাটেলিয়ন গঠিত হয় তদ্বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।"

বাঙ্গালী ডবল কোম্পানী শিক্ষাকালে ৪৬ সংখ্যক পাঞ্জাব-বাহিনীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। তখন উক্ত বাহিনীর নায়ক কর্ণেল এইচ্ মক্লাব নওসেরা শিক্ষাকেন্দ্র হইতে ডাঃ মল্লিককে জানাইয়াছিলেন,—"বাঙ্গালী সৈনিকের শিক্ষাবিষয়ে আপনি জানিতে চাওয়ায় আপনাকে আমি আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, তাহারা এখন যে ভাবে দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছে, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারা অচিরেই শিক্ষা সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইবে। সাধারণ সৈনিকদল অপেক্ষা তাহারা অধিকতর বুদ্ধিমান্ এবং তাহাদের আচরণ অতিশয় প্রশংসাজনক। তাহাদের কার্য্যতৎপরতা দর্শনে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, শিক্ষাবসানে বাঙ্গালী সৈনিক যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইবে তখন তাহাদের অধিকাংশই যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদর্শনে সমর্থ হইবে। বাঙ্গালী সৈনিকগণ তাহাদের জাতীয় গৌরব বর্দ্ধনের জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত।"

১৯১৭ সালে ২০ শে মে তারিখে লেপ্টেনাণ্ট টেলার মেদিনীপুরে

এক সভায় বলিয়াছিলেন, যে ৮ মাস বাঙ্গালী সৈনিক পরিচালনে আমার সুযোগ ঘটিয়াছিল, সে কয়মাস আমি নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলাম। আমি তাহাদের কার্য্যদক্ষতায় এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি যে, আমার মনে হয়, বাঙ্গালী ভারতবর্ষীয় কোনও যোদ্ধৃজাতি অপেক্ষা রণনিপুণতায় হীন নহে।"

১৯১৭ সালের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে বাঙ্গালী ব্যাটেলিয়নের শিক্ষাকেন্দ্র হইতে মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে যাত্রা উপলক্ষে সিমলা 'আর্মি হেড্ কোয়ার্টার্স' হইতে ২৭ শে জুলাই ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার চার্লস্ মন্রো ডাঃ মল্লিককে জানাইলেন, "আপনার সৈন্যসংগ্রাহক সমিতি শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, বাঙ্গালী ব্যাটেলিয়ন মেসোপটেমিয়ায় যাত্রা করিয়াছে। তথায় তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাহাদের রণ-শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে পারিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহারা বঙ্গের গৌরব রক্ষা করিতে এবং ভারতীয় সৈনিকবিভাগের একটী অংশবিশেষে পরিণত হইতে সমর্থ হইবে।"

কৃত্রিম-যুদ্ধে কৃতিত্ব—বাঙ্গালী ব্যাটেলিয়ন তাহাদের শিক্ষাকালে নওসেরায় একটী কৃত্রিম যুদ্ধে কিরূপ রণনীতি ও বুদ্ধি-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল তাহা ১৯১৬ সালের ২৪ শে নভেম্বর তারিখে নওসেরা হইতে প্রাইভেট বি, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ডাঃ মল্লিকের নিকট লিখিত পত্র হইতে জানিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—"* * * * বাঙ্গালী জাতি যে একেবারে কাপুরুষ নহে তাহা গতকল্য সপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। পাঠান এবং বাঙ্গালী সৈন্যদিগের মধ্যে একটী কৃত্রিম যুদ্ধ হইয়াছিল, পাঠানেরা প্রতিরোধকারী এবং আমরা আক্রমণ-কারীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলাম। এখানে বাঙ্গালীদের

১১টী দল (Section) আছে, তন্মধ্যে ৬টী দল বন্দুক লাভ করিয়াছে। সেনাপতি (Commanding Officer) প্রত্যেক সেক্‌সনের শিখ শিক্ষাদাতাকে সেই দলের কাপ্তেন নিযুক্ত করিলেন। বাঙ্গালী অফিসারেরা শিখ-কাপ্তেনের অধীন কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত হইলেন। হাবিলদার অধিক্রম, ল্যান্স নায়ক নীরদবন্ধু, এবং ২৫ জন প্রাইভেট দ্বারা হাবিলদার শিখ বিন্ধ্যসিংহের অধিনায়কত্বে প্রথম দল গঠিত হইল। নায়ক শিখ রাধাসিংহের অধিনায়কত্বে নায়ক ধীরেন্দ্রকুমার, যতীন্দ্রকুমার এবং ২৫ জন প্রাইভেট দ্বারা দ্বিতীয় দল গঠিত হইল। শিখ শিক্ষাদাতা মুক্কাসিংহের অধিনায়কত্বে হাবিলদার অনাদি, ল্যান্স নায়ক ফণীন্দ্র ও বিমল সিংহ এবং ২৫ জন প্রাইভেট লইয়া তৃতীয় দল গঠিত হইল। চতুর্থ দলে প্রাইভেট আন্দিমুরের (বাঙ্গালী) অধিনায়কত্বে ২৫ জন প্রাইভেট। পঞ্চম দলে শিখ শিক্ষাদাতা রাধাসিংহের অধিনায়কত্বে নায়ক দুর্গাপ্রসাদ, ল্যান্স নায়ক প্রকৃতিকুমার ঘোষ এবং ২৫ জন প্রাইভেট। ষষ্ঠ দলে শিক্ষাদাতা ভাল সিংহের অধীনে নায়ক অরুণকুমার এবং ২৫ জন প্রাইভেট। এইরূপে ৬টী দল গঠিত হইল, অবশিষ্ট ৫টী দল বন্দুক পায় নাই, সুতরাং তাহাদিগকে এই কৃত্রিম যুদ্ধে লওয়া হইল না; তাহাদিগকে শুশ্রূষাকারিদলে এবং রিজার্ভ দলে রাখা হইল।

"যুদ্ধ দিনের পূর্ব্ব রাত্রিতে সেনাপতি প্রাইভেট সুধীন্দ্রকুমার রায়কে গুপ্তচরের কার্য্যে প্রেরণ করিলেন, সুধীন্দ্র পাঠানদিগের সতর্কতার মধ্যেও তাহাদিগের দৃষ্টি এড়াইয়া তাহাদের সমুদয় বন্দোবস্তের একটী মানচিত্র অঙ্কনপূর্ব্বক সেনাপতির হস্তে অর্পণ করিলেন।

"প্রথমতঃ ১ম ও ৩য় দল, তৎপর ২য় ও ৫ম দল, এবং সর্ব্বশেষে ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ দল অগ্রসর হইল। এই সৈন্যদল প্রায় ৪ মাইল পথ মার্চ করিয়া

অগ্রসর হইলে সন্ধানী-দলের সঙ্কেতে জানিতে পারিল যে, শত্রুপক্ষ দেখা যাইতেছে। তখন সেনাপতি বিভিন্ন সেক্‌সনকে (দল) দ্রুত অগ্রসর (Double march) হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। তাহারা ন্যূনাধিক ১০০ গজ অগ্রসর হইতে না হইতেই শত্রু-পক্ষ গুলিনিক্ষেপ আরম্ভ করিল, সুধীন্দ্রের অঙ্কিত মানচিত্রানুযায়ী সেনাপতি ১ম ও ৩য় দলকে দক্ষিণে, ২য় ও ৫ম দলকে মধ্যস্থলে এবং ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ দলকে যথাক্রমে দক্ষিণে ও বামে অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। শত্রু-পক্ষ একটা পাহাড়ের পার্শ্বে সুরক্ষিত অবস্থায় থাকিয়া গুলি নিক্ষেপ করিতেছিল; ১ম ও ২য় দলের প্রায় সমুদয় সৈন্যই শত্রুর পরিখার (Trench) নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শত্রু-নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে নিহত হইল। হাবিলদার অনাদি শত্রু-পক্ষের অশ্রান্ত গুলিবর্ষণের ফলে ৩য় দল লইয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ৪র্থ ও ৫ম দল বামদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেছিল, তখন আন্দিমুর রায় সহসা ৪র্থ দল লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইত্যবসরে ৩য় দলের অধিনায়ক হাবিলদার অনাদি তাঁহার সেনাদল লইয়া বিশেষ দক্ষতা সহকারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সহসা দেখা গেল যে, বাঙ্গালী সৈন্যের একদল পাঠান সৈন্যের রিজার্ভ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। ৪র্থ দল শত্রুর দৃষ্টির অন্তরালে বহির্গত হইয়া তাহাদের উপর নিপতিত হইয়াছিল। পাঁচ-ঘণ্টাব্যাপী তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছিল, কোনও পক্ষেরই জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সেনাপতি ইহাকে 'জয়-পরাজয়হীন যুদ্ধ, (Drawn battle) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। শত্রুপক্ষীয়েরা বলিতে আরম্ভ করিল, 'বাঙ্গালী সৈন্যের চাতুর্য্যপূর্ণ সন্ধান-দক্ষতায় (Scouting) এবং পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ-কৌশল দর্শনে আমরা বিস্মিত হইয়াছি।' পাঠানদিগের দলে অসংখ্য সুনিপুণ

সন্ধানী (Scout) ছিল; কিন্তু তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, একজন বাঙ্গালী গুপ্তচর এমন সূক্ষ্মভাবে পাঠানদিগের, বিলিব্যবস্থার সন্ধান লইতে সমর্থ হইবে। সেনাপতি উভয় পক্ষীয় সৈন্যদলের সম্মুখে সুধীন্দ্র এবং আন্দিমুর রায়কে বীর বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন।"

বাঙ্গালী সৈনিকগণ দেশনায়কগণের সহিত দেশে দেশে ঘুরিয়া উৎসাহবাণীতে সকলকে আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক স্থানেই তাঁহারা দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হইতে লাগিলেন। সভায় সভায় তাঁহাদের শিরে দেশবাসীর আশীর্ব্বাদ ও প্রীতির অর্ঘ্যস্বরূপ কুসুমদাম বর্ষিত হইতে লাগিল। রংপুর সৈন্যসংগ্রহ-সভায় হাবিলদার ধীরেন্দ্রনাথ সেন বলিয়াছিলেন,—"আপনাদের এ ফুল আমাদের আশীর্ব্বাদ, দেশবাসীর আন্তরিক আশীর্ব্বাদে আমাদের জীবন জয়যুক্ত ও গৌরবমণ্ডিত হইবে সন্দেহ নাই। আমরা ফুলের জন্যই দেশে দেশে ঘুরিতেছি,—আমরা ফুল-ই চাই,—কিন্তু সে এ ফুল নহে,—সে ফুল বৃক্ষজাত নহে,—বঙ্গজননীর গৃহে গৃহে যে ফুল ফুটিয়া আছে, আমরা সেই ফুলের আশায় আসিয়াছি। তাঁহাদের সে প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। অল্পদিন মধ্যেই বঙ্গীয় ব্যাটেলিয়নে এত সৈন্য সংগৃহীত হইল যে, গভর্ণমেণ্ট উহাকে একটী বাহিনীতে (Regiment) পরিণত করিলেন। এই বঙ্গবাহিনীর নাম হইল—

৪৯ সংখ্যক বঙ্গ-বাহিনী

(49th Bengalee Regiment)

যতদিন পর্য্যন্ত একটী রেজিমেণ্টে আরও তত সংখ্যক রিজার্ভ সৈন্য সংগৃহীত না হয়, ততদিন সেই রেজিমেণ্ট যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের উপযোগী

হয় না; সুতরাং এই বঙ্গবাহিনীকে রণক্ষেত্রে প্রেরণের উপযোগী করিবার জন্য আরও সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা চলিতে লাগিল। ভগবান্ বাঙ্গালীর সে আশা পূর্ণ করিলেন। ৪৯ সংখ্যক বঙ্গবাহিনী যথাসময়ে মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইল। সেই দিন বাঙ্গালীর বহু-যুগের আশা ফলবর্তী হইল। এই সৈন্য-সংগ্রহ-ব্যাপারে পূর্ব্ববঙ্গ যে বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহাতে তাহার অতীত বীরত্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ এক রেজিমেণ্টের অধিক সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহার পূর্ব্বগৌরবের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বিস্মৃত হয় নাই।

বিগত মহাসমরে বাঙ্গালী জাতির যুদ্ধাধিকার ফরাসী গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রথমে প্রদান করেন। বাংলার ফরাসী-রাজ্য চন্দননগরে সর্ব্বাগ্রে এই শুভানুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের অনুসরণ করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে ডিসেম্বর ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সভাপতি মহোদয় আজ্ঞা প্রচার করেন যে, ফরাসী-ভারতের প্রজাগণ স্বেচ্ছায় সৈন্য-বিভাগে যোগদানপূর্ব্বক যুদ্ধে গমন করিতে পারিবে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে চন্দননগরে এই ঘোষণাবাণী প্রচারিত হইবামাত্র বাঙ্গালী যুবকগণের মধ্যে একটা অননুভূতপূর্ব্ব জাগরণের সাড়া পরিলক্ষিত হয়। এই আদেশবাণী প্রচারিত হইবামাত্র মেয়র মহাশয়ের নিকট আবেদন-পত্র আসিতে লাগিল। সিদ্ধেশ্বর মল্লিক ও নরেন্দ্রনাথ সরকার সর্ব্বপ্রথমে আবেদন করেন। এই যুবকদ্বয়ই বাঙ্গালীর রুদ্ধ কর্ম্ম-পথের অগ্রযাত্রী,—ইঁহারাই প্রথম পথপ্রদর্শক। যাঁহারা কোনও একটা জাতীয় মঙ্গলানুষ্ঠানের প্রথম উদ্যোক্তা, তাঁহারা সমগ্রজাতির ও দেশের বরেণ্য সন্দেহ নাই। সিদ্ধেশ্বর এবং নরেন্দ্রনাথও প্রথম যে গৌরব-

পতাকা, ধারণ করিয়া বহুদিনের অবরুদ্ধ কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথে অগ্রসর হইয়া সমস্ত বাঙ্গালী জাতির পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন, সে পতাকা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত থাকিবার সামগ্রী। সিদ্ধেশ্বর বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান, সংসারের একমাত্র সান্ত্বনা; তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া আই, এ, পড়িতেছিলেন। কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বানে যখন তিনি অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন, তখন জননীর অশ্রুধারা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। স্বেচ্ছাসৈনিক-গণের মধ্যে নরেন্দ্র বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি তিনটী সন্তানের পিতা; বৃদ্ধ মাতাপিতা বর্ত্তমান, সংসারের তিনিই একমাত্র প্রতিপালক। তিনি যখন মাতাপিতা ও রোগ-শয্যায় শায়িতা স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া আসেন, তখন তাঁহার শিশু কন্যা ছল ছল চোখে পিতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিল, "বাবা, আমরা কার কাছে থাক্‌বো?" নরেন্দ্র কোনও উত্তর প্রদান না করিয়া অকম্পিত হৃদয়ে চলিয়া আসিলেন। ১৭ই এপ্রিল (১৯১৬) কুড়ি জন বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসৈনিক চন্দননগর হইতে পণ্ডিচারী যাত্রা করেন। সেদিন সমগ্র নগর একটা বিরাট চাঞ্চল্যে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ২০ জন বাঙ্গালী সৈনিক এক বিরাট জনতার অগ্রে অগ্রে ফরাসীর ত্রিবর্ণ পতাকা বহন করিয়া গৌরবময় পদবিক্ষেপে চন্দননগর রেল ষ্টেশনে গমন করিলেন। বাঙ্গালীর সেই সমর-যাত্রা দেখিবার জন্য পথের দুই পার্শ্বে গবাক্ষে গবাক্ষে শত শত শতদল বিকসিত হইয়া উঠিল; পথের দুই পার্শ্ব হইতে অসংখ্য নরনারী তাঁহাদের উপর কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিল। শঙ্খধ্বনি এবং মুহুর্মুহুঃ জয়নিনাদে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। বঙ্গের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি চন্দননগরের ষ্টেশনে সমবেত হইয়া এই

স্বেচ্ছা-সৈনিকদিগকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।*

বঙ্গের ফরাসী-প্রজা যুদ্ধশিক্ষার নিমিত্ত যখন পণ্ডিচারীতে অবস্থান করিতেছিল, তখন 'লেপ্টেনাণ্ট' মিল লিখিয়াছিলেন,—"পণ্ডিচারীতে আসিয়া অবধি বাঙ্গালী সৈনিক যেমন দক্ষতা সহকারে কার্য্য সম্পাদন করিয়া শিক্ষা বিষয়ে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে তাহাদের সুখ্যাতি না করিয়া পারা যায় না, এই তরুণ যুবকগণ প্রত্যেকেই সচ্চরিত্র, তাহাদের বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত কোনও অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ইহারাই আমার সেনাদলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই কথায় বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই।" ইহাদের কার্য্যদক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তা দর্শন করিয়া একজন উচ্চ সামরিক ফরাসী কর্ম্মচারী বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালীদের মত আমাদের সকল রেজিমেণ্টগুলি হইলে অনেক সুবিধা হইত।" সত্য ও ন্যায়ের অনুরোধে আমরাও বলিতে বাধ্য হইব যে, ফরাসী গভর্ণমেণ্ট গত মহাযুদ্ধে তাঁহাদের বাঙ্গালী সৈনিকদিগকে যে সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বাঙ্গালী সৈন্যদিগকে তাহা প্রদান করেন নাই। ফরাসী-রাজ্যের বাঙ্গালী সৈনিকগণ কামান শিক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে অল্পদিনেই সৈন্যবিভাগে ব্রিগেডিয়ার পর্য্যন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। †

* ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় এম. এ, লিখিত "ফরাসী ভারতে স্বেচ্ছাসৈনিক" নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

† প্রবাসী—বৈশাখ, ১৫২৪।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে বাঙ্গালী

জনৈক বাঙ্গালী সৈনিকের দিন-পঞ্জিকার একপৃষ্ঠা :—

ফ্রেঞ্চ ফোর্ট, ভার্দ্দুন,
১৪ই আগষ্ট, ১৯১৭,

'গতকল্য মধ্যরাত্রি হইতে ভার্দ্দুনের সম্মুখে ভীষণ গুলিবর্ষণ আরম্ভ হয়। প্রত্যূষে ভার্দ্দুন এবং আর্গোনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যুদ্ধ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। আমাদের ২য় সৈন্যদলের সহিত গোলন্দাজ-সৈন্য যোগদান করিয়া উহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিল। কামানসমূহকে বিশ্রাম না দি। শোণিত-সাগরে সন্তরণপূর্ব্বক আমরা সারাদিন গুলিবর্ষণ করিলাম। আমি একবার বহির্গত হইয়া চট্ চট্ শব্দ শুনিয়া প্রথমতঃ ইহার কোনই কারণ নির্ণয় করিতে পারিলাম না। অতঃপর যখন উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রায় ১০০ গজ উচ্চে মাথার উপর একখণ্ড কৃষ্ণ মেঘ দেখিয়া লম্ফ দিয়া বাহির হইলাম. তখন একটা ঘর্ঘর শব্দ শুনিতে পাইলাম। উপর হইতে একপ্রকার ছোট ছোট কুঁচি পড়িয়া আমার কোটে ছিদ্র করিতে লাগিল; পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সার্পনেল-গোলা আমাদিগকে বিব্রত করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হইতেছে। আমাদের কামান-শ্রেণী হইতে গুলি নিক্ষেপ সত্ত্বেও উহা প্রতিনিবৃত্ত হইল না, বরং গ্রাম, বাজার এবং নগরোদ্যানসমূহের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ...রস্থ নগরসমূহ ঐ দিবস শত্রুর তোপের আঘাতে বিমর্দ্দিত হইতেছিল, আমাদের কামানশ্রেণী হইতে অবিরল গোলাবর্ষণ কোনও প্রকার কার্য্যকর হইল না। দূরগামী-শক্তি-বিশিষ্ট কামানসমূহ প্রথম পদাতিক দলের সম্মুখে স্থাপন করিয়া আমরা চতুর্দ্দিকে শত্রুদলের উপর

মৃত্যুবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলাম। আমাদের আনন্দময় বিশ্রাম-দিবসের শান্তিময় গৃহস্বরূপ সীমান্ত প্রদেশের নারী এবং শিশুদিগের লাবণ্যময় উদ্বিগ্নমুখ স্মরণ করিয়াই তাহাদিগকে রক্ষার নিমিত্ত আমরা ঐ ভীষণ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।"

বাঙ্গালী সৈনিক-লিখিত দুইখানি পত্র

(১)

হাইয়ারস্‌, (ফ্রান্স)

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৬।

প্রিয় বসু মহাশয়,

"আপনি নিশ্চয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমরা শীঘ্রই সেলোনিকার সমরক্ষেত্রে যাত্রা করিব। বাঙ্গালীই সেখানে প্রথম প্রেরিত হইবে। আমরা সেই প্রকারই আবেদন করিয়াছিলাম, আমাদের আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে। কিছুদিন হইল প্রস্তাব হইয়াছে যে, আমাদের মধ্যে কোনও কোনও সৈনিককে কর্ম্মচারী পদে উন্নীত করা হইবে। যেদিন আমার বন্ধুগণ জয়-গৌরবে বিভূষিত হইয়া জয়-ডঙ্কা নিনাদ করিতে করিতে আবার মধুময় বঙ্গজননীর ক্রোড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, আপনারা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করুন। তবে এখন আসি। এই পত্র যেদিন আপনার নিকট পৌঁছিবে, আমি হয় ত সেই দিন যুদ্ধস্থলে থাকিব।

আপনার

শ্রীহারাধন বক্সী।

(২)

টুলন, (ফ্রান্স)

২৮ শে জুন, ১৯১৭।

......আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের গৌরবের দিন উপস্থিত হইয়াছে। কল্য প্রভাতে আমরা——স্থানে যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিব। জীবন-মরণ সংগ্রামের সময় আসিয়াছে। আমাদের যতদূর সাধ্য যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালীর শক্তির পরিচয় দিব। আমরা দেখাইব যে, বাঙ্গালী ভীরু নহে। * * * * জার্ম্মাণদিগকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে আমরা যথাসাধ্য আয়োজন করিতেছি।

কে, মুখার্জ্জি।

বাঙ্গালী বহু দিন পরে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক রণক্রীড়ার সুযোগ পাইয়া কিরূপ আনন্দিত হইয়াছে তাহা উপরোক্ত পত্র দুইখানি হইতেই বিশেষ উপলব্ধি হইবে। প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীকে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। সুযোগের অভাবে যদিও বাঙ্গালীর বীর্য্য-বহ্নি দিন দিন নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তথাপি তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। বিগত মহাসমরে বাঙ্গালী ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত করিয়াছে যে, সুযোগ ও সুবিধা পাইলে যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালী ভারতীয় অপরাপর কোনও জাতি অপেক্ষা পরাক্রম, নির্ভীকতা ও বুদ্ধিচাতুর্য্য প্রদর্শনে কুণ্ঠিত নহে। প্রায় ৭ হাজার বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান সৈনিকব্রত অবলম্বন করিয়া মেসোপটেমিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। যে দেশে দীর্ঘকাল সামরিক শক্তি সুপ্ত ছিল, সহসা সে দেশের পক্ষে এমন অভাবনীয় জাগরণ একটা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।

উত্তর বঙ্গের একটী যুবক সৈনিক হওয়ার জন্য উপস্থিত হইলে ডাক্তারী পরীক্ষায় তাঁহার বুকের মাপ উপযুক্ত মাপ অপেক্ষা কিছু কম হওয়ায় তাঁহাকে গ্রহণ করা হইল না, কিন্তু যুবকটীর সৈনিক হওয়ার এতদূর আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বক্ষের বিস্তৃতি বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যায়ামের ফলে তাঁহার বক্ষস্থল প্রশস্ত হইল, তখন তিনি পুনরায় আসিয়া সৈনিকদলে ভর্ত্তি হইলেন।

যুদ্ধ শেষ হইলে গভর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত ব্যয় বিবেচনায় ৪৯ সংখ্যক বঙ্গবাহিনী পোষণ করা আর সঙ্গত মনে করিলেন না, সুতরাং তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া হইল। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে,—"কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাজী," এ ক্ষেত্রেও যে তাহাই হইল তাহাতে সন্দেহ নাই।

সমরক্ষেত্রে কয়েকজন কৃতী বাঙ্গালী

ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার মুখার্জ্জি, আই-এম্-এস্—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র কল্যাণকুমার ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল্, এম্, এস্ পাশ করিয়া আপ্কার কোম্পানীর জাহাজে চিকিৎসকের পদ গ্রহণপূর্ব্বক ১৯০৬ এবং ১৯০৭ সালে প্রশান্ত মহাসাগরস্থ নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। অনন্তর শিক্ষার উন্নতিসাধন মানসে উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি

ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার মুখার্জ্জি

—২১৮ পৃষ্ঠা

১৬ই মে (১৯০৭) তারিখে বিলাত যাত্রা করেন। ঐ বৎসরই এল্-আর-সি-পি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর নভেম্বর্ মাসে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-পি-এইচ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে আই-এম-এস্ পাশ করিয়া কল্যাণকুমার ৩১ শে জানুয়ারী ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌসহরে অবস্থান করিয়া তিনি কোহাটে বদলী হইলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কল্যাণকুমার ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হইয়া ডিসেম্বর মাসে সিভিল-লাইনে প্রবেশপূর্ব্বক ডেপুটী স্যানিটারী কমিশনার পদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে ইনি কুচবিহার-মহারাজের দ্বিতীয় ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করেন। ইউরোপে যখন যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠে, তখন আগষ্ট মাসে সামরিক বিভাগ হইতে কর্ত্তব্যপালনের জন্য প্রস্তুত থাকিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ১লা অক্টোবর ক্যাপ্টেন কল্যাণ কুমার রাওলপিণ্ডি যাত্রা করেন। তারপর যখন সত্য সত্যই যুদ্ধে গমনের আদেশ আসিল, তখন তিনি সৈনিক দলের ডাক্তার রূপে ১৯১৫ সালের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে পারস্যোপসাগরে যাত্রা করিলেন।

আর্ত্তসেবা করিতে করিতে কল্যাণকুমার দুইবার গুরুতর ভাবে আহত হইয়াও পুনরায় যুদ্ধে যোগদান করেন। কুটের অবরোধকালে ইনি জেনারেল টাউনসেণ্ডের সহিত টাইগ্রীস নদীর তীরে তুর্কীহস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। মুক্ত হইয়া পরে পুনরায় তুর্কী-হস্তে নিপতিত ও বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় ইউরোপে কোনও তুর্কী নগরে টাইফয়েড জ্বরে এই বীর যুবকের বীরত্বময় জীবনের অবসান ঘটে। কল্যাণ তাঁহার বীরত্ব, নির্ভীকতা ও কার্য্যকুশলতার জন্য সামরিক বিভাগ কর্ত্তৃক "মিলিটারী ক্রস্"-রূপ গৌরব-ভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ সৈন্য-

দলে "ভিক্টোরিয়া ক্রস্" সাহসিকতার জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সম্মান, "মিলিটারী ক্রস্" তাহারই নিম্নে।

ক্যাপ্টেন জ্যোতিলাল সেন, আই-এম্-এস্—ইনি নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের বাবু বিহারীলাল সেনের পুত্র। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জ্যোতিলাল ইণ্ডিয়ান মিলিটারী সার্ভিসে ভর্ত্তি হন। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার জন্য ইনিও 'মিলিটারী ক্রস্''-রূপ জয়মাল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

অজিতকুমার রুদ্র—বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রিটিশ রেজি-মেণ্টে ভর্ত্তি হইবার গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, অজিতকুমার তাঁহাদের মধ্যে একজন অন্যতম। ইনি দিল্লী সেণ্ট্ ষ্টিফেন্স কলেজের অধ্যক্ষের পুত্র। অজিতকুমার সিংহলে কাণ্ডিব অন্তর্গত ট্রিনিটী কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। ইউরোপে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন তিনি সামরিক বিভাগে যোগদান করিবার' আশায় এত দূর উত্তেজিত হইয়া উঠেন যে, কোনও প্রকারে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে গমন-পূর্ব্বক ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'রয়েল ফুসিলায়ার' (Royal Fusilier) নামক প্রাচীনতম ব্রিটিশ পদাতিক সৈন্যদলে ভর্ত্তি হন। উক্ত সৈন্যদল জার্ম্মাণ-দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইলে অজিতও তৎসঙ্গে প্রেরিত হইলেন। ফ্রান্সে সোম-যুদ্ধে তিনি শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে ভীষণ রূপে আহত হন। আরোগ্যলাভ করিয়া ইনি পুনরায় ফ্রান্সে গমন-পূর্ব্বক ইয়ং মেনস্ এসোসিয়েসনের সহিত যোগদান করেন। যুদ্ধ শেষ হইবার কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সামরিক দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ কমিশন-পদে উন্নীত হইবার জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন।

পরেশলাল রায়—ইনি যুদ্ধের সময় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে

লেপ্টেনাণ্ট ইন্দ্রলাল রায়

-২২১ পৃষ্ঠা

অধ্যয়ন করিতেছিলেন। সুদক্ষ খেলোয়াড় বলিয়া তথায় ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল; যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু দিন পরেই ইনি বৃটনের প্রাচীনতম রেজিমেণ্ট "অনারেবল আর্টিলারি কোম্পানীতে" প্রবেশ করেন। তিন বৎসর তাঁহাকে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে গোলন্দাজ সৈন্যবিভাগে অতিবাহিত করিতে হয়। এই সময়ের কতকাংশ তাঁহাকে তাঁহার দলের সহিত ট্রেঞ্চে কার্য্য করিতে হইয়াছিল, তৎকালে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আহত হন। উক্ত তিন বৎসরের অপরাংশ তাঁহাকে শত্রুর শেল-গোলা বর্ষণের মধ্যে যুদ্ধের আসবাব পত্র স্থানান্তরে প্রেরণের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। যুদ্ধাবসানের কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি উচ্চ সামরিক কর্ম্মচারীদের অনুমোদনে কমিশন-পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

এ, কে, দাসগুপ্ত—ইনি যখন গ্রেট ব্রিটেনে মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন করিতেছিলেন তখন মহাযুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল; তিনি পুস্তক পরিত্যাগ পূর্ব্বক তরবারি ধারণ করিয়া ব্রিটিশ সৈন্যদলে প্রবেশ করেন। অল্প কয়েক দিন যুদ্ধ শিক্ষার পর তিনি ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হন। তথায় আর্ম্মি সার্ভিস কোরের ট্রান্সপোর্ট সেক্‌সনে (Transport Section of the Army Service Corps)* নিযুক্ত হইয়া তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর তিনি যুদ্ধকারী সৈনিকরূপে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

লেপ্টেনাণ্ট ইন্দ্রলাল রায়—ইনি বাখরগঞ্জ জেলাবাসী সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ পি, এল্ রায়ের পুত্র। পরেশলাল রায় ইঁহার জ্যেষ্ঠ

* সৈন্যাদির স্থানান্তরে প্রেরণ-কার্য্য।

ভ্রাতা। ইন্দ্রলাল শিক্ষালাভের জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। পড়া শুনায় তিনি একজন মেধাবী এবং পরিশ্রমী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় তিনটী বিষয়ে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কখনও এই কর্ম্মপ্রিয় যুবকটীকে আলস্যে কাল হরণ করিতে দেখা যাইত না। অবসর সময়ে তিনি কল-কারখানার কাজ শিক্ষা করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার প্রতিভাও সামান্য ছিল না, সময় সময় তিনি স্বহস্তে নূতন নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করিতেন। ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে ইউরোপীয় মহাসমর সূচিত হওয়ায় ইনি যুদ্ধে যোগদান করেন। এই সমর-বিভাগে যোগদান করিবার সময় ইন্দ্রলালকে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় তাহার যথেষ্ট দৃষ্টিশক্তি নাই বলিয়া তিনি সমর-বিভাগে প্রবেশের অযোগ্য বিবেচিত হইলেন। ইহাতে ইন্দ্রলাল বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে দমিত হইলেন না। তাঁহার একখানা সাইকেল ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ একজন বিখ্যাত চিকিৎসককে দর্শনীরূপে প্রদান করিয়া পুনরায় চক্ষু পরীক্ষা করাইলেন। এই পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইল যে, তাঁহার ক্ষীণদৃষ্টি সত্য, কিন্তু তাহাতে সমরবিভাগে প্রবেশের কোনও বাধা হইতে পারে না। ইন্দ্রলাল সৈনিক হইবার অধিকার লাভ করিলেন। সামরিক আকাশ-যান বিভাগে যোগ্যতার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ইন্দ্রলাল আকাশযানের চালক (Pilot) পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা কালেই তিনি নিহত হন। সামরিক-বিভাগ বীরত্বের জন্য মৃত্যুর পর তাঁহার বীর আত্মাকে "ডি-এফ্-সি" (Distinguished Flying Cross) উপাধি-ভূষণে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। মৃত্যুর পর এইরূপ সম্মান

দানের রীতি সামরিক বিভাগে প্রচলিত আছে, ইহাকে "Posthumous Award" বলে।

১৯১৮ সালের ২৭ শে জুলাই মেজর এ, ডবলিউ, কার ৪০ সংখ্যক স্কোয়াড্রণ হইতে শ্রীযুক্ত পি, এল, রায় মহাশয়কে তদীয় পুত্রের মৃত্যু সম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছেন,—"আমি আপনার পুত্রের মৃত্যু সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা আপনাকে জানাইতেছি। তিনি আরও অন্যান্য তিন জনের সহিত শত্রু-পক্ষীয় উড়ো-জাহাজ অনুসন্ধানের নিমিত্ত উর্দ্ধে গমন করিয়াছিলেন। শত্রু-পক্ষীয় চারি খানি ব্যোমযানের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনখানি উড়ো-জাহাজ পতিত হইতে দেখা গিয়াছিল, তন্মধ্যে একখানি আমাদের এবং অপর দুইখানি জার্ম্মাণদিগের। আমাদের ঐ আকাশ-যান খানিই আপনার পুত্র পরিচালন করিতে ছিলেন। আকাশ-যান-বিভাগে যোগদানের সময় হইতেই আপনার পুত্রের দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, তিনি শত্রুর ব্যোমযান নিপাতিত করিবেন। নির্ভীকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং অদ্ভুত পরিচালন-দক্ষতায় ত্রয়োদশ দিবসে তিনি নয়খানি শত্রুপক্ষীয় আকাশ-পোত ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এরূপ কার্য্য-কুশলতা বাস্তবিক লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত। এখানে ইন্দ্রলাল বেশ আনন্দেই দিন কাটাইতেন বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি স্কোয়াড্রণের উচ্চ কর্ম্মচারী এবং সাধারণ সৈনিক সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি নিশ্চয়ই পুরস্কৃত হইবেন বলিয়া আমার মনে হয়। অদ্য সমগ্র স্কোয়াড্রণ আমার সহিত সম্মিলিত হইয়া আপনার এই দারুণ শোকে আপনাকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।"

প্রায় দুই হাজার ফুট উচ্চে যখন ইন্দ্রলাল শত্রুপক্ষীয় আকাশ-যানের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অপূর্ব্ব যুদ্ধ-কৌশলে শত্রুপক্ষের দুইখানি বিমান ধ্বংস হইয়া গেল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ইন্দ্রলালের বিমানখানিতে আগুন ধরিয়া উহা নীচের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু শেষে কোথায় কি অবস্থায় যে তিনি পতিত হইলেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার এই মৃত্যু সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে এক বিরাট গৌরবদান করিয়াছে।

যোগেন্দ্র সেন—ইনি "Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education for Indians" এর সভ্য ছিলেন। ইনি বিলাতেই বি-এস্-সি পাশ করেন। এবং প্রাইভেট রূপে 'ওয়েষ্ট ইয়র্ক সায়ার রেজিমেণ্টে' যোগদান করেন। ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে ইনি নিহত হন। রীতিমত সমারোহে সামরিক-বিভাগের নিয়মানুসারে যোদ্ধাদের মত তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। ইঁহার সম্বন্ধে উপরস্থ কর্ম্মচারীরা বলেন,—"যোগেন্দ্র সেন প্রকৃত যোদ্ধার মত কর্ত্তব্য সাধন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

কে, ব্যানার্জ্জি—ইনি বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ডবলিউ, সি, ব্যানার্জ্জির পৌত্র। যুদ্ধের প্রাক্কালে অক্সফোর্ডে পড়িতেছিলেন এবং কোনও ক্রমে অফিসার্স ট্রেণিং কোরে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলেন। কালক্রমে ইনি কমিশন প্রাপ্ত হন। ইনি লেপ্টেনাণ্ট হইয়া ইজিপ্টে গমন করেন। যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত তিনি তথায় ছিলেন।

বীর বলাইচাঁদ — বলাইচাঁদ চন্দননগরের অধিবাসী। ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হইলে তিনি ফরাসী সৈন্যবিভাগে ভর্ত্তি হইয়া ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন একটী যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ফরাসী

গোলন্দাজ সৈন্য জার্ম্মাণদিগের অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া কামান-শ্রেণী পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। বলাইচাঁদ এই সৈন্যদলভুক্ত ছিলেন। সেনাপতি সৈন্যদিগকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে দেখিয়া অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে কামান-শ্রেণীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যের উপর গোলা বর্ষণের আদেশ দিলেন। কিন্তু জার্ম্মাণ পক্ষের গুলি বর্ষণের মধ্যে গমন করিতে কেহই সাহস করিল না। বাঙ্গালী-সন্তান বীর বলাইচাঁদ সেনাপতির আদেশ কর্ণগোচর করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ জীবনের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া পরিত্যক্ত কামান-শ্রেণীর নিকট গমনপূর্ব্বক বিপক্ষের উপর প্রবল-বেগে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে জার্ম্মাণদিগের কামানসমূহ হইতে নিক্ষিপ্ত প্রকাণ্ড অনল-পিণ্ড সদৃশ গোলকরাজি আসিয়া সশব্দে বিদীর্ণ হইতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ রুধির-স্রোতে প্লাবিত হইল, কিন্তু বীর যুবকের সে দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি রণমদে প্রমত্ত হইয়া কামান পরিচালন করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত শোণিতস্রাবে দৈহিক শক্তি হ্রাস হইয়া আসিলেও কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হইলেন না। শেষে অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ আর কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না, হতচেতন হইয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন।

বলাইচাঁদের সংজ্ঞাহীন দেহ অনতিবিলম্বে সামরিক হাসপাতালে নীত হইল। তথায় তিনি সুদীর্ঘকাল চিকিৎসার পর সুস্থতা লাভ করিলেন। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এই বীরের নির্ভীকতা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একটী বীরজন-বাঞ্ছিত পদক পুরস্কার দিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত অমরনাথ সেন—ইনি রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের সরকারী আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ ৺উপেন্দ্রনাথ সেনের পুত্র।

কলিকাতা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে অধ্যয়ন-কালে অমরনাথ 'বয়-স্কাউট্' (Boy-Scout) দলে প্রবিষ্ট হন। তথনও বাঙ্গালী বয়-স্কাউট দল গঠিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহাকে ইংরাজ বয়-স্কাউট্ দলের সঙ্গেই শিক্ষালাভ করিতে হইত। শিক্ষা-নৈপুণ্যে তিনি ইংরাজ বালকদিগকেও অতিক্রম করিয়া King's Scout সম্মান লাভ করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালী বয়-স্কাউট্ দল গঠিত হইলে অমরনাথ সহকারী স্কাউট্ মাষ্টার পদে উন্নীত হন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় কর্ম্মদক্ষতাগুণে তিনি ইংরাজ-নৌবাহিনীতে প্রবেশ লাভ করেন। উক্ত কর্ম্মে অমরনাথ এরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কোনও রণতরীতে তিনি নৌ-সামরিক কর্ম্মচারীর পদও অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালীর অদৃষ্টে এরূপ গৌরবার্জ্জন ঘটে নাই। তৎপর তিনি আমেরিকার ওয়াসিংটন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিশেষ প্রশংসার সহিত বাণিজ্য-শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভপূর্ব্বক ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

স্মৃতি-স্তম্ভ

গত মহাযুদ্ধে যে সমুদয় বীর বাঙ্গালী-সৈনিক সম্মুখ-যুদ্ধে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন তাঁহাদের স্মৃতি-রক্ষার নিমিত্ত দেশবাসীর অর্থে কলিকাতার গোলদীঘিতে একটী মর্ম্মর স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে মৃত-সৈনিকগণের নাম, ধাম, মৃত্যুর তারিখ এবং কর্ম্ম-পদবী লিখিত আছে। ইহাতে মনে হয়, দেশের হাওয়া একটু ফিরিয়াছে, ভাই-এর হৃদয়ে ভাই-এর সম্মান রক্ষার প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে।

স্মৃতিস্তম্ভ

IN

MEMORY OF

MEMBERS OF

THE 49TH BENGALEE REGIMENT

WHO DIED IN THE GREAT WAR,

1914 1919

TO THE GLORY OF GOD, KING & COUNTRY

— ১২৬ পৃষ্ঠা

ভারতরক্ষী সৈন্য

(Defence of India Force)

যখন বাঙ্গালী ডবল কোম্পানীকে, একটী ব্যাটেলিয়নে পরিণত করিবার অনুমতি প্রদত্ত হয়, তখনই গভর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষী সৈন্যদল গঠনের উপযোগিতা অনুভব করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে সৈন্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক ভারতরক্ষী সৈন্যদল গঠন করিবার আদেশ প্রদান করেন। এই আদেশ বাধ্যতামূলক নহে, যাহারা স্বেচ্ছায় স্বীয় জাতির কর্ত্তব্য-বোধে সৈন্যদলে যোগদান করিবে তাহাদিগকেই গ্রহণ করা হইবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন। অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণী হইতে এই সৈন্যদল গ্রহণ করা হয় নাই। ১৮ হইতে ৪১ বৎসর বয়সের সুস্থদেহ ভারতবর্ষীয় পুরুষ এই সেনাদলে প্রবেশাধিকারের অনুমতি পাইয়াছিল। যাহারা এই আইন অনুসারে সৈন্যদলভুক্ত হইবে, তাহাদিগকে ভারত-বর্ষের বাহিরে কোথাও যাইতে হইবে না এবং যুদ্ধ-বিরতির পর ছয়মাস পর্য্যন্ত সৈন্যদলে থাকিতে হইবে বলিয়া ঘোষিত হয়। সামরিক বিভাগের যাবতীয় আবশ্যক নিয়ম এই সৈন্যদলকে প্রতিপালন করিয়া চলিতে হইত। সমগ্র ভারতবর্ষে এই সৈন্যদল গঠনের এবং শিক্ষাদানের নিমিত্ত কলিকাতা, মাদ্রাজ, পুণা, এলাহাবাদ, লাহোর ও রেঙ্গুণ সহরে এক একটী কেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে অন্ততঃ ১০০০ হাজার সৈনিক গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ২৫০ জন সৈনিকে এক একটী দল গঠিত হইল, এবং এক একটী দল শিক্ষাকেন্দ্রে প্রেরিত হইয়া তথায় ৯০ দিবস শিক্ষা পাইতে লাগিল। শিক্ষাকালে প্রত্যেক সৈনিক সাধারণ সিপাহীর মত ১১৲ টাকা মাসিক বেতন, খাদ্য এবং পরিচ্ছদ

প্রাপ্ত হইত। এক এক দলের শিক্ষা শেষ হইবামাত্র তাহারা স্ব স্ব স্থানে গমন করিত এবং অপর দল শিক্ষিত হইবার জন্য আগমন করিত। যদি কখনও আবশ্যক বোধ হয় তাহা হইলে এই সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া ভারতবর্ষের সামরিক সীমার মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। ভারতরক্ষী সৈন্যদলের কেহ কার্য্যকুশলতা এবং সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিলে যোগ্যতানুসারে তাহাকে উক্ত বিভাগে উন্নততর পদ প্রদান করিবার প্রথাও প্রচলিত হয়।

গভর্ণমেণ্টের ঘোষণাবাণী প্রচারিত হইবামাত্র সমগ্র ভারতে ভারতরক্ষী সৈন্যদল গঠনের বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল। বঙ্গদেশও তাহার গৌরব রক্ষায় যত্নবান্ হইল। যতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গবাহিনী (Bengalee Regiment) সম্পূর্ণ না হইয়াছিল, ততদিন বঙ্গদেশে এই ভারতরক্ষী সৈন্য সংগ্রহের কার্য্য তেমন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় নাই। বঙ্গবাহিনী গঠিত হইয়া গেলে নেতৃগণ তাঁহাদের সমগ্র শক্তি এ দিকে অর্পণ করিলেন এবং বঙ্গে ভারতরক্ষী সৈন্য গঠনের কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। স্যার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার নীলরতন সরকার প্রভৃতি গণ্যমান্য নেতৃবর্গ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে সৈন্যসংগ্রহে মনযোগী হইলেন। এই সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজে এক সভা আহূত হয়। দানবীর স্যার রাসবিহারী ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈন্যদল গঠনের জন্য ১০,০০০ দশ হাজার টাকা দান করেন। বলা বাহুল্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সৈন্যদল ভারতরক্ষী সৈন্যদলেরই অন্তর্গত। বঙ্গদেশ হইতে এক সহস্র সৈনিক চাওয়া হইয়াছিল; এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই ১,৩৬৯ জন সৈন্য প্রদান করিয়াছিলেন। সমগ্র বঙ্গদেশে

সংগৃহীত ভারতরক্ষী সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ২,৩০০ হইয়াছিল। আবেদন-পত্র আরও অনেক আসিয়াছিল, ডাক্তারী পরীক্ষায় অধিকাংশ অগ্রাহ্য হয়। ভারতরক্ষা সৈন্য সংগ্রহ-ব্যাপারে বঙ্গদেশই অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক সৈন্য প্রদান করিয়া ভারতের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছে।

বঙ্গীয় অশ্বারোহী সৈন্যদল

(The Bengal Light Horse)

কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় অধিবাসীদিগের অশ্বারোহী সৈন্যদলের (Calcutta Light Horse) অনুকরণে ধনবান, শিক্ষিত এবং উচ্চ-বংশোদ্ভব বাঙ্গালীদিগের দ্বারা একটী অশ্বারোহী সৈন্যদল গঠনকল্পে লর্ড রোণাল্ডশের অধিনায়কত্বে কয়েকজন গণ্যমান্য বাঙ্গালীর উদ্যোগে টাউন-হলে একটী সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় বঙ্গীয় অশ্বারোহী সৈন্যদল-গঠন-প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়। ভারত-গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব মঞ্জুর করেন।

অল্পদিন মধ্যেই একটী স্কোয়াড্রণ (২২০ জন) গঠিত হইল। বঙ্গীয় সম্ভ্রান্ত বংশের ধনাঢ্য সন্তানগণই কেবলমাত্র এই দলে যোগদান করিতে সমর্থ হইলেন। এই সৈন্যদলের অশ্ব এবং পরিচ্ছদাদির ব্যয় সৈন্যদিগকে স্বয়ং বহন করিতে হইত। ১৯১৭ সালের ৪ঠা আগষ্ট পর্য্যন্ত যাঁহারা এই সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে—৩ জন রাজা, ২১ জন জমিদার, ১৭ জন ব্যবসায়ী, ৩ জন দালাল, ১০ জন গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী, ১৩ জন উকীল, ৪ জন এটর্ণি, ১ জন ডাক্তার, ৭ জন ইঞ্জিনিয়ার, ৩ জন

সংবাদপত্রসেবী, ৫ জন বে-সরকারী কর্ম্মচারী, ১০ জন ছাত্র এবং ৫৩ জন ব্যারিষ্টার ছিলেন। যদিও গভর্ণমেণ্ট এই দলের ব্যয়ভাব গ্রহণ করেন নাই, তথাপি দেশবাসী ধনিসন্তানগণ জাতীয় গৌরববর্দ্ধনের জন্য ইহাতে যোগদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

সঙ্কেতকারী সৈন্যদল

(Divisional Signalling Company)

সামরিক-বিভাগ আদেশ প্রচার করেন যে, ভারতীয় সৈন্যদলের জন্য সঙ্কেতকারী সৈন্যদল এই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে সংগৃহীত হইবে। তদনুসারে বঙ্গদেশেও তাহার আয়োজন হইল। বঙ্গীয় সৈন্য-দলের জন্য সঙ্কেতকারী সৈন্যদল বঙ্গদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দ্বারাই গঠিত হইবে। কর্ণেল বুডেয়ার হাইকোর্টের উকীল মিঃ জি, সরকারকে এই সৈন্যদল গঠনের ভার প্রদান করিয়া তাঁহাকে কমিশন-পদ প্রদান করিলেন। বঙ্গদেশে এই পদ তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রাপ্ত হইলেন।

আলিপুরে দলে দলে লোক তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক এই সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে তিনটী দল শিক্ষার নিমিত্ত জব্বলপুরে প্রেরিত হইল। এই দল ৪২ সংখ্যক দেওলী বাহিনীর সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে প্রত্যেক সামরিক-বিভাগে বাঙ্গালী প্রবেশলাভ করিয়া বাঙ্গালী যে একটা মৃতপ্রায় জাতি নহে,—ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে বাঙ্গালী যে জগতের যে-কোনও জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ, তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য

পরিবারের চির-বিলাস-লালিত সন্তান হইতে নিরক্ষর কৃষক-সন্তান পর্য্যন্ত মহাযুদ্ধে বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন কার্য্যে যোগদান করিয়াছিল। কুলি, মজুর, পাচক, ঘাসিয়াড়া খালাসী, মিস্ত্রি প্রভৃতি বিভাগ নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালীদিগের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। যুদ্ধবিভাগে কেরাণীর কার্য্যেও সংখ্যাতীত বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান যোগদান করিয়াছিলেন। এই কেরাণী-দিগকে অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রের অতি সন্নিকটে অবস্থান করিতে হইত। কাজেই গত মহাযুদ্ধে কেরাণীর কার্য্যও যে নিতান্ত নিরাপদ্ ছিল এরূপ মনে করা যায় না। অনেক কেরাণী হত ও আহত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সুযোগ ও সুবিধার অভাবে সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসর বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এমন একটা সাড়া পরিলক্ষিত হয় নাই। দেড়শত বৎসরের সুপ্ত শক্তি একটা নব জাগরণের সাড়া পাইয়া সেদিন জাগিয়া উঠিয়াছে। জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, একটা নবীন আলোকে দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে, ঘন ঘন পাঞ্চজন্যের নিনাদে প্রভাত-গগন মুখরিত হইতেছে,—ভারতের নানা জাতি দলে দলে জাতীয় মহাযজ্ঞের হোতৃরূপে যজ্ঞস্থলে ছুটিয়া চলিয়াছে; বাঙ্গালীও নবীন উৎসাহে নব অনুপ্রেরণায় সেই পথে ছুটিয়া চলিল—তাহার জাতীয় কলঙ্ক মোচনের জন্য।

ভগবন্! বাঙ্গালীর শিরে তোমার মঙ্গলাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

সমাপ্ত

"বাংলার বীর" সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত :-

প্রবাসী—"এই পুস্তকে বহু শক্তিমান্ বাঙ্গালীর জীবন-কথা বিবৃত হইয়াছে; ইহার উপর ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর হওয়ায় বইখানি উপহার দিবার যোগ্য হইয়াছে। এতগুলি বাঙ্গালী বীরের জীবন-কথা একত্র করিয়া গ্রন্থকার সাধারণের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। শক্তি-চর্চ্চার দিকে বাঙ্গালী ছেলেরা যতই প্রণোদিত হইবে, ততই আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে, আলোচ্য পুস্তকখানি সে বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা—"বঙ্গসাহিত্যে এই রকম একখানি জাতীয় গৌরব-গাথাপূর্ণ পুস্তকের এতদিন সম্পূর্ণ অভাব ছিল। চন্দ্রকান্ত বাবু সে অভাব দূর করিলেন। পুস্তকের ভাষা প্রাণস্পর্শী। ছাপা অতীব সুন্দর, বহিরাবরণ সুদৃশ্য। বাংলার ঘরে ঘরে 'বাংলার বীর' পঠিত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব"।

টিচার্স জার্ণাল—"বঙ্গীয় মহাবীরগণের চরিত্র এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে যে ইহা পাঠমাত্রই দুর্ব্বল বাঙ্গালার হৃদয়ে শক্তি উদ্দীপিত হইবে। আশা করি, পুস্তকখানি সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিবে।"

বসুমতী—"এ খানি খাঁটী বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরব-গাথা সম্বলিত সদ্‌গ্রন্থ, এমন একখানি গ্রন্থ বাংলার স্কুলসমূহের পাঠ্য হইলে কোমলমতি বাঙ্গালী শিক্ষার্থীর কোমল প্রাণে ছাপ রাখিয়া যাইবে।"

বঙ্গবাণী—"আশা করি বইখানি সাগ্রহে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে পঠিত হইবে। ছাপা ও বাঁধান নিখুঁৎ। এমন একখানি বইএর দাম মাত্র পাঁচ সিকা —খুবই কম বলিতে হইবে।"